রবীন্দ্রনাট্যপ্রবাহ

দ্বিতীয় খণ্ড

তত্ত্বনাট্য

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

মিত্রালয়
১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

করকমলে

প্রকাশকের নিবেদন

রবীন্দ্রনাট্যপ্রবাহের দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হইল। রবীন্দ্রনাথের তত্ত্ব-নাট্যগুলি এই খণ্ডে আলোচিত হইয়াছে। পরবর্তী খণ্ড আগামী বৎসরে বাহির হইবে বলিয়া আশা করিতেছি।

সূচীপত্র

এই লেখকের—

রবীন্দ্র-চর্চ্চা

রবীন্দ্রকাব্য নির্ঝর
রবীন্দ্রকাব্যপ্রবাহ ১।২
রবীন্দ্রনাট্য প্রবাহ ১।২
রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন

সাহিত্য

মাইকেল মধুসূদন
চিত্রচরিত্র
বাংলার লেখক
বাঙালী ও বাংলা সাহিত্য
বাঙালীর জীবনসন্ধ্যা

উপন্যাস

পদ্মা
কোপবতী
জোড়াদীঘির চৌধুরী পরিবার
অশ্বত্থের অভিশাপ
চলনবিল

গল্প

শ্রীকান্তের পঞ্চম পর্ব
শ্রীকান্তের ষষ্ঠ পর্ব
গল্পের মতো
গালি ও গল্প
ব্রহ্মার হাসি
ডাকিনী
অশরীরী
প্র, না, বি-র নিকৃষ্টগল্প

নাটক

পারমিট
ঋণং কৃত্বা
সানি ভিলা
পরিহাস বিজল্পিতম্
ডিনামাইট
গভর্ণমেণ্ট ইন্সপেক্টর
মৌচাকে ঢিল

কাব্য

অকুন্তলা
মুক্তবেণী

যন্ত্রস্থ

বিচিত্র উপল
বাংলা সাহিত্যের নরনারী
নেহরু
হংসমিথুন

অচলিত

দেয়ালি
বসন্তসেনা
আত্মঘাতিনী
প্রাচীন আসামী হইতে
প্রাচীন গীতিকা হইতে
বিদ্যাসুন্দর
দেশের শত্রু
ঘোষযাত্রা
চয়ন

রবীন্দ্র তত্ত্বনাট্যের ভূমিকা

এই পর্যায়ে আলোচিত নাটকগুলিকে তত্ত্বনাট্য বলা হইয়াছে। যতদূর জানি আগে এ নাম ব্যবহৃত হয় নাই ; এখন এ নাম কেন ব্যবহার করিলাম সে বিষয়ে কিছু বলিযা লওয়া আবশ্যক। এই পর্যায়ের নাটকগুলিকে নানা জনে নানা নামে অভিহিত কবিয়াছেন*। রূপক, সাঙ্কেতিক, প্রতীকী, সমস্যামূলক প্রভৃতি বিচিত্র নাম ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু বিচার করিলেই দেখা যাইবে ইহাদেব কোন একটি নামের দ্বাবা সমগ্র পর্যায়টিব প্রকৃতিবর্ণনা সম্ভব নয়। ইহাদেব কোন কোন নাটক রূপক (অংশিক রূপক), কোন কোন নাটক প্রতীকী বা সাঙ্কেতিক এবং কোন নাটককে সমস্যামূলক বলা চলে সত্য, কিন্তু তাহাতে নাটকবিশেষেব প্রকৃতিমাত্র প্রকাশ পায়, সমগ্র পযায়ের প্রকৃতি প্রকাশ পায না। এই অসুবিধার জন্যই সমগ্র পর্যায়টির প্রকৃতি প্রকাশ করিতে পাবে এমন একটি সামান্য বা সাধারণ নামের অভাব অনুভব কবিতে থাকি। 'তত্ত্বনাট্য' সেই অভাব দূর করিতে পারিবে বলিয়া আমার বিশ্বাস। কোন নাটক রূপক, প্রতীকী বা সমস্যামূলক যেমনি হোক তাহা যে তত্ত্বপ্রধান সন্দেহ নাই। ইহাই এই শ্রেণীর নাটকের সামান্য বা সাধারণ লক্ষণ। প্রকৃতির প্রতিশোধ বা মুক্তধারাতে পার্থক্য যতই হোক দু'যেব মধ্যেই তত্ত্বের প্রাধান্য অবিসম্বাদী। আবাব ফাল্গুনী ও কবির দীক্ষায় পার্থক্য যতই প্রকট হোক—দুয়ের ঘনিষ্ঠতা তত্ত্বেব প্রাচুর্যে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, তত্ত্বের প্রকটতা ও প্রাচুর্য এইসব নাটকের শ্রেণীলক্ষণ।

আরও একদিক হইতে বিচাব চলিতে পারে। মুক্তধারা ও প্রায়শ্চিত্তের মধ্যে গল্পসূত্রের মিল আছে, কোন কোন চরিত্রও দুই নাটকে অভিন্ন, তৎসত্ত্বেও

নাটক দুটি যে ভিন্ন পর্যায়ভুক্ত হইয়া পড়িয়াছে তাহার কারণ প্রায়শ্চিত্তে কাহিনীর প্রাধান্য আর মুক্তধারায় প্রাধান্য তত্ত্বের। রাজা ও রাণীর রূপান্তর তপতী। কিন্তু তপতীকে তত্ত্বনাট্য পর্যায়ের মনে করা চলে না, তত্ত্ব ওখানে কাহিনীকে ছাপাইয়া উঠিতে পারে নাই, যদিচ কাছ ঘেঁসিয়াই গিয়াছে।

এই শ্রেণীর নাটকগুলি পড়িলেই বা অভিনয়কালে দেখিলেই পাঠক বা দর্শকের মনে এই বোধ জন্মিবে যে কাহিনী এখানে পুরোভাগে স্থাপিত হইলেও প্রাধান্য তাহার নয়, কাহিনীর পশ্চাতে যে তত্ত্বটি বিরাজ করিতেছে তাহাই মুখ্য, শিখণ্ডীর অন্তরালস্থিত অর্জ্জুনের মতো তাহারই নিশিততম বাণটি পাঠকের হৃদয়কে লক্ষ্য করিয়া নিক্ষিপ্ত হইতেছে। এখন তত্ত্বরূপই যদি ইহাদের প্রধান রূপ হয়, তবে সেই প্রাধান্যের দ্বারাই ইহাদের পরিজ্ঞাত হওয়া আবশ্যক।

এখানে প্রশ্ন উঠিতে পারে আবার নূতন নামের আমদানী কেন—পুরাতন একটা দিয়া কি কাজ চলিতে পারে না? কেন চলিতে পারে না অংশতঃ আগেই বলিয়াছি। রূপক, সাঙ্কেতিক বা প্রতীকী কোন নামের দ্বারাই সমগ্রের রূপ প্রকাশ পায় না। সাঙ্কেতিক বা প্রতীকী বলিতে মুক্তধারা, রক্ত-করবী ও রথের রশিকে বুঝায় এমন কি অচলায়তনকেও বুঝাইতে পারে—কিন্তু আর কোনটির বেলায় কি ঐ নাম খাটিবে? রূপক বলিতে রাজা ও ডাকঘরকে বুঝাইতে পারে (আমার মতে আংশিক রূপক মাত্র); কিন্তু শারদোৎসব ও প্রকৃতির প্রতিশোধের বেলায় কি হইবে? সমস্যা নাটক ব্যবহারেও ঐরূপ অসম্পূর্ণতা দোষ দেখা দিবে। এইসব বিষয়ে বিচার করিয়াই আমাকে একটি সামান্য নাম অনুসন্ধান করিতে হইয়াছে—তত্ত্ব-নাট্যের চেয়ে যোগ্যতর নাম খুঁজিয়া পাই নাই, নামটি গদ্যগন্ধী হইতে পারে, অতিরিক্ত পরিমাণে বাস্তবঘেঁষা হইতে পারে, কিন্তু সমগ্র শ্রেণীটির রূপটিকেও প্রকাশ করিতে পারে বলিয়া আমার বিশ্বাস। 'তত্ত্বনাট্য' বলিতে তত্ত্বপ্রধান এক শ্রেণীর নাটককে বুঝি, আরও বুঝি যে ইহা কাহিনীপ্রধান নাটক হইতে ভিন্ন গোত্রের রচনা, সেই সঙ্গে আরও বুঝি যে এক শ্রেণীর মধ্যে উপশ্রেণীগত প্রভেদ যতই থাকুক না কেন তত্ত্বনাট্যের বেড়াজালে সমস্ত সূক্ষ্ম প্রভেদই

ধরা পড়িবে। কি এবং কি নয় এবং কোন্ কোন্ সূক্ষ্ম প্রভেদ ইহার অন্তর্গত প্রভৃতি অনেক রহস্যই নামটিতে প্রকাশ পায়। এইসব কার্যকারিতাই এই নামটির যোগ্যতার শ্রেষ্ঠ পরিচয়।

২

পর্ব বিভাগ—

রবীন্দ্রনাথের তত্ত্বনাট্যগুলিকে তিন পর্বে ভাগ করা যাইতে পারে।

প্রথম পর্বে প্রকৃতির প্রতিশোধ।

দ্বিতীয় পর্বে শারদোৎসব, অচলায়তন, রাজা ও ডাকঘর।

এবং তৃতীয় পর্বে ফাল্গুনী, মুক্তাধারা, রক্তকরবী, রথের রশি, তাসের দেশ এবং কবির দীক্ষা।

প্রথম পর্ব। প্রকৃতির প্রতিশোধের প্রকাশকাল ১৮৮৪ সাল, তখন কবির বয়স তেইশ বৎসর।

প্রকৃতির প্রতিশোধ ছাড়া এই পর্বে রচিত আর কোন নাটককে কিম্বা আর কোন রচনাকে তত্ত্বপ্রধান বলা চলে না। বরঞ্চ বিসর্জন, রাজা ও রাণী এবং কাব্যনাট্যগুলি আকৃতি ও প্রকৃতির বিচারে ঠিক তত্ত্বনাট্যের বিপরীত। এই যুগটাতে রবীন্দ্রনাথ ট্রাজেডিতে, প্রহসনে, ছোট গল্পে ও উপন্যাসে কাহিনী বিন্যাস ও সজীব বাস্তব চরিত্র সৃষ্টিকেই মুখ্য উদ্দেশ্যরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রকৃতির প্রতিশোধে নাটকের যে আকৃতি ও প্রকৃতি দৃষ্ট হয় তাহা নিঃসঙ্গ, তাহার কোন দোসর এ পর্ব্বে মেলে না। এরকম ক্ষেত্রে এই সময়টাকে তত্ত্বনাট্যের প্রথম পর্ব বলা যায় কিনা সন্দেহ। প্রকৃতির প্রতিশোধ পরবর্তীকালের তত্ত্বনাট্যসমূহের পূর্ব্বাভাস, নিঃসঙ্গ এই নাটকখানি নিঃসঙ্গ সন্ধ্যাতারকার মতোই আসন্ন তারকারাজির অগ্রদূত। তবু ইহার গুরুত্ব সমধিক এই কারণে যে কবির মতে এই নাটকখানার

মধ্যেই তাঁহার জীবনতত্ত্বের বীজ নিহিত। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, প্রকৃতির প্রতিশোধে কবির জীবনতত্ত্ব বীজের চেয়ে অধিক প্রকট নয়। ইহা নাট্যাকারে অঙ্কুরিত ও পল্লবিত হইয়া সার্থক হইয়া উঠিয়াছে অনেক পরে—যে সময়টাকে তত্ত্বনাট্যের দ্বিতীয় পর্ব্ব বলিয়াছি।

দ্বিতীয় পর্ব্বের সূচনা ১৯০৮ সালে যখন শারদোৎসব নাটক প্রকাশিত হয়, তখন কবির বয়স সাতচল্লিশ বৎসর। এই সময়টা রবীন্দ্র-জীবনে নানা কারণে বিশেষ অর্থপূর্ণ। কবির জীবন ও প্রতিভা তখন মোড় ঘুরিবার মুখে। এটাকে তাঁহার পূর্ণতর বিকাশের প্রস্তুতির সময় বলা যাইতে পারে। নাটকের ক্ষেত্রে দেখি যে তিনি প্রচলিত ধরণের ট্রাজেডি ও প্রহসন লেখা ত্যাগ করিয়াছেন—অথচ তখনও তিনি নাট্যরচনার স্বকীয় রীতিটির পুরাপুরি সন্ধান পান নাই। যেমন নাট্য বিষয়ে তেমনি রচনার অন্য শাখা সম্বন্ধেও বটে—একই সত্য প্রযোজ্য। ক্ষণিকা ও কল্পনার পালা অনেককাল শেষ হইয়া গিয়াছে—অথচ গীতাঞ্জলি তখনো রচিত হয় নাই, মাঝখানে আছে খেয়া। খেয়ার সঙ্গে নৈবেদ্যকে জড়িত করিয়া দেখিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় নৈবেদ্যে যেপরিবর্তনের সূচনা খেয়ায় তাহা অনেক দূর অগ্রসর হইয়া গিয়াছে—যদিচ এখনো আমরা গীতাঞ্জলি পর্ব্বের দেখা পাই না। নৈবেদ্য কাব্যের আকৃতিটা পূর্ব্বতন রীতির সাক্ষ্য দেয়—প্রকৃতিতে তাহা পরবর্তীকালের সূচক। খেয়া কাব্যের স্বল্পভার ভূষণবিরল সন্ধ্যাক্রান্ত ছন্দে ও শিল্পে আসন্ন পরিবর্তনকে অত্যাসন্ন বলিয়া জানাইয়া দেয়। খেয়া কাব্য পূর্ব্বতন ও পরতন আত্মিক অভিজ্ঞতার মধ্যে খেয়া পারাপার করিতেছে। ঠিক এই সময়টাতে তিনি পুনরায় তত্ত্বনাট্য রচনায় আত্মনিয়োগ করিলেন।

গঠনরীতির বিচারে এগুলি প্রকৃতির প্রতিশোধের চেয়ে অনেক ঘনপিনদ্ধ। প্রকৃতির প্রতিশোধে যে তত্ত্ব নীহারিকারূপে অস্পষ্ট ও অদৃশ্য-ভাবে বিরাজমান এখানে তাহা অনেক প্রত্যক্ষ ও উজ্জ্বল, আর বিশ্বপ্রকৃতি মানবপ্রকৃতির প্রায় সমকক্ষ। বিসর্জন এবং রাজা ও রাণীর মানব

প্রকৃতি ও বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে তুলনা করিয়া দেখিলেই আমার বক্তব্য বুঝিতে পারা যাইবে। শিল্পহিসাবে গীতাঞ্জলি প্রভৃতির যে লক্ষণ ও ধর্ম, রাজা, ডাকঘর ও শারদোৎসবেরও প্রায় সেই লক্ষণ ও ধর্ম—এমনকি অচলায়তনের নাট্যবিষয় কিঞ্চিৎ স্বতন্ত্র হওয়া সত্বেও তাহাকেও অন্যান্যদের সঙ্গে শ্রেণীভুক্ত করিতে আদৌ বেগ পাইতে হয় না। সেকালে রবীন্দ্রনাথের যাঁরা বিরূপ সমালোচনা করিতেন, রূপান্তরে তাঁহারাও এই সত্যটি বুঝিয়াছিলেন। তাঁহাদের কাছে খেয়া, গীতাঞ্জলি, ডাকঘর ও রাজা সমান দুর্বোধ্য ঠেকিয়াছিল। কবির জীবনে সহজবোধ্য শিল্পের যুগ চলিয়া গিয়াছে।

তৃতীয় পর্ব্বে পাই অনেক কয়খানি নাটক। ফাল্গুনী, মুক্তধারা, রক্তকরবী, রথের রশি, তাসের দেশ ও কবির দীক্ষা। ফাল্গুনীর রচনা কাল ১৯১৫, তখন কবির বয়স পঞ্চান্ন বৎসর।

এই পর্ব্ব সম্বন্ধে তিনটি বিষয় স্মরণ রাখা আবশ্যক। প্রথম, বলাকা যেমন কবির প্রতিভার মোড় ঘুরিবার আর একটা সময়, ফাল্গুনীও তাহাই। বলাকা ও ফাল্গুনীকে একত্র বিচার করিতে হইবে। যথাস্থানে তাহা করিয়াছি এখানে পুনরুক্তি অনাবশ্যক। দ্বিতীয়, রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ তত্ত্ব নাট্যগুলি এই পর্ব্বে লিখিত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ তত্ত্বনাট্য কোন্‌খানা সে বিষয়ে ব্যক্তিগত অভিরুচি অনুসারে মতভেদ হইবে। আমার নিজের ধারণা তত্ত্বনাট্য হিসাবে মুক্তধারাই তাঁহার শ্রেষ্ঠ রচনা। কিন্তু এ লইয়া তর্ক-বিতর্ক করিয়া লাভ নাই।

আর এই পর্ব্ব সম্বন্ধে তৃতীয় সাধারণ লক্ষণ এই যে, এ সময়কার নাটকগুলি মাত্র নয়, কাব্য উপন্যাস প্রভৃতি প্রায় সমুদায় শ্রেণীর রচনাই তত্ত্বভারাক্রান্ত এবং সেই কারণেই অনেক পরিমাণে সূক্ষ্মশরীরী হইয়া উঠিয়াছে! ব্যতিক্রম অবশ্যই আছে, নাটকে ব্যতিক্রম নটীর পূজা, উপন্যাসে ব্যতিক্রম যোগাযোগ। সচেতন তত্ত্বশিল্পের স্পর্শ ইহাদের কাছেও ঘেঁষিতে পারে নাই, পরবর্তী রবীন্দ্রসাহিত্যে এ দুটি অত্যুজ্জ্বল রত্ন। কিন্তু এই জাতীয় ব্যতিক্রম ছাড়িয়া দিলে দেখা যাইবে যে, এই পর্ব্বের প্রায় সমস্ত

রচনাই, কেবল নাটক নয়—তত্ত্ব প্রকাশকেই স্বধর্ম বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে। কবির তেইশ বৎসর বয়সে প্রকৃতির প্রতিশোধে যাহার সূচনা দেখিয়াছিলাম, কবির শেষ জীবনে আসিয়া তাহা যেন সর্ব্বব্যাপী। মাঝখানে অনেক ব্যতিক্রম, অনেক বিপরীত স্বভাবকে তাঁহার অতিক্রম করিতে হইয়াছে সত্য, কিন্তু শেষ পর্যন্ত নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিতেও সক্ষম হইয়াছেন তাহাও তেমনি সত্য।

৩

এবারে তত্ত্ব নাট্যগুলিতে আলোচিত বিভিন্ন তত্ত্ব সম্বন্ধে সাধারণভাবে আলোচনা করা যাইতে পারে। তাহাতে তত্ত্বনাট্যের স্বরূপ আরও স্পষ্ট হইয়া উঠিবার সম্ভাবনা, তা ছাড়া রবীন্দ্রনাথের চিন্তা ও মনীষার ব্যাপকতা সম্বন্ধেও একটি ধারণা জন্মিবে—সেই সঙ্গে দেখিতে পাইব রবীন্দ্রনাথ জীবনের বিভিন্ন পর্ব্বে নূতন নূতন সমস্যাকে কিভাবে শিল্পবস্তুতে পরিণত করিতে এবং স্বভাবতঃ দুরন্বয় তত্ত্ব ও শিল্পের মধ্যে কিভাবে সামঞ্জস্য স্থাপন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এই প্রচেষ্টার সার্থক অনুধাবনের ফলে তাত্ত্বিক রবীন্দ্রনাথ ও শিল্পী রবীন্দ্রনাথ দু'জনারই পরিচয় পাওয়া যাইবে।

তত্ত্বনাট্যগুলিতে আলোচিত সমস্যাসমূহকে নির্গলিত করিয়া লইলে তিনটি মূল সমস্যায় গিয়া দাঁড়ায়। সে তিনটি বিষয় এই—

(১) মানুষের সহিত ভগবানের সম্পর্ক

(২) মানুষের সহিত প্রকৃতির সম্পর্ক

(৩) মানুষের সহিত মানুষের সম্পর্ক

এইসব সমস্যা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি বিষয়ে সকলে একমত হইবেন এমন আশা করা অন্যায়, দৃষ্টির গভীরতা সম্পর্কেও দ্বিমত হইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা বিদ্যমান, যেসব ক্ষেত্রে সমাধানের ইঙ্গিত তিনি করিয়াছেন তাহাও কাহাকেও

স্বীকার করিয়া লইতে বলি না—কিন্তু একটি প্রসঙ্গে সকলকেই বিস্ময়ে ও শ্রদ্ধায় একমত হইতে হইবে, সেটি তাঁহার চিন্তাক্ষেত্রের সর্বময় ব্যাপকতা। প্রকৃতি, মানুষ ও ভগবান এই তিনটি সত্তা লইয়াই জগৎ গঠিত, দেখিতেছি যে রবীন্দ্রনাথের চিন্তাজগৎও তাহার সমব্যাপক। ব্যাপ্তির অসীমতাই, কেবল এ ক্ষেত্রে নয়, সর্বক্ষেত্রেই রবীন্দ্রমনীষার প্রধান লক্ষণ। অনেকে বলিতে পারেন যে, ব্যাপ্তিতে ন্যূনতা ঘটিয়া গভীরতায় বাড়িলে আরও ভালো হইত। কিন্তু 'আরও ভালোর' মরীচিকা শিকারে আমাদের আসক্তি নাই, তাহাতে কদাচিৎ সুফল পাওয়া যায়।

তত্ত্বনাট্যের প্রথম পর্বে একটি মাত্র রচনা আছে—প্রকৃতির প্রতিশোধ। এই রচনাটির গুরুত্ব সম্বন্ধে কবি সম্পূর্ণ সচেতন, তাঁহার এই সচেতনতার উপরে আমরাও জোর দিয়াছি—এবারে তাহার সার্থকতা বুঝিতে পারা যাইবে।

এই অপরিণত রচনাটির মধ্যে, বীজের মধ্যে যেমন বনস্পতি থাকে সেইভাবে তিনটি তত্ত্বই নিহিত। সমস্তই অপরিণত, সমস্তই অস্পষ্ট এবং খুব সম্ভব সমস্তই কবির অজ্ঞাত, কিন্তু সমস্তই যে বিদ্যমান সে বিষয়ে সন্দেহের কারণ নাই।

প্রকৃতির প্রতিশোধের সন্ন্যাসী তত্ত্বজগতের চতুষ্পথের মোড়ে দণ্ডায়মান। সে নিজেকে ভগবানের সহিত, প্রকৃতির সহিত এবং মানুষের সহিত সমসূত্রে রাখিয়া বিচার করিয়াছে। সিদ্ধিজনিত অহঙ্কারে সে এমনি মত্ত, এমনি অন্ধ যে সে নিজেকে তিনটি সত্তার চেয়েই প্রবলতর কল্পনা করিয়াছে। ভগবদুল্লেখ বিশেষ নাই, করিবার সে আবশ্যকবোধ করে নাই, সে যখন সিদ্ধপুরুষ, তখন সে তো ভগবানের সমকক্ষ, সমকক্ষের উল্লেখ কে কবে করিয়া থাকে। আর প্রকৃতি ও মানব তাহার নির্জিত, নির্জিতের উল্লেখে গৌরব আছে, তাই বারংবার তাহাদের উল্লেখ সে করিয়াছে।

যে আনন্দে মহাদেব করেন বিরাজ,
পেয়েছি, পেয়েছি সেই আনন্দ আভাস।

অর্থাৎ এখন সে মহাদেবের সমকক্ষ। আর—

কি কষ্ট না দিয়েছিস রাক্ষসি প্রকৃতি
অসহায় ছিনু যবে তোর মায়াফাঁদে!

অর্থাৎ এক সময়ে সে প্রকৃতির অধীন ছিল এখন সে স্বাধীন, বুঝি শুধু স্বাধীন নয়, প্রকৃতিই যেন তাহার অধীন।

আর মানুষ সম্বন্ধে—

এ কি ক্ষুদ্রধরা! এ কি বদ্ধ চারিদিকে……
এই কি নগর! এই মহারাজধানী!
চারিদিকে ছোট ছোট গৃহগুহাগুলি,
আনাগোনা করিতেছে নর-পিপীলিকা।

কি অসীম অবজ্ঞা! কি বিবিক্ত অনুকম্পা!

এই তিন তত্ত্বসূত্রের টানাপোড়েনের পরিণাম প্রকৃতির প্রতিশোধ নাটক। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা স্বক্ষেত্রে আছে—এখানে শুধু এইটুকু বলিবার ইচ্ছা যে, তাঁহার পরবর্ত্তী সমস্ত তত্ত্বনাট্যের মূল তত্ত্বগুলি প্রথম তত্ত্বনাট্য খানিতেই বীজাকারে বর্ত্তমান।

দ্বিতীয় পর্ব্বে চারখানি নাটক পাই, শারদোৎসব, রাজা, ডাকঘর ও অচলায়তন। নাটক চারখানাকে যদি তিনভাগে সাজাই তবে দেখিতে পাইব যে, ইহাদের মধ্যে মূলতত্ত্বগুলি সবই দেখা দিয়াছে।

শারদোৎসবে মানুষের সহিত প্রকৃতির, রাজা ও ডাকঘরে মানুষের সহিত ভগবানের এবং অচলায়তনে মানুষের সহিত মানুষের সম্পর্কের বিচার, ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করা হইয়াছে।

প্রকৃতি মানুষের উদ্দেশ্যে অসীম ঐশ্বর্য, অগাধ সম্পদ্ ঢালিয়া দিতেছে,

মানুষকে তাহা কেবল গ্রহণ করিলেই চলিবে না, ত্যাগ স্বীকারের দ্বারা, দুঃখ সহনের দ্বারা, প্রকৃতির দানের প্রতিদান দিতে হইবে—এ ঋণশোধের পালা এমনি আনন্দময় যে তাহাতেই শারদোৎসবের প্রাণ। আর এই দান-প্রতিদানের সমবায়ে মানুষ ও প্রকৃতি ঘনিষ্ঠতর হইয়া একাত্মতর ও পূর্ণতর হইয়া উঠিতেছে। ইহাই শারদোৎসব তত্ত্বনাট্যের নির্গলিত মর্ম্ম।

রাজা ও ডাকঘরে মানবহৃদয়ের সহিত ভগবানের সম্বন্ধবিচার। নাটক দু'খানিতে যাঁহাকে রাজা বলা হইয়াছে তিনি ভগবান ছাড়া আর কেহ নহেন, আর সুদর্শনা ও অমল স্ব-স্ব ক্ষেত্রে মানব হৃদয়ের প্রতিনিধি।

অচলায়তনে আসিয়া রবীন্দ্রনাথকে নূতন সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। এখানে আর মানুষে ভগবানে কিম্বা মানুষে প্রকৃতিতে সম্বন্ধবিচার নয়—এখানে বিচার মানুষে মানুষে সম্বন্ধের—বিভিন্ন শ্রেণীর জনসঙ্ঘের মধ্যে সঙ্ঘাত এখানে বিচার্যবিষয়। অশীতিবর্ষ পূর্ত্তি উপলক্ষ্যে সভ্যতার সঙ্কট রচনায় বেদনার যে Last Testament প্রকাশিত হইয়াছে—অচলায়তন নাটকে তাহারই পূর্ব্বসূত্র। আরও আগের কোন রচনাতে এ সূত্রের সন্ধান মিলিলেও মিলিতে পারে—কিন্তু অচলায়তনে তাহা প্রথম স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে এবং প্রথম শিল্পমূর্ত্তি লাভ করিয়াছে। প্রথম বলিলাম এই জন্য যে পরে এই সমস্যাটিকে আরও ব্যাপকভাবে আরও গভীরভাবে তিনি একাধিক নাট্যরূপ দিয়াছেন। বস্তুত তাঁহার তৃতীয় পর্ব্বের প্রায় সমস্ত নাটকে এই তত্ত্বটিই মূল উপজীব্য। মানুষে মানুষে সম্বন্ধ বর্ত্তমান যুগে মানুষে মানুষে সংঘাতরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া সভ্যতার সঙ্কটের সৃষ্টি করিয়াছে। এই সমস্যাটি বা সমস্যাটির বিশেষ রূপটি কবিকে শেষজীবনে সবচেয়ে ব্যথিত, সবচেয়ে ভাবিত করিয়া তুলিয়াছিল। কবিতায়, প্রবন্ধে এবং নাট্যাকারে এই বেদনা ও সম্বেদনকে তিনি বারংবার প্রকাশ করিয়াছেন। মুক্তধারা, রক্তকরবী, কালের যাত্রা, কবির দীক্ষা, তাসের দেশ সমস্তই এই তত্ত্বের বাণীবেদনামূর্ত্তি। ফাল্গুনী নাটকখানাতেও অংশতঃ এই তত্ত্ব—কিন্তু আরও কিছু আছে—সেই আরও কিছুর জন্যই তাহার স্থান একটু বিচিত্র।

ফাল্গুনীতে কবির ব্যক্তিগত যৌবন, (ভূমিকায় কথিত ইক্ষ্বাকু বংশীয় রাজার যৌবন) প্রকৃতির যৌবন (গীতিভূমিকায় কথিত) এবং মানব সমাজের যৌবন (মূল নাটকে কথিত)—এই তিন যৌবনের সমস্যা জড়িত। অর্থাৎ এই নাটকে কবিব্যক্তি, প্রকৃতি ও মানব সমাজ এক সমস্যার গ্রন্থিতে যুক্ত। কালে কালে লোকে লোকান্তরে যৌবনের জয়—ফাল্গুনী গীতিনাট্যের বিষয়। রূপান্তরে ইহাই অচলায়তন এবং তাসের দেশেরও ভাব-উপজীব্য। অচলায়তনে অন্য দেশাগত শোণপাংশু বা যূণক (যুবক) জাতির আঘাতে অচলায়তন ধ্বংস হইয়াছে। তাসের দেশে অন্য দ্বীপাগত যুবক রাজপুত্রের প্রভাবে তাসের দেশের জড়বৎ নরনারী মানবীয় যৌবনে জাগিয়া উঠিয়া মুক্তিলাভ করিয়াছে। ফাল্গুনীতে যাহা সাধারণভাবে কথিত অচলায়তনে ও তাসের দেশে তাহা বিশিষ্ট ক্ষেত্রে প্রদর্শিত হইয়াছে—ফাল্গুনীতে জয় যৌবনের—আর অন্য দুইখানি নাটকে জয় যুবক জাতির, যুবক রাজপুত্রের। ইহা ঠিক সভ্যতার সঙ্কট নয়, কিন্তু তাহারই প্রায় ধার-ঘেঁষা, মানুষের যৌবনের সঙ্কট, তিনখানিতেই মানুষের যৌবনের জয় ঘোষিত হইয়াছে।

মুক্তধারা, রক্তকরবী, কালের যাত্রা ও কবির দীক্ষা সভ্যতার সঙ্ঘর্ষ বা সভ্যতার সঙ্কট বিষয়ক নাটক। শেষের দু'খানা নাটক হিসাবে অকিঞ্চিৎকর হইলেও মূলভাবের বাহন হিসাবে বিশেষভাবে বিচার্য। ইহাদের মধ্যে আবার দুটি ভাগ করা চলে। মুক্তধারা ও রক্তকরবী একত্র বিচার্য, কালের যাত্রা ও কবির দীক্ষা সগোত্র। প্রথম দু'খানিতে সভ্যতার সঙ্কটের বিশেষ একটা দিক চিত্রিত, শেষের দু'খানিতে সভ্যতার সঙ্কটের সাধারণ চিত্র।

বর্তমানে পৃথিবীতে যে সভ্যতার সঙ্কট দৃষ্ট হইতেছে তাহার মূলগত কারণ যন্ত্রবাদের অতিচার ও অতিপ্রসার। যন্ত্রজাত সভ্যতা মানব জীবনের মুক্তধারাকে বাঁধিয়া ফেলিয়াছে, মানবের স্বরূপকে জটিল জালের আড়ালে ফেলিয়া তাহাকে খণ্ডিত ও বিকৃত করিয়া ফেলিয়াছে। এখন মুক্তধারাকে নির্বাধ করিবার উপায় কি? খণ্ডিত ও বিকৃত মানুষকে জালের রাহুকবল হইতে উদ্ধারের উপায় কি? অভিজিৎ ও রঞ্জন সেই উপায় দেখাইয়া দিয়াছে।

যন্ত্রকে প্রাণের দ্বারা আঘাত করিয়া প্রাণের বিনিময়ে মুক্তধারাকে ও মানুষকে মুক্তিদান করিতে হইবে। যন্ত্রকে বৃহত্তর যন্ত্রের দ্বারা আঘাত কারলে শেষ পর্যন্ত যন্ত্রেরই জয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ইউরোপ এই পন্থা গ্রহণ করিয়াছে, তাই যন্ত্রের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় যন্ত্র ধ্বংস না হইয়া কেবলি আপন শক্তিবৃদ্ধি করিতেছে, অস্ত্রের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় অস্ত্রের ধ্বংসকারিতা কেবল বাড়িয়াই চলিয়াছে, মানুষের মুক্তির উপায় আর চোখে পড়িতেছে না। ইহা মুক্তির পথ নহে।

রবীন্দ্রনাথ যে পথ নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহা স্বতন্ত্র। রাবণের প্রতিদ্বন্দ্বী যেমন রাম, যন্ত্রের প্রতিদ্বন্দ্বী তেমনি প্রাণ। তাহাতে প্রাণের আপাতবিনাশ হইলেও যন্ত্রের যে সমূলে বিনাশ হয় তাহাতে সন্দেহ নাই। অভিজিৎ মরিয়াছে বটে, কিন্তু মুক্তধারাও তেমনি মুক্তিলাভ করিয়াছে। রঞ্জন মরিয়াছে বটে কিন্তু রাজাও তেমনি জালায়ন হইতে উদ্ধার পাইয়াছে। যন্ত্র বনাম প্রাণ—ইহাই রবীন্দ্রনাথের সমাধান। এখানেই গান্ধীজীর আদর্শের সহিত রবীন্দ্রনাথের সাম্য। রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে যাহা রক্তকরবী, গান্ধীজীর ক্ষেত্রে তাহাই চরখা—দুই-ই Symbol বা প্রতীক; দুর্জয় যন্ত্রের বিরুদ্ধে উপস্থাপিত অজেয় মানব-শক্তির প্রতীক। ইঁহারা আপাত প্রচণ্ড শক্তিমানের বিরুদ্ধে দৃশ্যতঃ দুর্বলকে উপস্থাপিত করিতে দ্বিধাবোধ করেন নাই, যেমন করেন নাই আদিকবি বাল্মীকি রাবণের সম্মুখে রামকে উপস্থিত করিতে।

মুক্তধারা ও রক্তকরবীতে সভ্যতার বর্ত্তমান সঙ্কটের সমাধান আছে এমন মনে করিবার কারণ নাই, সভ্যতার যন্ত্রজাত সঙ্কটই প্রদর্শিত হইয়াছে—আর প্রদর্শিত হইয়াছে তাহার মুক্তির পথটা। কবি বলিতে চাহিয়াছেন মুক্তি যখনই আসুক, যেভাবেই আসুক—ঐ প্রাণের পথেই আসিবে, বৃহত্তর যন্ত্রের পথে নয়, প্রচণ্ডতর অস্ত্রের পথে নয়। তাঁহার মতে শেষ পর্যন্ত প্রাণেরই জয় ঘোষিত হইবে, অচলায়তনে, ফাল্গুনীতে ও তাসের দেশে যেমন যৌবনের জয় ঘোষিত হইয়াছে। এসব স্থানে যৌবন ও প্রাণ মূলতঃ সমার্থক। যাহাদের উপলক্ষ্য করিয়া প্রাণের জয় ঘোষিত হইয়াছে তাহারা সকলেই যুবক;

পঞ্চক, (অচলায়তন) রাজপুত্র, (তাসের দেশ) জীবন সর্দ্দার, (ফাল্গুনী) অভিজিৎ, (মুক্তধারা) এবং রঞ্জন (রক্তকরবী) সকলেই যুবক। জলের সঙ্গে জলের ফেনার যে সম্পর্ক, প্রাণের সঙ্গে যৌবনের সেই সম্পর্ক—যৌবন প্রাণবন্যার ফেনা।

কালের যাত্রার রথটা ইতিহাস আর যে রজ্জুর টানে ইতিহাস চলে তাহা রথের দড়িটা। এতদিন ব্রাহ্মণ, যোদ্ধা ও ধনিকদের টানে রথ চলিয়াছে—কিন্তু এখন আর সে টান যথেষ্ট নয়—রথ আর চলিতেছে না—এবারে শ্রমিকের টান আবশ্যক। এ তো স্পষ্টতঃ যুগসমস্যা। কিন্তু শ্রমিক যদি ভাবিয়া বসে যে রথ চালাইবার ভার একমাত্র তাহারই উপরে—তবে রথ আবার অচল হইয়া পড়িবে। এই শেষেরটুকুই কবির সতর্কবাণী, যদিচ কেহ শুনিবে বলিয়া মনে হইতেছে না।

কবির দীক্ষায় ইউরোপ ও ভারতের অবস্থাবৈষম্যে তাহাদের ভাববৈষম্য প্রদর্শিত হইয়াছে। ইউরোপ অর্জ্জন করিতেই জানে ত্যাগ করিতে জানে না, ভারত ত্যাগ করিতে চায় বটে—কিন্তু যে উপার্জ্জন করে নাই সে ত্যাগ করিবে কি? এখন এই ঐতিহাসিক হেরফের ঘুচাইবার উপায়, কবির মতে—'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ' এই বাণী। ত্যাগের দ্বারা ভোগ করিতে যদি হয়, তবে ভারতকে প্রথম ঐশ্বর্য উৎপাদনের দীক্ষা লইতে হইবে, দরিদ্রের আবার ত্যাগ কোথায়—আর ইউরোপকে ত্যাগের দীক্ষা লইতে হইবে, কেন না, তাহার সঞ্চিত ধন মুক্তির পথ পাইতেছে না বলিয়া—ক্রমেই অধিকতর গুরুভার হইয়া তাহার অস্তিত্বকে নিষ্পেষিত করিতেছে—ইউরোপের কণ্ঠ হইতে নিঃসৃত সেই আর্তনাদ মানুষের ইতিহাসকে শঙ্কিত করিয়া তুলিয়াছে। কবির দীক্ষা এই যে, ইউরোপ ও ভারত ভোগ ও ত্যাগের হেরফের ঘুচাইয়া—'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ'—এই ব্রতবাণী গ্রহণ করুক।

৪

এখানে একটা বিষয়ের আলোচনা সারিয়া লওয়া অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। এডওয়ার্ড টমসন লিখিত 'রবীন্দ্রনাথ কবি ও নাট্যকার' গ্রন্থের শেষাংশে একজন বাঙালী সমালোচকের একখানি পত্র উদ্ধৃত হইয়াছে।১

এই অজ্ঞাত সমালোচক তাঁহার সমগোত্রীয় রসবোদ্ধাদের স্বনির্বাচিত প্রতিনিধি সাজিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, রবীন্দ্রসাহিত্যের সহিত ভারতীয় সাহিত্যের নাড়ির যোগ নাই, এমনকি ভাষাটাও বাঙালীর দুর্বোধ্য—তাঁহার মতে রবীন্দ্রসাহিত্য ইউরোপীয় সাহিত্যের দূরশ্রুত প্রতিধ্বনি ছাড়া আর কিছুই নয়।২

আমাদের আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে অভিযোগটি কতদূর সত্য?

রবীন্দ্রনাথের যৌবনকালে একটা সময় ছিল যখন এই শ্রেণীর রসবোদ্ধাগণ কবি বা সাহিত্যিক কিছুই নয় বলিয়া রবীন্দ্রনাথকে উড়াইয়া দিতে চেষ্টা করিত। এ পর্ব কিছুকাল চলিয়াছিল। তারপর নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির

১ Appendix A, 315-316. Rabindranath Poet and Dramatist by Edward Thompson, 2nd Ed. 1948.

এই প্রসঙ্গে একটা ঋণ স্বীকার করা কর্ত্তব্য মনে করি। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে ভারতীয় ও বিদেশীয় ভাষায় যতগুলি বই লিখিত হইয়াছে তন্মধ্যে বর্ত্তমান বইখানাকে সর্বশ্রেষ্ঠ মনে করিলে অন্যায় হইবে না। একথা এখানে না বলিলেও চলিত—কিন্তু টমসনের বই প্রথম প্রকাশের সময়ে বাঙালী পাঠক সমাজ ইহাকে সশ্রদ্ধ অভ্যর্থনা করে নাই,—বরঞ্চ বিপরীত মনোভাবই প্রকাশ করিয়াছিল। কেন, জানি না। আমরা রবীন্দ্রনাথের স্বদেশবাসী, স্বভাষাভাষী হইয়াও যাহা পারিলাম না, একজন বিদেশী তাহাই করিল—এই সূক্ষ্ম ঈর্ষাবোধবশতঃই কি? প্রথম অভিনন্দনের কাল বহুদিন গত, সত্য, কিন্তু বিলম্বিত অভিনন্দনের কাল কখনো যায় না। এতদিন পরে, প্রথম সুযোগে সেই বিলম্বিত অভিনন্দন সারিয়া লইলাম।

২ ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠীগত সংস্কারের দ্বারা সমালোচনা যে কতদূর রঞ্জিত হইতে পারে—পত্রখানা তাহার একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ। লেখকের নামটি জানিবার কৌতূহল সম্বরণ করা যায় না।

ফলে রবীন্দ্রনাথের যখন জগৎজোড়া খ্যাতি—তখন তাহারা সুর বদল করিল। কবি বা সাহিত্যিক নয় একথা বলিতে তখন তাহাদের সূক্ষ্ম বুদ্ধিতে বাধিত—কাজেই সূক্ষ্ম বুদ্ধির দল নূতন যুক্তির অবতারণা করিল—রবীন্দ্রসাহিত্য অভারতীয়, দেশের প্রাণবস্তুর (?) সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের নাড়ির যোগ নাই—এই হইল রবীন্দ্রবিদূষণার পরবর্ত্তী স্তর। টমসন উল্লিখিত পত্রখানি সেই সুরেরই প্রতিধ্বনি।

রবীন্দ্রসাহিত্য কি সত্যই অভারতীয়, সত্যই দেশের শিক্ষাদীক্ষা ও সভ্যতার সঙ্গে তাহার নাড়ির যোগ নাই? বিচারে নামিলে দেখা যাইবে যে ভারতীয় সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শনগুলির মতোই রবীন্দ্রসাহিত্য একান্তভাবে, ঘনিষ্ঠভাবে ভারতীয় জীবন হইতে উদ্ভূত, ভারতের সভ্যতার সঙ্গে জড়িত—এবং ঠিক সেই কারণেই বিশ্বের আদরণীয় বস্তু। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে সম্যক রবীন্দ্রসাহিত্য বিচারের অবকাশ নাই, কেবল তত্ত্বনাট্যগুলিরই বিচার চলিতে পারে। তাহাই করিব, আর দেখাইতে চেষ্টা করিব যে আপাতঃ অভারতীয়ত্ব সত্ত্বেও রবীন্দ্রতত্ত্বনাট্যগুলির মূলতত্ত্বসমূহ অভারতীয় তো নয়ই বরঞ্চ একান্তভাবে ভারতীয়। দেশের মর্মবাণী মহাকবিগণকে আশ্রয় করিয়াই প্রকাশ পায়—ক্ষুদ্র গোষ্ঠীচারী সমালোচক তাহা জানিবে কি প্রকারে?

৫

প্রথমে নাটকগুলির আকৃতি ও প্রকৃতির বিচারে নামা যাইতে পারে, পরে প্রয়োজন হইলে আরও কিছু প্রাসঙ্গিক আলোচনা করা যাইতে পারিবে। প্রথমে প্রকৃতির কথাই ধরা যাক।

রবীন্দ্রনাথ সাধারণভাবে বলিয়াছেন যে, 'সীমার মধ্যে অসীমের সহিত মিলন সাধনের পালাই' তাঁহার সমস্ত রচনার মূল কথা। একথা প্রকৃতির প্রতিশোধ সম্বন্ধে বিশেষভাবে প্রযোজ্য। এখন, এই পালাটি কেবল রবীন্দ্র সাহিত্যের নয়—ভারতীয় সাধানারও মূল কথা। ভারতের সমস্ত ধর্মশাস্ত্রের সঙ্গে এই

বাণীটি জড়িত, ঋগ্‌বেদ হইতে শুরু করিয়া উপনিষদের ধারা বাহিয়া এই বাণী গীতা, চণ্ডী এবং মধ্যযুগের সাধকগণের রচনা পর্যন্ত আসিয়া পৌছিয়াছে। ভারতীয় সমস্ত শাস্ত্রের মধ্যে উপনিষদ্ তন্মধ্যে আবার ঈশোপনিষৎ রবীন্দ্রনাথের সবচেয়ে প্রিয়। ঈশোপনিষদের যে-কোন পাতা উল্টাইলে এই বাণীবহ শ্লোক পাওয়া যাইবে। বলা বাহুল্য রবীন্দ্রনাথ সেখান হইতেই ইঙ্গিতটি পাইয়াছেন এবং নিজের জীবনের সাধনার দ্বারা, প্রতিভার দ্বারা, তাহাকে অঙ্কুরিত পল্লবিত করিয়া তুলিয়াছেন—পুরাণী প্রজ্ঞাকে আধুনিক জীবনের গ্রহণযোগ্য করিয়া তুলিয়াছেন। প্রাকৃতির প্রতিশোধ এই বাণীরই শিল্পরূপ। ইহার রহস্য সন্ধানের জন্য ভারতের বাহিরে যাইবার কোন প্রয়োজন নাই। প্রকৃতির প্রতিশোধের সন্ন্যাসীর ভ্রমটা কি? সে ভুলিয়া গিয়াছিল যে ব্রহ্ম সংসারাতীত নহেন, তিনি দূরেও আছেন, নিকটেও আছেন, তিনি অন্তরেও আছেন, বাহিরেও আছেন—তিনি সর্ব্বত্রব্যাপী, সর্ব্বত্রকে অতিক্রম করিয়া কোথাও গুহাহিত হইয়া নাই। ১

"যাহারা অবিদ্যার উপাসনা করে তাহারা অন্ধতমে প্রবেশ করে, আর যাহারা কেবল দেবতা চিন্তায় নিরত থাকে তাহারা তদপেক্ষাও অধিক অন্ধতমে প্রবেশ করে।"২ সন্ন্যাসী কি তাই করে নাই? রবীন্দ্রনাথের মতে উক্ত নাটকের প্রাকৃত নরনারীর চেয়ে সন্ন্যাসীর ভ্রম অধিক মারাত্মক। বিদ্যা ও অবিদ্যা (ব্রহ্ম ও জগৎ) সম্ভূতি ও অসম্ভূতির (প্রকৃতি ও হিরণ্যগর্ভাদি) উপাসনা একত্র করিবার বুদ্ধি সন্ন্যাসীর হয় নাই বলিয়াই প্রকৃতি অবশেষে তাহার উপরে প্রতিশোধ লইতে সক্ষম হইয়াছিল।৩ যে হিরন্ময় পাত্রের দ্বারা সত্যের মুখ আবৃত, সাধনার দ্বারা সন্ন্যাসী তাহা খুলিবার চেষ্টা করে

---

১ ঈশোপনিষদ্ শ্লোক সংখ্যা ১।৫॥

মূল নির্দেশের জন্য লেখক শ্রীক্ষিতিমোহন সেনশাস্ত্রীর নিকট ঋণী।

২ তদেব শ্লোক সংখ্যা ৯॥

৩ তদেব শ্লোক সংখ্যা ১১॥১২॥১৪॥

নাই। বেচারা ঐ হিরণ্ময় মুখাবরণে নিজের মুখের প্রতিবিম্ব দেখিয়া ভাবিয়াছিল যে তাহার সত্যদর্শন ঘটিয়াছে।১ এই মৌলিক ভ্রম হইতেই সন্ন্যাসীর সাধনার ব্যর্থতা। ইহার মধ্যে কোথায় অভারতীয়ত্ব? ইহা তো ভারতীয় সাধনার মূল কথা।

এবারে শারদোৎসবে আসা যাক। শারদোৎসবের মূল কথা প্রেমের দ্বারা প্রকৃতির ঋণ শোধের চেষ্টা। এই কারণেই শারদোৎসবের পরবর্ত্তী সংস্করণের নাম ঋণশোধ। আমাদের শাস্ত্রে দেবঋণ, ঋষিঋণ, পিতৃঋণ শোধের উল্লেখ আছে। প্রকৃতির ঋণশোধের উল্লেখ অবশ্য নাই। কিন্তু স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, রবীন্দ্রনাথ-কল্পিত প্রকৃতির ঋণশোধের মূলে ঐ পুরাতন ঋণ-শোধের ভাবটাই সক্রিয়। মানুষের জীবনধারণের জন্য প্রকৃতিকে উপকরণ-রূপে ব্যবহার না করিয়া উপায় নাই। কিন্তু উপকরণরূপে ব্যবহার করিবার সময়েও যদি আমরা সচেতনভাবে করি, কৃতজ্ঞতার ভাব অনুভব করি—তাহা হইলেই ঋণশোধ হয়। এই ভাবটি আমাদের লোকজীবনে প্রবেশ করিয়া গিয়াছে। এখনো দেখিতে পাওয়া যায় যে, কাঠুরিয়াগণ গাছ কাটিবার জন্য কুড়াল তুলিবার পূর্ব্বে বৃক্ষটির উদ্দেশে তিনবার সেলাম করিয়া লয়। সেও ঐ ঋণশোধের অঙ্গ। তাহারা যেন বলিতে চায়—তোমার কাষ্ঠ ব্যতীত আমার জীবনধারণ অসম্ভব, কিন্তু আমি অকৃতজ্ঞ নহি, তুমি যে কাষ্ঠ দান করিতেছে, আমি তজ্জন্য তোমাকে অভিবাদন জানাইতেছি। কাজেই কি শাস্ত্র, কি লোকব্যবহার সর্ব্বত্র—ঋণশোধের ভাবটি পরিব্যাপ্ত। রবীন্দ্রনাথ সেই ভাবটিকেই অপরূপ কলাকবিত্বময়, আধ্যাত্মিক ইঙ্গিতে পূর্ণ শিল্পবস্তুতে পরিণত করিয়াছেন। ইহার রহস্যের মূল এই দেশেই আছে—অন্যত্র যাইবার প্রয়োজন নাই।

এবারে রাজা। ইহাতে দাস্য, সখ্য ও মধুরভাবে রাজাকে ভজনার যে ইঙ্গিত প্রদত্ত হইয়াছে তাহা কি বিশেষভাবেই এদেশের কথা নহে? রাজা

১ তদেব শ্লোক সংখ্যা ১৫॥

যিনি অরূপরতন (রাজার পরবর্তী সংস্করণের নাম অরূপরতন), যিনি একাধারে বীতরূপ ও সর্ব্বরূপ—তিনি তো বিশেষভাবেই ভারতীয় ধর্ম্মসাধনার লক্ষ্য! প্রকৃতির প্রতিশোধের সন্ন্যাসী যে ভুল করিয়াছিল, রাণী সুদর্শনাও সেই রকম ভুলই করিয়াছিল। তবে দুজনের ভুল দুই ভিন্ন পথে আসিয়াছে। সন্ন্যাসী জগৎকে বাদ দিয়া ব্রহ্মকে নির্বিশেষরূপে দেখিতে চেষ্টা করিয়াছিল আর সুদর্শনা নির্বিশেষকে বাদ দিয়া রাজাকে বিশিষ্ট মানব মূর্তিতে দেখিতে চাহিয়াছিল। রাণী কেবলমাত্র অবিদ্যার বা অসম্ভূতির সাধনা করিয়াছিল আর সন্ন্যাসী কেবলমাত্র বিদ্যার বা সম্ভূতির সাধনা করিয়াছিল। এ দুই ভুলের মধ্যে সন্ন্যাসীর ভুলটাই বেশী মারাত্মক। সেই জন্যই দেখিতে পাই যে, সন্ন্যাসীর জীবন ট্রাজেডিতে পরিসমাপ্ত হইল আর রাণী দুঃখ সাধনার অন্তে লক্ষ্যে পোঁছুতে সিদ্ধকাম হইয়াছিল।

অতঃপর ডাকঘর। ডাকঘরে অমল ও মাধব দত্তের সম্পর্কটি স্মরণ রাখিয়া অগ্রসর হইতে হইবে। দুজনের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক, কিন্তু একজনের মুখ বিশ্বের দিকে আর একজনের মুখ গৃহের দিকে। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'দুই পাখী' শীর্ষক কবিতাটি স্মরণযোগ্য। বনের পাখী ও খাঁচার পাখীর মধ্যে সম্পর্ক প্রেমের—কিন্তু কেহ কাহাকেও বুঝিতে পারে না। অমল ও মাধব দত্তের মধ্যেও কি সেই সম্পর্ক নয়? পাখী দুটির এবং অমল ও মাধব দত্তের বিচিত্র সম্পর্কের মূলে একটি প্রাচীন শাস্ত্রীয় ইঙ্গিত আছে বলিয়া আমার বিশ্বাস।

"দুই সুন্দর পক্ষী এক বৃক্ষ অবলম্বন করিয়া রহিয়াছেন; তাঁহারা সর্বত্র থাকেন এবং উভয়ে পরস্পরের সখা। তন্মধ্যে একটি সুখেতে ফল ভোজন করেন এবং অন্য নিরশন থাকিয়া কেবল দর্শন করেন।"[১]

অবশ্য এ দুটি পাখীর একটি জীবাত্মা অপরটি পরমাত্মা। অমল ও মাধব দত্ত সম্পর্কে সে কথা প্রযোজ্য নয়। সে সম্বন্ধ আরোপের প্রয়োজনও নাই। আমার বক্তব্য এই যে শাস্ত্রে যে অর্থেই এ শ্লোকটি কথিত হইয়া থাক্—পরস্পর

১ ঋগ্বেদ ১।১৬৪।২০; মুণ্ড ৩।১।১; শ্বেতা ৪।৬

সখ্যভাবে বদ্ধ পাখী তুইটির চিত্র অমল ও মাধব দত্তের চিত্র অঙ্কনে খুব সম্ভব রবীন্দ্রনাথকে সাহায্য করিয়াছিল। তুজনে একই গৃহে অবস্থিত, তুজনের মধ্যে, প্রেমের সম্পর্ক, অথচ একজন উদাসীন, অপরজন আসক্ত—এসব কথা মনে রাখিলে আমার এই কল্পনাকে অলীক বা একেবারে অবাস্তব বলিয়া মনে হইবে না। আর এ সম্পর্কটির চিত্র বিশ্লেষণই তো ডাকঘরের নাটকীয় রস। অতএব দেখা যাইতেছে, এখানেও আমরা দেশের সাধনপন্থার উপরেই আছি।

এবারে অচলায়তন নাটকে আসা যাইতে পারে। এই নাটকখানাতেও দেখিতে পাইব যে, ভারতীয় সাধনপন্থার কথাই উক্ত হইয়াছে। অচলায়তনিকদের পন্থা জ্ঞানমার্গ, শোণপাংশুদের পন্থা কর্মমার্গ আর দর্ভক পল্লীবাসীদের পন্থা ভক্তিমার্গ। এই তিনটি ভিন্ন মার্গের মধ্যে সমন্বয়ের চেষ্টা হইয়াছে অচলায়তন নাটকে। আর এই তিনের মধ্যে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা কি ভারতীয় সাধনারও চরম কথা নয়? তবে প্রভেদের মধ্যে এই যে, শাস্ত্রে যাহা সাধারণভাবে কথিত হইয়াছে, রবীন্দ্রনাথ তাহাকে বর্তমান পারস্থিতিতে আরোপ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। সেখানে কবি ও মনীষী হিসাবে তাঁহার কৃতিত্ব। কিন্তু মূলভাবটি তিনি প্রাচীন শাস্ত্র হইতেই গ্রহণ করিয়াছেন। এখন এসব কথা চিন্তা না করিয়া রবীন্দ্রসাহিত্যের সহিত ভারতীয় সাধনার বা ভারতীয় জীবনের যোগ নাই, এমন কথা অশ্রদ্ধেয়।

সত্য বটে ফাল্গুনী নাটকের মূলে কোন প্রাচীন শাস্ত্রীয় নজির নাই। কিন্তু মনে রাখা আবশ্যক নাটকটি কবির ব্যক্তিগত জীবনবেদনা হইতে উদ্ভূত। একদিকে এই বেদনার সাক্ষ্য—অন্যদিকে প্রকৃতির সাক্ষ্য। ঋতু পরম্পরার মধ্য দিয়া অনন্ত যৌবনের যে লীলা বিশ্বে নিত্য প্রত্যক্ষ যে লীলার নজিরে মানবের সমষ্টিগত যৌবনকেও কবি নিত্য বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছেন তাহাই ফাল্গুনী নাটকের উপজীব্যের মূলে। ভারতীয় শাস্ত্রের পরিবর্তে বিশ্ব প্রকৃতির শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া কবি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছেন। যৌবনবেদনাজাত আরও একটি নাটক আছে—তাসের দেশ। ইহার মূলে

শাস্ত্রের ইঙ্গিত নাই বটে, তবে জীবনের ইঙ্গিত আছে। তাহা ছাড়া অচলায়তনে যেমন যৌবনের দূত বিদেশী শোণপাংশুগণ, এখানে তেমনি যৌবনের দূত দ্বীপান্তর হইতে আগত রাজপুত্র। এ দুটি ঘটনার মূলেই ঐতিহাসিক একটি ঘটনার সূক্ষ্ম ইঙ্গিত আছে। বিদেশী ইংরেজ আমাদের স্থবির দেশে আসিয়া যে বিরাট বিপ্লব ঘটাইয়া দিয়াছে খুব সম্ভব প্রত্যক্ষভাবে সে ভাবটি কবির মনে কাজ করিতেছিল। তাহা যদি হয় তবে বুঝিতে হইবে অচলায়তন ও তাসের দেশের পরিবর্তন বুঝিবার জন্য কবিকে অন্যত্র যাইতে হয় নাই—দেশে বসিয়াই লক্ষ্য করিতে পারিয়াছিলেন।

যে নাটকগুলিকে সভ্যতার সঙ্কট সম্পর্কিত বলিয়াছি তাহাদের বিষয়ে বক্তব্য এই যে, রবীন্দ্রনাথ যেমন ভারতীয়, তেমনি তিনি স্বকালীয়ও বটেন। ভারতের প্রাচীন বাণী তাঁহার প্রতিভায় যেমন নূতন জীবন পাইয়াছে, তেমনি তাঁহার স্বকালের অনেক জীবন সমস্যাও তাঁহার প্রতিভায় আশ্রয় খুঁজিয়াছে। বর্তমানে সভ্যতার যে সঙ্কট দেখা দিয়াছে ঠিক এমনটি এভাবে প্রাচীনকালে দেখা দেয় নাই! এ সমস্যা বিশেষভাবে এ কালেরই, আর যেহেতু তিনি বিশেষভাবে এই কালের লোক—তাঁহাকে এ সমস্যা সম্বন্ধেও চিন্তা করিতে হইয়াছে, চিন্তার ফলকে একদিকে যেমন প্রবন্ধাদিতে প্রকাশ করিয়াছেন—আর একদিকে তাহাকে তেমনি বাণীমূর্তি দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। সেই বাণীমূর্তিগুলিই এক্ষেত্রে সভ্যতার সঙ্কট সম্পর্কিত নাটক, মুক্তধারা, রক্তকরবী, কালের যাত্রা ও কবির দীক্ষা।

মহাকবি মাত্রকেই স্বকাল সম্বন্ধে, স্বকালের বিশেষ সমস্যা সম্বন্ধে চিন্তা করিতে হয়, আর স্বকালের উপাদানে তাঁহারা চিরকালের মূর্তি গড়িয়া রাখিয়া যান। হোমার হইতে শেক্সপীয়র গ্যেটে পর্যন্ত, ব্যাস বাল্মীকি কালিদাস হইতে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত কেহই এ নিয়মের ব্যতিক্রম নহেন। রবীন্দ্রনাথ যেমন ভারতের প্রাচীন বাণীকে নূতন ছাঁচে ঢালিয়াছেন, তেমনি বর্তমান জীবনের নূতন বাণীকেও চিরকালীন ছাঁচে ঢালাই করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ইহাতে অস্বাভাবিক কিছুই নাই। তাঁহার উপরে

স্বকালের যে দাবী আছে তাহাকে স্বীকার করিয়াছেন মাত্র। এই শ্রেণীর নাটকগুলিতে যদি বিরুদ্ধ সমালোচকগণ প্রাচীন বাণী খুঁজিয়া না পান, তবে, তাহা দোষ নহে, বরঞ্চ ইহার বিপরীত ঘটিলেই দোষ হইতে পারিত, স্বকালের দাবীকে অবহেলার মহৎ দোষ। তবু ভারতীয় বাণীর যে একেবারে অভাব আছে এমন নয়। কবির দীক্ষায় ইউরোপ ও ভারতের স্বভাবের হেরফের ঘুচাইবার নিমিত্ত প্রতিকারের যে উপায় কবি নির্দেশ করিয়াছেন—'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ'—তাহা একান্তভাবেই ভারতীয়, বোধকরি এই বাণীটি রবীন্দ্রনাথের সবচেয়ে প্রিয়।

প্রাচীন শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি আছে এমন কোন সমালোচক উদ্যত হইলে রবীন্দ্রসাহিত্য এবং প্রাচীন শাস্ত্র ও সাহিত্যের মধ্যে আরও গভীর, আরও নিবিড় যোগ আবিষ্কার করিতে পারিবেন। কিন্তু এখানে যতটুকু বলা হইল তাহাতেই নিশ্চয় প্রমাণ হইয়াছে যে, রবীন্দ্র সাহিত্যের সঙ্গে ভারতীয়তার নাড়ির যোগ নাই—এই দায়িত্বহীন উক্তি যেমন অবাস্তব, তেমনি অশ্রদ্ধেয়।

৬

এবারে নাটকগুলির আকৃতি সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যাইতে পারে। তাহাতেও দেখা যাইবে যে, তাঁহার নাটকগুলির অন্ততঃ তত্ত্বনাটকগুলির টেকনিকের মূলে কোন বিদেশীয় নাটকের আদর্শ নাই, আছে দেশীয় লোক-জীবনের Pattern বা কাঠামোর আদর্শ। গোড়া হইতেই সেই আদর্শকে তিনি অনুসরণ করিতে ও আত্মস্থ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন—আর অপ্রত্যাশিত-রূপে সাফল্যলাভ করিয়াছেন।

প্রকৃতির প্রতিশোধের আলোচনায় বলিয়াছি যে, এই নাটকখানিতেই কবির নিজস্ব নাটকীয় টেকনিক প্রথমে নিঃসংশয়রূপে দেখা দিয়াছে। সেটি কি? নাটকখানির অধিকাংশ দৃশ্য আলোচনা করিলে দেখা যায়—এগুলি একটি পথ ও বিচিত্র জনসমাবেশের সমন্বয় ছাড়া আর কিছুই নহে। তাঁহার পরবর্তী

তত্ত্বনাট্যসমূহ এই দুটি বস্তুকেই ক্রমে অধিকতর বাস্তব, অধিকতর সুষ্ঠু ও শিল্পসম্মত রূপে ধরিতে চেষ্টা করিয়াছে এবং শেষ পর্যন্ত যে Pattern বা কাঠামোয় তিনি উপনীত হইয়াছেন তাহা একটি মেলা ও মেলাটির নিকটবর্তী একটি পথ। এটাই তাঁহার আদর্শ। তবে প্রয়োজন ও অবস্থা ভেদে ইহার সামান্য তারতম্য ঘটিয়াছে। ১

প্রকৃতির প্রতিশোধের পরে অনেকদিন তিনি তত্ত্বনাট্য লেখেন নাই। এই সময়টায় বিসর্জ্জন, রাজা ও রাণী, গান্ধারীর আবেদন, চিত্রাঙ্গদা প্রভৃতি কাব্যনাট্য লিখিত হয়। এগুলি হয় শেক্সপীরীয় ধরণের ট্রাজেডি, নয় কাব্যধর্মী নাটক, কাজেই এখানে পূর্ব্বোক্ত টেকনিক প্রকাশের স্বাধীনতা তাঁহার ছিল না। শারদোৎসব নাটকে পুনরায় তত্ত্বনাট্যের ধারা দেখা দেয় এবং সেই পূর্ব্বোক্ত টেকনিকও দেখা দিতে থাকে।

শারদোৎসব নাটকের ঘটনাস্থান বেতসিনী নদীর তীর ও নদীর তীরবর্ত্তী পথ।

রাজা নাটকের অনেকটা জায়গা জুড়িয়াই পথ এবং সেই পথ গিয়াছে বসন্তোৎসবের মেলার দিকে। নাটকের প্রথম দৃশ্যে অন্ধকার ঘর—আর শেষ দৃশ্যে একটি পথ, যে পথে রাজা সুদর্শনাকে বাহির করিয়াছেন। শুধু রাণী নয় কবি নিজেও ঐ পথে বাহির হইয়াছেন ; রাণী বরণ করিয়াছে পথকে রাজার সহিত মিলনের সূত্ররূপে, কবি বরণ করিয়াছেন পথকে তাঁহার চরম টেকনিক-রূপে !

ডাকঘরে দেখি অমলের রোগশয্যা যে বাতায়নের ধারে তাহার সম্মুখে একটি পথ—ঐ পথেই নাটকের অধিকাংশ ঘটনা ঘটিয়াছে।

অচলায়তনেও এই পথের প্রাধান্য। প্রথম দৃশ্যটি পথের দৃশ্য, পঞ্চকের মুখের প্রথম গানটি 'এ পথ গেছে কোন্‌খানে'।

ফাল্গুনীর নাট্যদৃশ্য 'পথে প্রান্তরে বনে বাদাড়ে' ঘটিয়াছে এবং যে চরম পথকে

১ টমসন তাঁহার গ্রন্থে এটি প্রথম লক্ষ্য করিয়াছেন।

অনুসরণ করিয়া নবযৌবনের দল যাত্রা করিয়াছে—তাহার চূড়ান্ত পরিণাম পরম রহস্যময় গুহামুখে।

মুক্তধারাকে তত্ত্বনাট্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়াছি, সেটি এই কারণেও বটে। পথ ও মেলার দৃশ্যটি এখানে প্রায় পূর্ণরূপে দেখা দিয়াছে। নাট্যদৃশ্য সমস্তটাই একটানা পথের উপরে ঘটিয়াছে, ঘটনায় কোথাও ছেদ নাই এবং এই পথিক জনতার লক্ষ্য ভৈরবমন্দির, সেখানে পূজোপলক্ষ্যে সমস্ত রাজ্যের অধিবাসীর সমবেত হইবার কথা।

রক্তকরবী নাটকেরও একটি মাত্র দৃশ্য, রাজার জালায়নের বাহিরের পথ। এই পথকে অবলম্বন করিয়াই ঘটনাস্রোত প্রবাহিত হইয়াছে।

কালের যাত্রা তো পথেরই নাটক, যে পথে রথ অচল আর জনতা চলমান।

বাংলা দেশের লোকজীবনের একটি প্রধান অঙ্গ পথপার্শ্ববর্তী মেলা। এইসব মেলায় বিচিত্র ধরণের, বিচিত্র স্বভাবের এবং বিভিন্ন উদ্দেশ্যের লোক সমবেত হইয়া থাকে। ইহার Pattern-এ একদিকে যেমন বৈচিত্র্য, আর একদিকে তেমনি সরলতা। লোকজীবনের এই অতি সাধারণ, অথচ মনোরম ও বিচিত্র ছবিকেই রবীন্দ্রনাথ তাঁহার তত্ত্বনাট্যের ছাঁচ বা প্যাটার্নরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গেই বলা যাইতে পারে যে, তাঁহার অধিকাংশ নাটকে যে জনতা দৃষ্ট হয় তাহা এই প্যাটার্নেরই অঙ্গ; যে গানের দল ও ঠাকুর্দা দৃষ্ট হয় তাহাদেরও অনুরূপ মেলাগুলিতে দেখিতে পাওয়া যায়। ফকির ও বাউলের দল নাই, এমন মেলা বাংলা দেশে বিরল। যাত্রা গানে যে জুড়ি ও গানের দল দেখা যাইত, (এখনকার থিয়েটারঘেঁষা যাত্রায় ওসব আর থাকে না) তাহা এই মেলার গায়কদলের আদর্শেই গঠিত। রবীন্দ্রনাথের গানের দল ও ঠাকুর্দার মূলে মেলার প্রভাব ও যাত্রার প্রভাব দুই-ই আছে বলিয়া বিশ্বাস।

আমার এইসব উক্তি ও অনুমান যদি সত্য বলিয়া গৃহীত হয়, তবে বুঝিতে পারা যাইবে যেসব "খাঁটি বাঙালী" নাট্যকার শেক্সপীরীয় ধরণের ট্রাজেডি বা মোলিয়ার-ভাঙা কমেডি লিখিয়াছেন—রবীন্দ্রনাথের নাটক, এখানে তত্ত্ব-নাট্যগুলি, কি আকৃতির বিচারে, কি প্রকৃতির বিচারে তাঁহাদের নাটকের

চেয়ে অনেক বেশি "খাঁটি দেশী" এবং সেইজন্যই অনেক বেশি বাস্তব। লোক-জীবনের সঙ্গে রবীন্দ্রসাহিত্যের কোন সম্পর্ক নাই বলিয়া যাঁহারা খেদ করিয়া থাকেন তাঁহারাও অবহিত ও আশ্বস্ত হইতে পারেন। তাঁহাদের খেদের কারণ নাই, কেননা, এমনভাবে লোকজীবন ও দেশের গভীরতর জীবনোপলব্ধির উপরে আর কাহারও রচনা প্রতিষ্ঠিত নহে।

৭

রবীন্দ্রসাহিত্য যে অনেকের কাছে দুর্বোধ্য ও অভারতীয় বোধ হয় তাহার একটা কারণ অপঠিত পাণ্ডিত্য। অনেকেই রবীন্দ্রসাহিত্য আংশিকমাত্র পড়িয়া বা একেবারেই না পড়িয়া, কিংবা জনশ্রুতিযোগে মাত্র শুনিয়া সমালোচনা করিতে বসেন—এমনস্থলে সুবিচার যে হয় না তাহা বলাই বাহুল্য। এই ধরণের সমালোচনারীতি আগে খুব প্রচলিত ছিল, এখন যে একেবারে লুপ্ত হইয়াছে এমন বলা চলে না। তারপর সমালোচকগণের ক্ষুদ্রগোষ্ঠির মধ্যে যেসব কথা কথিত হয়, বা যেসব চিন্তা চিন্তিত হয়, তাহাকেই তাঁহারা দেশের তথা ভারতীয় বাণী বলিয়া মনে করেন, আর রবীন্দ্রসাহিত্যে তাহার প্রতিধ্বনি না পাইলে তাহাকে সরাসরি অভারতীয় বলিয়া মনে করেন। এখন ইহার প্রতিকার কি? আর যাই হোক কবিকে এজন্য দায়ী করা চলে না।

রবীন্দ্রসাহিত্য দুর্বোধ্য লাগিবার আরও একটি কারণ আছে। রবীন্দ্রনাথের বাক্‌ভঙ্গী অনেকাংশে নূতন। প্রত্যেক মহাকবির বাক্‌ভঙ্গীই নূতন, ইহা তাঁহার মহাকবিত্বেরই বিভূতি। তিনি যে ঈশ্বর গুপ্ত বা অন্য প্রাচীনতর, বাঙালী কবির প্রতিধ্বনি করিবেন না—ইহাই তো স্বাভাবিক। তারপরে তিনি এমন অনেক উপমা ও অলঙ্কারের সৃষ্টি করিয়াছেন—যাহা বাঙলার সাহিত্য কেন সংস্কৃত সাহিত্যেও নূতন—ইহাও তাঁহার প্রতিভার স্বাভাবিক বিভূতি। এসব তাঁহার গুণ, দোষ নয়। আর এজন্য তাঁহাকে অভারতীয় বলিব কেন? ভারতীয় সাহিত্যের বাক্‌ভঙ্গী চিরকালের জন্য স্থিরীকৃত হইয়া

গিয়াছে এমন হইতেই পারে না। লৌকিক কবিগণ যাহা প্রতিষ্ঠিত তাহার অনুসরণ করেন, মহাকবিগণ নূতন বাণীমার্গ রচনা করিয়া সেই পথে চলেন। কালিদাসের কাব্য প্রথম রচনাকালে এই জাতীয় সমালোচকের কাছে নিশ্চয় তাহা "অভারতীয়" বলিয়া বোধ হইয়াছিল। তাছাড়া রবীন্দ্রনাথের কাছে ইংরাজি সাহিত্য সুপরিচিত কাজেই তাহার প্রভাবও তাঁহার কাব্যে অর্থাৎ চিন্তায় ও বাক্‌ভঙ্গীতে পড়িয়াছে—ইহাও স্বাভাবিক, নিন্দার নয়। একটি মহৎ সাহিত্য পড়িলাম অথচ তাহা দ্বারা প্রভাবিত হইলাম না—ইহা প্রশংসার নয়। রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে বিদেশী সাহিত্যের প্রভাব আত্মস্থ হইয়া রবীন্দ্রনাথীয় বস্তুতে পরিণত হইয়াছে কাজেই তাহাকে আর বিদেশীয় বলা উচিত নয়। টমসন কর্তৃক উদ্ধৃত সমালোচক বলিয়াছেন যে ইংরাজি অভিজ্ঞ পাঠকই কেবল রবীন্দ্রসাহিত্য বুঝিতে সক্ষম। তাহা যদি হয় তবে উক্ত সমালোচকের বাধিল কেন? কারণ তিনি পূর্বসংস্কার লইয়া রবীন্দ্রসাহিত্য সমালোচনায় নামিয়াছিলেন। আসল কথা এই যে রসবোধের প্রসারের উপরে রবীন্দ্রসাহিত্য বা যে-কোন মহৎ সাহিত্যের রসোপলব্ধির নির্ভর। একালে ইংরাজি সাহিত্য আমাদের রসবোধকে প্রসারিত করিতে সাহায্য করিয়াছে। কেবল সংস্কৃত সাহিত্যে পণ্ডিত ব্যক্তির অপেক্ষা ইংরাজি সাহিত্যে পণ্ডিত ব্যক্তির কাছে কালিদাসের কবিবিভূতি অধিকতর প্রকাশিত হইবে বলিয়া আমার বিশ্বাস। কারণ তিনি কালিদাসকে পৃথিবীর মহাকবিগণের পরিপ্রেক্ষিতে স্থাপিত করিতে পারিবেন। রবীন্দ্রবিচারের পটভূমি কেবল ঈশ্বরগুপ্ত বা বৈষ্ণবগণ নহেন, এমনকি শুধু ব্যাস, বাল্মীকি বা কালিদাসের পটভূমিতে তাঁহাকে স্থাপন করাও যথেষ্ট নহে। ভারতীয় ও বিদেশীয় মহাকবিগণের সান্নিধ্যে তাঁহাকে রক্ষা করিলে তবেই তাঁহার মহত্ত্ব, তাঁহার কবিবিভূতি সম্যক উপলব্ধ হইবে এবং রবীন্দ্রসাহিত্যের দোষত্রুটিরও স্বরূপ বুঝিতে পারা যাইবে। রবীন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্যকে বিশ্ব-সাহিত্যের পর্যায়ে উন্নীত করুন বা না করুন, তিনি নিজেকে বিশ্ব-সাহিত্যিকগণের সান্নিধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। ইংলণ্ডের বা ইটালীর অশিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত লোকে

শেক্সপীয়র বা দান্তের কাব্য বোঝেঁ কি না জানি না (বোঝে না বলিয়াই আমার বিশ্বাস), কিন্তু তজ্জন্য কেহ তাঁহাদের অ-ইংলণ্ডীয় বা অ-ইটালীঁয় বলে নাই তবে আমরাই বা অশিক্ষিত বা অর্ধ-শিক্ষিতের নজিরে রবীন্দ্রনাথকে অভারতীয় বলিব কেন? মহৎ সাহিত্যের রসবোধ সুশিক্ষার ফল। পাঠকের সে ক্রটির দায় লেখক বহন করিতে যাইবেন কেন? রসবোধের ক্ষমতায় যিনি বঞ্চিত কাব্য সমালোচনার ক্ষমতা তাঁহার সুপ্রচুর একথা কে মানিবে? ফলকথা উক্ত লেখকের উক্তি কাব্য সমালোচনা নয়, আপন ক্ষুদ্র মনের পূর্ব্ব সংস্কারের ছায়াপাত মাত্র। উক্ত সমালোচনার দ্বারা কেবল নিজেকেই তিনি অরসিক প্রতিপন্ন করেন নাই, যাঁহাদের প্রতিনিধিত্ব প্রয়াস পাইয়াছেন তাঁহাদেরও অরসিক প্রতিপন্ন কঁরিয়াছেন। রসবোধের প্রবলতম অন্তরায় পূর্ব্ব সংস্কার।

প্রকৃতির প্রতিশোধ

রবীন্দ্রকাব্যপ্রবাহে সন্ধ্যাসঙ্গীতের, বিশেষ প্রভাত সঙ্গীতের যে স্থান ও মূল্য, রবীন্দ্রনাট্যপ্রবাহে প্রকৃতির প্রতিশোধ নাটকটির সেই স্থান ও মূল্য। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার প্রকাশযোগ্য কাব্য ও কবিতার সূত্রপাত সন্ধ্যা সঙ্গীত হইতে মনে করিতেন, তৎপূর্বে রচিত ও প্রকাশিত কাব্যাদি তিনি পরে আর প্রকাশ করেন নাই—রবীন্দ্র রচনাবলী প্রকাশের সময়ে যেসব 'অচলিত সংগ্রহের' অন্তর্ভুক্ত হইয়া বাহির হইয়াছে, তাহাও আবার প্রকাশক-মণ্ডলীর নিতান্ত নির্বন্ধাতিশয্যে। প্রকৃতির প্রতিশোধের পূর্বে লিখিত 'রুদ্রচণ্ড' নামে পূর্ণাঙ্গ নাটকখানি সম্বন্ধেও কবি ঐ একই ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন, 'অচলিত সংগ্রহ' প্রকাশের পূর্বে আর তাহা পুনর্মুদ্রিত হয় নাই।

কবি বিশ্বাস করিতেন যে, সন্ধ্যা সঙ্গীতের ভাঙা ছন্দে এবং ছায়াময়-ভাবে প্রথম তিনি স্বকীয় রচনারীতিকে পাইয়াছেন—আর প্রভাত সঙ্গীতের নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ ও প্রভাত-উৎসব কবিতা দুটিতে যে আকস্মিক অনুভূতির প্রকাশ—তাহাতেই তাঁহার স্বকীয় ভাব-জীবনের প্রথম অরুণোদয়। এইরূপ মনে করিতেন বলিয়াই পরবর্তীকালে এই দুইখানি কাব্য সম্বন্ধে তিনি যত আলোচনা ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন—পরিণত কাব্যগুলি সম্বন্ধে তত নয়।

প্রকৃতির প্রতিশোধ সম্বন্ধেও কবির মনোভাব ও ব্যবহার অনুরূপ। বলা বাহুল্য, প্রকৃতির প্রতিশোধ কি নাট্য হিসাবে, কি কাব্য হিসাবে অর্থাৎ শিল্প সৃষ্টি হিসাবে অত্যন্ত অপরিণত, আর জীবনতত্ত্ব হিসাবে একান্ত অস্পষ্ট। প্রত্যেক পাঠকের মতো কবিও এই স্থূল সত্যটা জানিতেন। তবু যে এই রচনাটির উপরে এত মমত্ব, তার কারণ অপরিণত

মাটির পুতুল যেমন তাহার সৃষ্টি-রহস্য সহজে প্রকাশ করিয়া দেয়, এই অপরিণত রচনাটি কবির কাছে তেমনি সহজে রচনা-রীতির রহস্য উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিয়াছে—আর জীবনতত্ত্বের অস্পষ্টতা সম্বন্ধে এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, ইহার প্রাতঃকালীন কুয়াশার ন্যায় অস্পষ্টতা ভেদ করিয়া কবি তাঁহার ভাব-জগৎকে প্রথম দেখিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। কবির ধারণা, নাটকখানিতে সূত্রাকারে, বীজাকারে এবং বলা বাহুল্য, অস্পষ্টাকারে তাঁহার জীবনতত্ত্বই নিহিত। তাঁহার ধারণা, সেই জীবনতত্ত্বই পরবর্তীকালে লিখিত প্রবন্ধে-নিবন্ধে টীকা-ভাষ্যরূপে, পরিণত বয়সের কাব্য-নাটকে, পুষ্প-পল্লবে এবং কবির সাধনোজ্জ্বল দিব্যদৃষ্টির সম্মুখে অপরূপরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। এ বিষয়ে কবি নিঃসংশয় ছিলেন বলিয়াই প্রথম বয়সের এই অপারণত রচনাটির উপরে এতখানি আস্থা স্থাপন করিয়াছেন, এতবার টীকা-ভাষ্য করিয়া গিয়াছেন। আমাদিগকেও কবির ইঙ্গিত মনে রাখিতে হইবে—আরও মনে রাখিতে হইবে যে, তত্ত্ব-নাট্য পযায়ে প্রকৃতির প্রতিশোধ সর্ব-শ্রেষ্ঠ না হইলেও সর্বজ্যেষ্ঠ। নদীমূল নদী মোহানার তুলনায় যতই অকিঞ্চিৎকর হোক—তবু তাহার একটা মৌলিক আকর্ষণ আছে—এখানেই তাহার গুরুত্ব, এইখানেই তাহার অবিসম্বাদী প্রাধান্য।

প্রকৃতির প্রতিশোধ সম্বন্ধে কবি দাবী করিয়াছেন যে, ইহাতেই তাঁহার জীবনতত্ত্ব প্রথম আভাসে দেখা দিয়াছে এবং আরও দাবী করিয়াছেন যে, সেই জীবনতত্ত্ব তাঁহার সমগ্র রচনার মূল স্বর রূপে বাজিয়া উঠিয়াছে। কবির দাবীর সহিত আমরা নিজেদের একটি দাবী যোগ করিয়া দিতে চাই, এই নাটকখানিতেই কবির নিজস্ব নাটকীয় টেকনিক প্রথমে দেখা দিয়াছে—অবশ্য নিতান্ত অপরিণতভাবে এবং অস্পষ্টাকারে। অত্যাবশ্যক এই ভূমিকাটুকু করিয়া কবিকৃত আলোচনায় প্রবেশ করা যাইতে পারে। প্রকৃতির প্রতিশোধ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন—"পরবর্তী আমার সমস্ত কাব্যরচনার ইহাও একটা ভূমিকা। আমার তো মনে হয়, আমার কাব্য রচনার এই একটিমাত্র পালা। সে পালার নাম দেওয়া যাইতে পারে, সীমার মধ্যেই

অসীমের সহিত মিলন সাধনের পালা। এই ভাবটাকেই আমার শেষ বয়সের একটি কবিতার ছত্রে প্রকাশ করিয়াছিলাম—

বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়।

তত্ত্ব হিসাবে সে ব্যাখ্যার কোন মূল্য আছে কি না এবং কাব্য হিসাবে প্রকৃতির প্রতিশোধের স্থান কী তাহা জানি না, কিন্তু আজ স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, এই একটিমাত্র আইডিয়া অলক্ষ্যভাবে নানা বেশে আজ পর্যন্ত আমার সমস্ত রচনাকে অধিকার করিয়া বসিয়াছে।" (১)

কবির স্বীকারোক্তি হইতেই দেখা গেল যে, প্রকৃতির প্রতিশোধের তত্ত্বই একমাত্র তত্ত্ব যাহা নানাভাবে তাঁহার রচনায় লীলা করিয়া চলিয়াছে। এবারে সেই তত্ত্বটি কি সম্যকরূপে বুঝিবার চেষ্টা করা যাক। এখানেও কবির সাহায্য পাওয়া যাইবে।

"এই কারোয়ারে প্রকৃতির প্রতিশোধ নামক নাট্যকাব্যটি লিখিয়াছিলাম। কাব্যের নায়ক সন্ন্যাসী সমস্ত স্নেহবন্ধন, মায়াবন্ধন ছিন্ন করিয়া প্রকৃতির উপরে জয়ী হইয়া একান্ত বিশুদ্ধভাবে অনন্তকে উপলব্ধি করিতে চাহিয়াছিল। অনন্ত যেন সব কিছুর বাহিরে। অবশেষে একটি বালিকা তাহাকে স্নেহপাশে বদ্ধ করিয়া অন্তরের ধ্যান হইতে সংসারে ফিরাইয়া আনে। যখন ফিরিয়া আসিল, তখন সন্ন্যাসী ইহাই দেখিল, ক্ষুদ্রকে লইয়াই বৃহৎ, সীমাকে লইয়াই অসীম, প্রেমকে লইয়াই মুক্তি। প্রেমের আলো যখনি পাই, তখনি যেখানে চোখ মেলি, সেখানেই দেখি সীমার মধ্যেও সীমা নাই।

"প্রকৃতির সৌন্দর্য যে কেবলমাত্র আমারই মনের মরীচিকা নহে, তাহার মধ্যে যে অসীমের আনন্দই প্রকাশ পাইতেছে এবং সেই জন্যই যে এই সৌন্দর্যের কাছে আমরা আপনাকে ভুলিয়া যাই, এ কথাটা নিশ্চয় করিয়া বুঝাইবার জায়গা

১ জীবনস্মৃতি, প্রকৃতির প্রতিশোধ।

ছিল বটে, সেই কারোয়ারের সমুদ্রবেলা। বাহিরের প্রকৃতিতে যেখানে নিয়মের ইন্দ্রজালে অসীম আপনাকে প্রকাশ করিতেছেন, সেখানের সেই নিয়মের বাঁধাবাঁধির মধ্যে আমরা অসীমকে না দেখিতে পারি, কিন্তু যেখানে সৌন্দর্য ও প্রীতির সম্পর্কে হৃদয় একেবারে অব্যবহিতভাবে ক্ষুদ্রের মধ্যেও সেই ভূমার স্পর্শ লাভ করে, সেখানে সেই প্রত্যক্ষবোধের কাছে কোন তর্ক খাটিবে কি করিয়া? এই হৃদয়ের পথ দিয়াই প্রকৃত সন্ন্যাসীকে আপনার সীমা সিংহাসনের অধিরাজ অসীমের খাস দরবারে লইয়া গিয়াছিলেন। প্রকৃতির প্রতিশোধের মধ্যে একদিকে যত সব পথের লোক, যত সব গ্রামের নরনারী—তাহারা আপনাদের ঘর-গড়া প্রাত্যহিক তুচ্ছতার মধ্যে অচেতনভাবে দিন কাটাইয়া দিতেছে; আর একদিকে সন্ন্যাসী, সে আপনার ঘর-গড়া এক অসীমের মধ্যে কোনমতে আপনাকে ও সমস্ত কিছুকে বিলুপ্ত করিয়া দিবার চেষ্টা করিতেছে। প্রেমের সেতুতে যখন এই দুই পক্ষের ভেদ ঘুচিল, গৃহীর সঙ্গে সন্ন্যাসীর যখন মিলন ঘটিল, তখনি সীমায় অসীমে মিলিত হইয়া সীমার মধ্যে তুচ্ছতা ও অসীমের মধ্যে শূন্যতা দূর হইয়া গেল। আমার নিজের প্রথম জীবনে আমি যেমন একদিন আমার অন্তরের একটা অনির্দেশ্যতাময় অন্ধকার গুহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া বাহিরের সহজ অধিকারটি হারাইয়া বসিয়াছিলাম, অবশেষে সেই বাহির হইতেই একটি মনোহর আলোক হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করিয়া আমাকে প্রকৃতির সঙ্গে পরিপূর্ণ করিয়া মিলাইয়া দিল—এই প্রকৃতির প্রতিশোধেও সেই ইতিহাসটিই একটু অন্য রকম করিয়া লিখিতে হইয়াছে।" ১

জীবনস্মৃতি গ্রন্থেই আছে—"তখন 'আলোচনা' নাম দিয়া যে ছোট ছোট গদ্য-প্রবন্ধ বাহির করিয়াছিলাম, তাহার গোড়ার দিকেই প্রকৃতির প্রতিশোধের ভিতরকার ভাবটির একটি তত্ত্ব ব্যাখ্যা লিখিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম। সীমা

জীবনস্মৃতি, প্রকৃতির প্রতিশোধ।

যে সীমাবদ্ধ নহে, তাহা যে অতলস্পর্শ-গভীরতাকে এক কণার মধ্যে সংহত করিয়া দেখাইতেছে, ইহা লইয়া আলোচনা করা হইয়াছে।” ১

২

এবারে কবির পূর্ব্বোক্ত দাবী স্মরণ করা যাইতে পারে। তাঁহার মতে প্রকৃতির প্রতিশোধের তত্ত্বই তাঁহার সমস্ত কাব্য রচনার একটি মাত্র পালা। জীবন-পরিণতির সঙ্গে তাল রাখিয়া এই পালাটিই বিচিত্ররূপে, পরিণততর আকারে দেখা দিয়াছে—ইহা তাঁহার অপর দাবী। এই পালাটি তাঁহার তত্ত্ব-নাট্যকে কতখানি প্রভাবিত করিয়াছে বা করে নাই, সে বিষয়ে আমরা যথাস্থানে আলোচনা করিব—কিন্তু ইহা যে রবীন্দ্রকাব্যের মূল সুর, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। অপরিণত যৌবনে প্রথম আবির্ভূত জীবন সহচররূপ উক্ত তত্ত্বটির বিষয় স্মরণ রাখিলে, নাটিকার প্রধান পাত্র সন্ন্যাসীর সাধনার আপাতসিদ্ধি ও পরিণামগত নিদারুণ ব্যর্থতার কথা স্মরণ রাখিলে আর একখানি তত্ত্ব-নাট্যের সাদৃশ্য মনে উদিত না হইয়া পারে না। মহাকবি গ্যেটের 'ফাউস্ট্' সেই তত্ত্ব-নাট্য। বোধ করি, ইহাকে পৃথিবীর সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ তত্ত্ব-নাট্য বলা যাইতে পারে। কেহ যেন মনে না করেন যে, উক্ত মহাকাব্যখানির সহিত প্রকৃতির প্রতিশোধের মতো অকিঞ্চিৎকর ও অপরিণত কাব্যকে আমরা তুলনা করিতেছি। শিল্প সৃষ্টি হিসাবে এ দুয়ের মধ্যে তুলনার কথাই উঠিতে পারে না। শিল্প হিসাবে ওঠে না, কিন্তু তাই বলিয়া তত্ত্ব হিসাবে উঠিতে বাধা নাই। এ দুয়ের মধ্যে প্রধান সাদৃশ্য তত্ত্বগত অর্থাৎ মিলটা ভিতরের দিকে, কিন্তু কিছু বাহিরের বা অবস্থাগত মিলও আছে। আগে সেইটাই দেখা যাক।

---

১ জীবনস্মৃতি, প্রকৃতির প্রতিশোধ।

রবীন্দ্র রচনাবলীর অচলিত সংগ্রহের ২য় খণ্ডের 'আলোচনা' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত ডুব দেওয়া, ডুবিবার ক্ষমতা, জগৎ সত্য, প্রেমের শিক্ষা, জগতের বন্ধন, একটি রূপক নামে ছয়টি প্রবন্ধে প্রকৃতির প্রতিশোধের অংশ বিশেষের কবিকৃত ব্যাখ্যা আছে।

শৈশবকাল হইতেই গ্যেটে ফাউস্ট-কাহিনীর সহিত পরিচিত ছিলেন। একুশ-বাইশ বৎসর বয়সে উক্ত কাহিনীকে অবলম্বন করিয়া কাব্য লিখিবার সঙ্কল্প তিনি করেন। আরও কয়েক বৎসর পরে অর্থাৎ পঁচিশ বৎসর বয়সে ফাউস্ট কাব্যের একটা খসড়া লিপিবদ্ধ হয়। তারপরে অনেকদিন আবার কাজ বন্ধ থাকে। কখনো কখনো বাহিরের তাগিদে, যেমন শিলারের সহিত মিত্রতা জন্মিলে তাঁহার তাগিদে, কোন কোন দৃশ্য লিখিত হয়—কিন্তু ফাউস্ট-কাব্যের প্রথম খণ্ড বর্ত্তমান আকারে ১৮০৬ খৃষ্টাব্দের আগে প্রকাশ সম্ভব হইয়া ওঠে নাই। ইহার দ্বিতীয় খণ্ডের রচনার ও প্রকাশের ইতিহাস আরও বিচিত্র। বৃদ্ধ বয়সে দ্বিতীয় খণ্ডের সূচনা, মাঝে মাঝে কতক অংশ লিখিত হইয়া মৃত্যুর কয়েক মাস আগে ইহা সমাপ্ত হয় এবং কবির মৃত্যুর পরে প্রকাশিত হইয়া লোকসমাজে আত্মপ্রকাশ করে। দুই খণ্ডকে একত্র লইয়া বিচার করিলে বলা অসঙ্গত হইবে না যে, কাব্যখানি কবির প্রথম যৌবন হইতে অন্তিম মুহূর্ত্ত পর্যন্ত তাঁহার জীবন সহচর ছিল। বস্তুত ফাউস্ট-কাব্য গ্যেটের মানস-জীবনের মেরুদণ্ড। গ্যেটে বলিয়াছেন যে, তাঁহার সমস্ত রচনাই তাঁহার আত্মজীবনীর অন্তর্গত। ফাউস্ট তাঁহার আত্মজীবনীর পরিপূর্ণতম প্রকাশ—'সত্য ও কল্পনা' নামে পরিজ্ঞাত তাঁহার আত্মজীবনীর চেয়েও ফাউস্ট পরিপূর্ণতর।

প্রকৃতির প্রতিশোধ রবীন্দ্রনাথের প্রথম যৌবনে (ফাউস্ট রচনার প্রথম সঙ্কল্পের বয়সে) রচিত। ফাউস্টের মতো রহিয়া-বসিয়া ইহা সুদীর্ঘ জীবন ধরিয়া লিখিত হয় নাই সত্য, কিন্তু যখন মনে করি যে, প্রকৃতির প্রতিশোধের মূল তত্ত্বই কবির জীবন সহচর, তাঁহার পরবর্তী সমস্ত কাব্য বচনার একটিমাত্র পালা, আর এই পালাটিকেই কবি আমরণ অনুসরণ করিয়াছেন—তখন ফাউস্টের সঙ্গে ইহার সাদৃশ্য উদ্ঘাটিত হইয়া যায়। প্রভেদের মধ্যে এই যে—গ্যেটে একটিমাত্র কাহিনীর সূত্রে যাহাকে অনুসরণ করিয়াছেন, রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন কাহিনীর এবং বিভিন্ন শ্রেণীর রচনায় তাহাকেই অনুসরণ করিয়া চলিয়াছেন।

কিন্তু এ সব তো বাহিরের মিল, আসল মিল ভিতরে এবং সেইটাই প্রধান বিষয়। ফাউস্ট জ্ঞানমার্গের সহায়ে জীবন রহস্যভেদ করিতে অসমর্থ হইয়া শয়তানের শরণাপন্ন হইল। শয়তান বলিল যে, তাহার সঙ্গে চুক্তি-বদ্ধ হইলে জীবনপাত্রের শেষবিন্দুটি পর্যন্ত উপভোগ করিবার ক্ষমতা তাহার হইবে। ফাউস্ট তাহাতেই সম্মত হইল। আগে যেমন সে জ্ঞানমার্গে জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চ্চায় নিযুক্ত ছিল, এখন তেমনি কামমার্গের পথিক হইল—কিন্তু না পাইল আনন্দ, না পাইল শান্তি, এমন কি শিশির বিন্দুর মতো পবিত্র-মনোরম 'গ্রেশেন'-এর প্রেমও নিদারুণ ট্রাজেডিতে পরিণত হইল। ফাউস্ট দেখিতে পাইল, উপভোগের কবলে সে যাহা ধরিতেছে তাহাই ভস্মে পর্যবসিত হইতেছে, যাহা রসনায় নিতেছে তাহাতেই ক্ষারস্বাদ ক্ষরিতেছে। অনেক ঠকিয়া সে বুঝিল আনন্দময় মুহূর্তকে চিরন্তন করিবার ক্ষমতা তাহার নাই। অনেক দুঃখ পাইয়া, অনেক দুঃখ দিয়া ফাউস্ট মানব প্রকৃতির স্বরূপ বুঝিতে পারিল, সে বুঝিতে পারিল যে, সে অন্বেষক, 'পতনঅভ্যুদয় বন্ধুরপন্থা' বহিয়া সে সারা জীবন অন্বেষণ করিয়া মরিতেছে—অনন্তের, ফাউস্ট অনন্তের সন্ন্যাসী। অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত আনন্দ, দুইই মানুষের আয়ত্তাতীত, এই নিদারুণ সত্য মানুষকে বুঝিতে হইবে, তাহাকে আরও বুঝিতে হইবে যে, অনন্ত আয়ত্তাতীত বলিয়া হাল ছাড়িয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না, নিজ নিজ সাধ্য অনুসারে 'আদর্শকে' উপলব্ধির উদ্দেশ্যে কর্মসাধনা করিতে হইবে, তাহাতে অনন্ত আয়ত্তে আসিয়া পড়িবে কবি এমন আশ্বাস দেন না, তিনি বলেন যে, অনন্তের সাধনার ফল এই যে, মানুষ ভিতরে ভিতরে পূর্ণতর হইয়া উঠিতে থাকিবে। অনন্তের সাক্ষাৎ কোনকালেই মিলিবে না ইহা যেমন সত্য, অনন্তের সাধনায় মানুষ পূর্ণতর হইয়া উঠিবে—ইহাও তেমনি সত্য। এইখানেই মানবজীবনের সার্থকতা। এবারে বুঝিতে পারিব মানুষের ভাগ্য ও ফাউস্টের ভাগ্য অভিন্ন; কবির ভাগ্য ও ফাউস্টের ভাগ্য তো বটেই। ফাউস্ট প্রসঙ্গে গ্যেটে বলিতেছেন—

"জ্ঞানের প্রত্যেক শাখা প্রশাখা আমি নাড়িয়া দেখিয়াছি যে, জ্ঞান মার্গ কত অসহায়। আবার জীবনের বিচিত্র মহঁলেও ঘুরিয়া বেড়াইয়াছি—কিন্তু সেখান হইতেও ভগ্নহৃদয়ে আমাকে ফিরিয়া আসিতে হইয়াছে।"

ইহাই গ্যেটে-জীবনের, ফাউস্ট জীবনের, মানবজীবনের মূলতত্ত্ব। মানুষের মনে অনন্ত আকাঙ্ক্ষা আছে, আকাঙ্ক্ষার বস্তু নাই, তাহার মনে অগস্ত্য-তৃষ্ণা আছে, তৃষ্ণাহর সমুদ্র নাই, তাহার মনে সুধার আকিঞ্চন আছে, তাহার আকাশ সুধাকরহীন। তবু তাহাকে অন্বেষণ করিয়া ফিরিতে হইবে—কারণ অন্বেষণই তাহার স্বধর্ম। মানুষ অনন্তের সন্ন্যাসী—যে অনন্ত স্বভাবতঃ আয়ত্তাতীত। তবে মানুষের সান্ত্বনা কোথায়? যথাসাধ্য কর্ম সাধনায়, যথাশক্তি জ্ঞানচর্চায়, যথাসম্ভব অন্বেষণে, এই সবেই তাহার সার্থকতা। জ্ঞান, বিজ্ঞান, সাহিত্য, শিল্প—সমস্তই অন্বেষণের সহায় বলিয়া মানুষের কাছে মূল্যবান—তাহারা লক্ষ্য নহে, লক্ষ্যে চালিত করিবার উপায়মাত্র। ফাউস্টরূপী গ্যেটে এ সমস্তর চরম পরখ করিয়া দেখিয়াছেন—কেবল অতৃপ্তি, কেবল ব্যর্থতা! এত অতৃপ্তি, এত ব্যর্থতার পরে কবি যে-সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছেন, হতভাগ্য ফাউস্ট সে সিদ্ধান্তের সাক্ষাৎ পায় নাই। মোটের উপরে ইহাই হইল ফাউস্টরূপী গ্যেটের জীবন-তত্ত্ব।

প্রকৃতির প্রতিশোধের 'সন্ন্যাসী' জ্ঞানমার্গের সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া সংসারক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছে। সাধারণের ছোটখাটো সুখদুঃখ আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি তাহার এক প্রকার অনুকম্পার ভাব। সংসার-জ্বর তাহাকে আক্রমণ করিতে পারিবে না। তারপরে কি অবস্থায় পড়িয়া সে একটি অন্ত্যজ বালিকাকে আশ্রয় দিল এবং সেই সূত্রে তাহার মোহভঙ্গ করিয়া প্রকৃতি কিরূপে তাহার উপরে প্রতিশোধ গ্রহণ করিল—পাঠকমাত্রেই অবগত আছেন।

ফাউস্ট ও 'সন্ন্যাসী' দু'জনেই অনন্তের সাধক, একজন সিদ্ধকাম,

অপরজন সিদ্ধিলাভেচ্ছু। দু'জনেরই সাধনার মূলে একটা সুবৃহৎ ফাঁকি ছিল। কিন্তু দু'জনের ফাঁকি' দুই দিক হইতে আসিয়াছে। অনন্তের সাধক ফাউস্ট জ্ঞানমার্গের দ্বারা অনন্তের রহস্যভেদ করিতে অসমর্থ হইলে শয়তানের মন্ত্রণায় পড়িয়া 'সান্তের' চর্চ্চায় মনোনিবেশ করিল। শয়তান তাহাকে বলিল—অনন্তের সাধনা রাখো, তার বদলে হাতের কাছে কামিনী, কাঞ্চন, সুরা যাহা পাও তাহাই উপভোগ করো,—তাহাতেই জীবনের সার্থকতা। ফাউস্ট শয়তানের উপদেশ গ্রহণ করিল। সান্তকে অর্থাৎ সংসারকে ফাউস্ট অনন্তের অংশরূপে দেখিতে পারে নাই, 'তাহাতেই তাহার শেষ' বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিল, ফলে বারংবার আনন্দ লাভে ব্যর্থ হইল, কিন্তু তাহার চেয়েও মহত্তর দুঃখ সে সর্ব্বদা অনুভব করিত। শয়তানের উপদেশে যে পথ অবলম্বন করিয়াছিল তাহার সার্থকতা বা গন্তব্যতা সম্বন্ধেও তাহার মনে সংশয় ছিল, এই সংশয়েরই বাহ্যরূপ তাহার সহচর 'মেফিস্টোফিলিস'। ফাউস্ট জানিত সে অনন্তের সাধক, সে আরও জানিত শয়তানের পরামর্শে যে পথ সে ধরিয়াছে খুব সম্ভব তাহাতে সে সিদ্ধিতে পৌছিবে না, আবার আনন্দ হইতেও বঞ্চিত হইবে। সান্তকে অর্থাৎ সংসারকে অবলম্বন করিয়াও অনন্তের সাধনায় সিদ্ধিলাভ সম্ভব—এ কথা ফাউস্টকে কেহ বলিয়া দেয় নাই। তাই দেখিতে পাই অনন্তের সাধক সান্তকে স্বয়ম্পূর্ণরূপে, গ্রহণ করিয়া জীবনটা নিষ্ফল করিয়া দিল। প্রকৃতির প্রতিশোধের সন্ন্যাসীর মনে গোড়াতে কোথাও সংশয় নাই, তাহার ধারণা অনন্তের সাধনায় সে সিদ্ধিলাভ করিয়াছে। তাহার ফাঁকি ধরা পড়িয়া গেল—ইহাই 'সন্ন্যাসীর' জীবনের ট্রাজেডি। তবেই দেখা গেল ফাউস্ট ও 'সন্ন্যাসী' দু'জনেই অনন্তের সাধক। ফাউস্ট শয়তানের পরামর্শে পড়িয়া অনন্তের আশা ছাড়িয়া সান্তকে চরমরূপে স্বীকার করিয়াছিল। আবার 'সন্ন্যাসী' সান্তকে বাদ দিয়া অনন্তকেই সত্যের একমাত্র রূপ বলিয়া স্বীকার করিয়াছিল—পরিণামে দু'জনেই অন্ধকারে ডুবিয়াছে। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ অন্যত্র স্পষ্টরূপে আলোচনা করিয়াছেন—

"আমার উত্তর এই যে, এ আলোচনা নতুন নয়। পুরাতন ঋষি বলেছেন

অন্ধং তমঃপ্রবিশন্তি যেঽবিদ্যামুপাসতে।
ততো ভূয় ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং রতাঃ॥

যে লোক অনন্তকে বাদ দিয়ে অন্তের উপাসনা করে সে অন্ধকারে ডোবে। আর যে অন্তকে বাদ দিয়ে অনন্তের উপাসনা করে সে আরও বেশি অন্ধকারে ডোবে।

বিদ্যাঞ্চাবিদ্যাঞ্চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ।
অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে॥

অন্তকে অনন্তকে যে একত্র ক'রে জানে সেই অন্তের মধ্য দিয়ে মৃত্যুকে উত্তীর্ণ হয় আর অনন্তর মধ্যে পায় অমৃতকে।" ১

কবি বলিতে চান যে, অনন্তকে বাদ দিয়া অন্তের উপাসনা করিয়া ফাউস্ট অন্ধকারে ডুবিয়াছিল আর অন্তকে বাদ দিয়া 'সন্ন্যাসী' অনন্তের উপাসনা করিয়া আরও বেশী অন্ধকারে ডুবিয়াছিল।

এতক্ষণ যে আলোচনা করিলাম তাহাতে ফাউস্ট ও প্রকৃতির প্রতিশোধের অন্তর্নিহিত ঐক্য কোথায় স্পষ্ট করিয়া বুঝাইতে পারিয়াছি কি না জানি না। আমার বিশ্বাস যে, উভয় কাব্যের মূলতত্ত্ব এক, তবে উভয় কবির শক্তি, বিশ্বাস ও পরিবেশ অনুযায়ী কাব্য দুইখানির বাহ্যরূপ ভিন্ন হইয়াছে।

এখানে মনে একটা প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক। প্রকৃতির প্রতিশোধ লিখিবার আগে রবীন্দ্রনাথ কি ফাউস্ট পড়িয়াছিলেন। আমার বিশ্বাস, নাটকখানি লিখিবার আগে ফাউস্ট পড়িবার সুযোগ তাঁহার ঘটিয়াছিল—এ বিষয়ে কিছু প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু সে-সব উপস্থিত করিবার আগে একটা কথা স্পষ্ট করিয়া বলিয়া রাখিতে চাই। প্রকৃতির প্রতিশোধ রচনার পূর্বে ফাউস্ট না পড়িলেও রবীন্দ্রনাথ নাটকখানিকে প্রায় এইভাবেই লিখিতেন, কারণ,

১ সঞ্চয়, পৃষ্ঠা ৪১৭, র—র, ১৮শ খণ্ড।

ইহাতে প্রকাশিত জীবন-তত্ত্ব—ইহার পূর্বে রচিত কাব্যে ও নাটকে ক্ষীণভাবে দেখা দিতে আরম্ভ করিয়াছিল, প্রকৃতির প্রতিশোধে তাহা স্পষ্টতর, পরবর্তী রচনাসমূহে আরও ঘনপিনদ্ধ, আরও রূপধন্য। তাহা ছাড়া, কোন মহাকবি মূল জীবনতত্ত্ব অপর কাহারো নিকট হইতে অধমর্ণের মত গ্রহণ করে না—যেমন-ভাবেই হোক তাহা তাহার জীবন হইতেই উদ্ভূত হইয়া থাকে। তবে নিজের জীবনতত্ত্বের সমর্থন সে অন্যত্র হইতে পাইতে পারে, এক্ষেত্রে তাহাই ঘটিয়াছে। ফাউস্ট নাটক পড়িয়া রবীন্দ্রনাথ তাঁহার পূর্বোদ্ভূত জীবন-তত্ত্বের সমর্থন পাইযাছেন—গ্যেটের চিন্তার আলোকে তাহাকে স্পষ্টতর আকারে দেখিতে পাইয়াছেন—এই সময় ফাউস্ট নাটক হইতে প্রতিফলিত গ্যেটের চিন্তার আলোক তাঁহার মনে না পড়িলে খুব সম্ভব—আরও অনেকদিন নিজের জীবনতত্ত্বটা তাঁহার কাছে অস্পষ্ট থাকিয়াই যাইত।

রবীন্দ্র-সাহিত্যের পাঠকগণ জানেন যে চিরদিন গ্যেটের কাব্য ও জীবনের প্রতি কবি একটা আকর্ষণ অনুভব করিয়াছেন, গ্যেটের উল্লেখ তাঁহার রচনায় বিরল নয়। গ্যেটের কিছু কিছু উক্তি সংগ্রহ করিয়া বাংলা ভাষায় তিনি সঙ্কলন করিয়াছেন। তাঁহার একাধিক চিঠিপত্রে গ্যেটের ও মূল ফাউস্ট পাঠ-চেষ্টার উল্লেখ পাওয়া যায়।১ কিন্তু এ সমস্তই প্রকৃতির প্রতিশোধ লিখিবার অনেক পরবর্তী সময়ের কথা। গ্যেটে সম্বন্ধে তাঁহার ঔৎসুক্যের একটি প্রমাণ প্রকৃতির প্রতিশোধ রচনার পূর্ববর্তী।২ এ-প্রমাণগুলি সবই পরোক্ষ। ইহাতে অবশ্য

১ (ক) ২২শে সেপ্টেম্বর, ১৮৯৪, ছিন্নপত্র।

(খ) প্রমথ চৌধুরীকে লিখিত ১৮৯০ সালের একখানি চিঠিতে আছে—'জর্মান Faust অল্প অল্প পড়তে চেষ্টা করছি। তুমি থাকলে তোমাকে আমার সহপাঠী করা যেতো।'—চিঠিপত্র, ৫ম খণ্ড।

(গ) বর্তমান লেখককে কবি একদা কথাপ্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন যে, মূল ফাউস্ট পড়িবার উদ্দেশ্যেই তিনি জার্মান শিখিয়াছিলেন।

২ ভারতীতে প্রকাশিত প্রবন্ধ—গ্যেটে ও তাঁহার প্রণয়িনীগণ—কার্তিক, ১২৮৫।

গ্রন্থ পরিচয়, পৃঃ ৪৭৭, র—র, ১৭শ খণ্ড।

প্রমাণ হয় না যে, নাটকখানি লিখিবার আগে জার্মান নাটকটি তিনি পড়িয়াছেন। কিন্তু এই সব প্রমাণকে পটভূমিরূপে ব্যবহার করিয়া প্রকৃতির প্রতিশোধ পড়িয়া আমার প্রতীতি জন্মিয়াছে যে, ফাউস্ট কাব্য মূলে হোক, অনুবাদে হোক, তিনি আগেই পড়িয়াছিলেন, কারণ উভয় গ্রন্থের মিলকে আকস্মিক মনে করিতে পারি না।৩

৩

এবারে দেখা যাক, পূর্বোক্ত তত্ত্বটি নাটকীয় চরিত্র ও ঘটনার মাধ্যমে কিভাবে রসমূর্তি লাভ করিয়াছে।

প্রথমেই দেখিতে পাই, জগৎ-বিলয় সাধনা-সিদ্ধ সন্ন্যাসীর প্রলয়ানন্দের উচ্ছ্বাস। নিজের সত্তা হইতে প্রকৃতির প্রেমময়, সৌন্দর্যময়, আনন্দময় অস্তিত্বকে সমূলে বিলুপ্ত করিয়া দিবার সাধনায় এতদিন সে নিরত ছিল; তাহার বিশ্বাস, এতদিনে সে সিদ্ধিলাভ করিয়াছে।

বসে বসে চন্দ্রসূর্য দিয়েছি নিভায়ে,
একে একে ভাঙিয়াছি বিশ্বের সীমানা,
দৃশ্য শব্দ স্বাদ গন্ধ গিয়েছে ছুটিয়া,
গেছে ভেঙ্গে আশা ভয় মায়ার কুহক।

৩ প্রকৃতির প্রতিশোধ রচনার পূর্বে রবীন্দ্রনাথ যে গোটের কাব্য ও সাহিত্যের সহিত বিশেষ পরিচিত ছিলেন এই প্রবন্ধ রচনার পরবর্তী কালে প্রকাশিত দুইটি নিবন্ধে সে বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ ও তথ্য প্রদত্ত হইয়াছে। নিবন্ধ দুটির পরিচয় এইরূপ—

ক। রবীন্দ্রনাথ ও গ্যেটে—শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন, দেশ, ৪ঠা ফেব্রুয়ারি ১৯৫০।

খ। গ্যেটেও রবীন্দ্রনাথ—শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বিশ্বভারতী পত্রিকা, বৈশাখ—আষাঢ় ১৩৫৭।

জগতের মহাশিলা বক্ষে চাপাইয়া
কে আমারে কারাগারে করেছিল রোধ ;
পলে পলে যুঝি যুঝি তিল তিল করি
জগদ্দল সে পাষাণ ফেলেছি সরায়ে।
হৃদয় হ'য়েছে লঘু স্বাধীন স্ববশ।

সন্ন্যাসীর বিশ্বাস, পরম জ্ঞানের চিতায় দয়া, প্রেম, আনন্দ, সৌন্দর্যবোধ প্রভৃতি প্রকৃতির স্নেহের ধনগুলিকে সে ভস্ম করিয়া ফেলিয়াছে—

বধ করিয়াছি তোর স্নেহের সন্তানে,
বিশ্ব ভস্ম হ'য়ে গেছে জ্ঞান চিতানলে।
সেই ভস্মমুষ্টি আজ মাখিয়া শরীরে
গুহার আঁধার হ'তে হইব বাহির।

প্রকৃতির লীলাভূমি মানব-সংসারে সন্ন্যাসী কেন বাহির হইল তাহা সে নিজেই বিশদরূপে বলিয়াছে—

তোরি রঙ্গভূমি মাঝে বেড়াব গাহিয়া
অপার আনন্দময় প্রতিশোধ গান।
দেখাব হৃদয় খুলে, কহিব তোমারে,
এই দেখ্ তোর রাজ্য মরুভূমি আজি,
তোর যারা দাস ছিল স্নেহ প্রেম দয়া
শ্মশানে পড়িয়া আছে তাদের কঙ্কাল,
প্রলয়ের রাজধানী বসেছে হেথায়।

এই মহদুদ্দেশ্য লইয়া সন্ন্যাসী নির্ভয়ে বাহির হইয়া পড়িল ; সে স্বপ্নেও ভাবিতে পারে নাই—অকল্পিত-পূর্ব্ব প্রতিশোধ লইবার উদ্দেশ্যে ওই সংসারের প্রান্তেই প্রকৃতি একটি স্নেহের অঙ্কুর বপন করিয়া রাখিয়াছে।

সংসারের পথে সর্বজন তাড়িত, নিরাশ্রয়, অস্পৃশ্য রঘু নামধেয় কোন ব্যক্তির দুহিতার সঙ্গে সন্ন্যাসীর দেখা হইল। সন্ন্যাসী তাহাকে আশ্রয় দিতে স্বীকার করিল। বলাবাহুল্য এই আশ্রয়দানের মূলে সন্ন্যাসীর মনে স্নেহ ছিল না; ছিল সিদ্ধির অহঙ্কার। আর দশজন সংসারী লোক আচার বিচার, জাতি বর্ণের যে-সব সংস্কারে বদ্ধ, সন্ন্যাসী তো তাহা হইতে মুক্ত; সে-যে আর দশ জনের মত সংসারী জীব নয়, প্রকৃতির অধীন নয়, এই অহঙ্কারের বশেই সে অস্পৃশ্যাকে আশ্রয় দিল। বিশেষ সন্ন্যাসী নিজের ও রঘু-দুহিতার মধ্যে এক প্রকার ঐক্যও দেখিতে যেন পাইল।

বালিকা যখন শুধাইল, একবার যখন আমাকে আশ্রয় দিয়াছ, আর যেন আমাকে তাড়াইয়া দিও না, তখন সন্ন্যাসী তূরীয় অহঙ্কারে বলিতেছে—

মুছ অশ্রুজল বৎসে, আমি যে সন্ন্যাসী।
নাইকো কাহারো পরে ঘৃণা অনুরাগ।
যে-আসে আসুক কাছে, যায় যাক্ দূরে
জেনো বৎসে মোর কাছে সকলি সমান।

. . .

বালিকা—আমি প্রভু দেব নর সবারি তাড়িত,
মোর কেহ নাই—

সন্ন্যাসী—আমারো তো কেহ নাই
দেব নর সকলেরে দিয়েছি তাড়ায়ে।

বালিকা—তোমার কি মাতা নাই?

সন্ন্যাসী—নাই।

বালিকা—পিতা নাই?

সন্ন্যাসী—নাই বৎসে।

বালিকা—সখা কেহ নাই?

সন্ন্যাসী—কেহ নাই।

বালিকা—আমি তবে কাছে রব, ত্যেজিবে না মোরে ?
সন্ন্যাসী—তুমি না ত্যজিলে মোরে আমি ত্যজিব না।

বালিকা সকলের তাড়িত, সন্ন্যাসী সকলকে তাড়াইয়া দিয়াছে; বালিকা স্নেহ প্রেম পায় নাই, সন্ন্যাসী স্নেহ প্রেমের মূলোচ্ছেদ করিয়াছে। বালিকার আত্মীয় স্বজন কেহ নাই—সন্ন্যাসীরও তাই; সব শেষে সন্ন্যাসী ছিন্নমোহ নৈর্ব্যক্তিকতার সঙ্গে বলিয়াছে—

তুমি না ত্যজিলে মোরে আমি ত্যজিব না।

বাল্মীকিপ্রতিভায় বাল্মীকিকে ছলনা করিবার জন্য সরস্বতী বালিকা বেশে আসিয়াছিল, এখানে তেমনি প্রকৃতি স্বয়ং এই বালিকার ছদ্মবেশে আসিয়াছে কি ?

এইরূপে নিজের অজ্ঞাতসারে স্নেহ প্রেমের দ্বারা পিচ্ছিল অবরোহমুখী প্রকৃতির পথে সন্ন্যাসী প্রথম ধাপ ফেলিল; তারপর হইতে অনিবার্য গতিতে সে নিদারুণ মোহভঙ্গের পরিণামের মুখে গড়াইয়া চলিয়াছে। মাঝে মাঝে উদ্ধার পাইবার আশায় সে প্রাণপণ করিয়াছে বটে, কিন্তু সবই বৃথা। মুহুর্মুহু ধাপে ধাপে সে সংসারের মাধ্যাকর্ষণের টানে নামিয়া চলিয়াছে আর প্রতিশোধ-পিপাসী প্রকৃতি নীরবে মৃদুমন্দ হাসিয়াছে।

এই প্রথম ধাপ ও চূড়ান্ত ট্রাজেডির কালের মধ্যে সংসার ও প্রকৃতি সম্বন্ধে সন্ন্যাসীর মনে ধীরে ধীরে ভাব-বিবর্তন ঘটিয়াছে। প্রথমে আমরা দেখিয়াছি, সংসারে বাহির হইয়া পড়িবার পূর্বে সংসারকে কেমন সে তুড়ি মারিয়া উড়াইয়া দিয়াছিল—'বিশ্ব ভস্ম হ'য়ে গেছে জ্ঞান চিতানলে।'

বালিকার স্নেহে সাগোচরে জড়িত হইবার সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতির লুপ্ত-প্রায় সত্তার নূতন নূতন রূপ সন্ন্যাসীর চোখে দেখা দিতে আরম্ভ করিয়াছে।

দ্বিতীয় ধাপটিতে দেখি, সন্ন্যাসী মোহের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছে, কিন্তু তখনো তাহার বিশ্বাস নিজে সে এই মোহের অতীত। সন্ন্যাসী বলিতেছে—

বালিকা কি মনে করে স্নেহ করি ওরে ?
হায় হায় একি ভ্রম ! জানেনা সরলা
নিষ্কলঙ্ক এ হৃদয় স্নেহ-রেখাহীন।
তাই মনে ক'রে যদি সুখে থাকে, থাক্।
মোহ নিয়ে ভ্রম নিয়ে বেঁচে থাকে এরা।

কিন্তু এত নির্বিকার আত্মজ্ঞান সত্ত্বেও সন্ন্যাসীর এক একবার সন্দেহ জন্মিতে আরম্ভ করিয়াছে—তবে কি সত্যই সে স্নেহপ্রেমের বশীভূত হইতে চলিয়াছে ? প্রকৃতির জগদ্ব্যাপী পাশে ধরা পড়িবার মুখে আসিয়া সে দণ্ডায়মান :

একি রে মদিরা আমি করিতেছি পান।
একি মধু অচেতনা পশিছে হৃদয়ে !

. . .

পড়িছে জ্ঞানের চোখে মোহ আবরণ।
ধীরে ধীরে মোহময় মরণের ছায়া
কেনরে আমারে যেন আচ্ছন্ন করিছে।

তৃতীয় ধাপে দেখি সন্ন্যাসী প্রকৃতিকে সুন্দরী বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছে। কিন্তু তখনো তাহার বিশ্বাস, নিজে সে এই সৌন্দর্যের উর্দ্ধে। নিজে সে রাজাধিরাজের বিবিক্ত-গৌরবে আত্মকর্তৃত্বের সিংহাসনে সমাসীন আর প্রকৃতি দাসীর মতো সৌন্দর্যের মায়াভিনয় করিয়া চলিয়াছে।

সহসা পড়িল চোখে একি মায়াঘোর,
জগতেরে কেন আজি মনোহর হেরি।

প্রকৃতি এমন তোরে দেখিনি কখনো ;
এমন মধুর যদি মায়ামূর্তি তোর
দূর হ'তে ব'সে ব'সে দেখি না চাহিয়া !
হেথায় বসি না কেন রাজার মতন,
জগতের রঙ্গভূমি সম্মুখে আমার !
আমি আজি প্রভু তোর, তুই দাসী মোর,
মায়াবিনী দেখা তোর মায়া-অভিনয়,
দেখা তোর জগতের মহা ইন্দ্রজাল।
খেলা কর সমুখেতে চন্দ্রসূর্য নিয়ে,
নীলাকাশ রাজছত্র ধর মোর শিরে,
সমস্ত জগৎ দিয়ে কর মোর পূজা।

. . .

আমি তো ওদের মাঝে কেহ নই আর
তবে কেন এই নৃত্য দেখি না বসিয়া !

চতুর্থ ধাপে দেখি সন্ন্যাসীর সন্ন্যাসমোহ ভাঙিয়া পড়িয়াছে ; সে নিঃসংশয়ে প্রকৃতির কাছে আত্মসমর্পণ করিয়া বসিয়াছে। তখন জগৎ যে কেবল সৌন্দর্যময়, আনন্দময়, প্রেমময়, তাহা নয়—প্রেম, আনন্দ, সৌন্দর্যেব সাতনবী হার দিয়া প্রকৃতিকে সে বরণ করিয়া লইয়াছে।

সন্ন্যাসী জগৎকে সত্য বলিয়া বুঝিতে পারিয়া যে বালিকাকে পিতৃস্নেহে গ্রহণ করিয়াছে এমন বলা চলে না, বরঞ্চ বালিকার স্নেহের সেতুপথেই সে জগৎ-সত্যে আসিয়া পৌছিয়াছে। সন্ন্যাসী বালিকাকে উদ্দেশ করিয়া বলিতেছে—

আমি তো ডাকিনি তোরে নিজে এসেছিস্
একটুকু দাঁড়া, তোরে দেখি ভাল ক'রে।
সংসারের পরপারে ছিলেম যে আমি,

সহসা জগৎ হ'তে কে তোরে পাঠালে ?
সেথা হতে সাথে ক'রে কেন নিয়ে এলি
দিবালোক, পুষ্পগন্ধ, স্নিগ্ধ সমীরণ ?
কিবা তোর সুধাকণ্ঠ, স্নেহমাখা স্বর।
মরি কি অমিয়াময়ী লাবণ্য প্রতিমা।
সরলতাময় তোর মুখখানি দেখে
জগতের পরে মোর হ'তেছে বিশ্বাস।

.　　　.　　　.

জগৎ কি তোরি মত এত সত্য হবে !
চল্‌ বাছা গুহা হ'তে বাহিরেতে যাই।
সমুদ্রের একপারে রয়েছে জগৎ,
সমুদ্রের পরপারে আমি ব'সে আছি,
মাঝেতে রহিলি তুই সোনার তরণী—
জগৎ অতীত এই পারাবার হ'তে
মাঝে মাঝে নিয়ে যাবি জগতের কূলে।

বালিকা উপলক্ষ্য মাত্র ; সংসারের কূলে পৌঁছাইয়া দিবার সে 'সোনার তরণী', সন্ন্যাসী এখনো তরণীটাকেই লক্ষ্য ভাবিতেছে, কিন্তু কবি কৌশলে তরণীখানাকে সরাইয়া ফেলিয়া সন্ন্যাসীকে বুঝাইয়া দিয়াছেন আসল লক্ষ্য কোথায়।

সন্ন্যাসী বালিকার স্নেহের সূত্র ধরিয়া ধীরে ধীরে জগতের স্বরূপ বুঝিতে পারিতেছে।

আহা একি চারিদিকে প্রভাত বিকাশ।

জগৎ-রহস্যে প্রবেশের স্বর্ণময় দ্বারটি এতদিনে সে দেখিতে পাইয়াছে—

ভালবেসে চাহিব এ জগতের পানে
তবে তো দেখিতে পাবো স্বরূপ ইহার।

ভালবাসার দৃষ্টিতে জগতের দিকে চাহিতেই জগতের চিরন্তন কিন্তু সন্ন্যাসীর কাছে অভাবিতপূর্ব স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হইয়া গেল—

জগতের মুখে আজি একি হাস্য হেরি।
আনন্দ-তরঙ্গ নাচে চন্দ্রসূর্য ঘেরি।
আনন্দ হিল্লোল কাঁপে লতায় পাতায়,
আনন্দ উচ্ছ্বসি উঠে পাখীর গলায়,
আনন্দ ফুটিয়া পড়ে কুসুমে কুসুমে।

এখন এই আনন্দময় জগতে প্রেমসেতুমাত্র পথে উপস্থিত হইয়া সন্ন্যাসী বুঝিতে পারিল তাহার অনন্তের সাধনা ব্যর্থ হয় নাই। দিগম্বর অনন্ত জগতের কোণে সংসার পাতিয়া বসিয়া আছেন; একা অনন্ত নহে, অনন্ত ও অনন্তময়ী মিলিত হইয়াই 'জগতঃ পিতরৌ', এ জগৎ তাঁহাদেরই সৃষ্টি।

অসীম হ'তেছে ব্যক্ত সীমারূপ ধার।
যাহা কিছু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনন্ত সকলি,
বালুকার কণা, সেও অসীম অপার।
তারি মধ্যে বাঁধা আছে অনন্ত আকাশ—
কে আছে, কে পারে তার আয়ত্ত করিতে।
বড় ছোট কিছু নাই সকলি মহৎ।
আঁখি মুদে জগতেরে বাহিরে ফেলিয়া
অসীমের অন্বেষণে কোথা গিয়েছিনু!
সীমা তো কোথাও নাই—সীমা সে তো ভ্রম।
ভাল ক'রে পড়িব এ জগতের লেখা,
শুধু এ অক্ষর দেখি করিব না ঘৃণা।
লোক হ'তে লোকান্তরে ভ্রমিতে ভ্রমিতে,

একে একে জগতের পৃষ্ঠা উলটিয়া
ক্রমে যুগে যুগে হবে জ্ঞানের বিস্তার।
বিশ্বের যথার্থরূপ কে পায় দেখিতে।
আঁখি মেলি চারিদিকে করিব ভ্রমণ
ভালবেসে চাহিব এ জগতের পানে
তবে তো দেখিতে পাবো স্বরূপ ইহার।

এই বোধটি সন্ন্যাসীর মনে উদিত হইয়া সীমা ও অসীমের রহস্য উদ্ঘাটন করিয়া দিয়াছে; তাই সে আর লোকালয় হইতে দূরে থাকিতে চায় নাই, কমণ্ডলুমাত্র সহায় করিয়া জগৎ-সমুদ্র পার হইবার ইচ্ছা করে নাই, কারণ এখন সে যে সাক্ষাৎ সোনার তরীর আশ্রয়লাভ করিয়াছে।

যাক্ রসাতলে যাক্ সন্ন্যাসীর ব্রত!
দূর কর, ভেঙ্গে ফেল দণ্ড কমণ্ডলু।
আজ হ'তে আমি আর নহিরে সন্ন্যাসী!
পাষাণ সংকল্প ভার দিয়ে বিসর্জন
আনন্দে নিশ্বাস ফেলে বাঁচি একবার।
হে বিশ্ব, হে মহাতরী চলেছ কোথায়,
আমারে তুলিয়া লও তোমার আশ্রয়ে—
একা আমি সাঁতারিয়া পারিব না যেতে!

যে একদিন সংসার হইতে বিবিক্ত থাকাকেই জীবনাদর্শ মনে করিত, সংসারের দশজনের সঙ্গে একতম হইয়া মিলিত হইতে আজ তাহার কি আগ্রহ!

কোটি কোটি যাত্রী ওই যেতেছে চলিয়া—
আমিও চলিতে চাই উহাদের সাথে।

যে পথে তপন শশী আলো ধ'রে আছে,
সে পথ করিয়া তুচ্ছ সে আলো ত্যজিয়া,
আপনারি ক্ষুদ্র এই খদ্যোত আলোকে
কেন অন্ধকারে মরি পথ খুঁজে খুঁজে।
জগৎ, তোমারে ছেড়ে পারিনে যে যেতে,
মহা আকর্ষণে সব বাঁধা আছি মোরা।
পাখী যবে উড়ে যায় আকাশের পানে
মনে ক'রে এনু বুঝি পৃথিবী ত্যজিয়া,
যত ওড়ে, যত ওড়ে যত উর্দ্ধে যায়
কিছুতে পৃথিবী তবু পারে না ছাড়িতে—
অবশেষে শ্রান্তদেহে নীড়ে ফিরে আসে। ১

একি সেই লোকের উক্তি প্রথম সংসারের পথে বাহির হইয়া জনপ্রবাহ দেখিয়া যে ধিক্কারে অবজ্ঞায় অনুকম্পায় বলিয়াছিল—

পথ দিয়া চলিতেছে, এরা সব কারা।
এদের চিনিনে আমি, বুঝিতে পারি নে,
কেন এরা করিতেছে এত কোলাহল।
কি চায় কিসের লাগি এত ব্যস্ত এরা!
এক কালে বিশ্ব যেন ছিলরে বৃহৎ,
তখন মানুষ ছিল মানুষের মত,
আজ যেন এরা সব ছোট হ'য়ে গেছে।

সন্ন্যাসীর চোখে জগৎ-দৃশ্যের আজ একি আনন্দময় পরিবর্তন!

আজ এ জগৎ হেরি কি আনন্দময়
সবাই আমারে যেন দেখিতে আসিছে।
নদী তরুলতা পাখী হাসিছে প্রভাতে।

১ আত্মপরিচয়, পৃঃ ২৩—২৪।

উঠিয়াছে লোকজন প্রভাত হেরিয়া,
হাসি মুখে চলিয়াছে আপনার কাজে।
ওই ধান কাটে, ওই করিছে কর্ষণ,
ওই গাভী নিয়ে মাঠে চলেছে গাহিয়া।
ওই যে পূজার তরে তুলিতেছে ফুল,
ওই নৌকা লয়ে যাত্রী করিতেছে পার।
কেহ বা করিছে স্নান, কেহ তুলে জল,
ছেলেরা ধূলায় বসে' খেলা করিতেছে,
সখারা দাঁড়ায়ে পথে কহে কত কথা।

একি সেই লোকের উক্তি মোহভঙ্গের পূর্বে জগৎ দেখিয়া যে বলিয়াছিল—

একি ক্ষুদ্র ধরা! একি বদ্ধ চারিদিকে!
কাছাকাছি ঘেঁসাঘেঁসি গাছপালা গৃহ,
চারিদিক হ'তে যেন আসিছে ঘেরিয়া,
গায়ের উপর যেন চাপিয়া পড়িবে!
চরণ ফেলিতে যেন হ'তেছে সঙ্কোচ,
মনে হয় পদে পদে রহিয়াছে বাধা।
এই কি নগর! এই মহা রাজধানী!
চারিদিকে ছোট ছোট গৃহ গুহাগুলি,
আনাগোনা করিতেছে নর-পিপীলিকা।

সন্ন্যাসীর তো সন্ন্যাসমোহ ভঙ্গ হইল। কিন্তু তাহা সহজে সাধিত হয় নাই—তাহার জন্য কঠিন আঘাতের প্রযোজন ছিল। এই আঘাত আসিল, বালিকার, রঘু-দুহিতার মৃত্যুরূপে। সন্ন্যাসীর অবহেলার কঠোরতা সহ্য করিতে না পারিয়া বালিকার মৃত্যু হইল। জগতের আনন্দময় সত্তা উপলব্ধি করিয়া সন্ন্যাসী গুহামুখে ফিরিয়া দেখে বালিকার মৃতদেহ পড়িয়া আছে। প্রকৃতিকে অবহেলা করিবার ইহাই চরম প্রতিশোধ। এই

অভিজ্ঞতা না ঘটিলে সন্ন্যাসীর পক্ষে জীবনোপলব্ধি পূর্ণ হইত না; জগতের প্রেমের আনন্দ সে বুঝিয়াছিল, এবারে সে প্রেমের দুঃখও বুঝিতে পারিল। এই মৃত্যু যেমন তাহার মোহভঙ্গের জন্য প্রয়োজন, তেমনি জীবনোপলব্ধির পক্ষেও সমানভাবে প্রয়োজন।

"প্রেমের সেতুতে যখন এই দুই পক্ষের ভেদ ঘুচিল, গৃহীর সঙ্গে সন্ন্যাসীর যখন মিলন ঘটিল, তখনি সীমায় অসীমে মিলিত হইয়া সীমার মধ্যে তুচ্ছতা ও অসীমের মিথ্যা শূন্যতা দূর হইয়া গেল"।১

ইহাই নাটকখানির পরিপূর্ণ আদর্শ, কিন্তু নাটকের মধ্যে শুধু মোহভঙ্গের পালা প্রত্যক্ষ ভাবে দেখানো হইলেও ইহার নাটকোত্তর পরিণাম সেই আদর্শেরই সূচনা করিতেছে।

৪

সন্ন্যাসীর জগৎ ও ব্যক্তিত্ব ছাড়া প্রাত্যহিক বাস্তব জগতের অনেক দৃশ্য নাট্য-মধ্যে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহার দুইটি উদ্দেশ্য; জগতের বাস্তব রূপ প্রদর্শন আর সেই বাস্তব রূপের সঙ্গে সন্ন্যাসীর স্বকল্পিত অবাস্তব রূপের দ্বন্দ্ব প্রদর্শন।

"প্রকৃতির প্রতিশোধের মধ্যে মধ্যে একদিকে যতসব পথের লোক যতসব গ্রামের নরনারী—তাহারা আপনাদের ঘরগড়া প্রাত্যহিক তুচ্ছতার মধ্যে অচেতনভাবে দিন কাটাইয়া দিতেছে; আর একদিকে সন্ন্যাসী, সে আপনার ঘরগড়া এক অসীমের মধ্যে কোনমতে আপনাকে ও সমস্ত কিছুকে বিলুপ্ত করিয়া দিবার চেষ্টা করিতেছে"।২

সন্ন্যাসী ও সংসারের নরনারী, দুয়েরই আদর্শকে কবি ভ্রান্ত বলিতে চান।

১ প্রকৃতির প্রতিশোধ—জীবনস্মৃতি।
২ প্রকৃতির প্রতিশোধ—জীবনস্মৃতি।

সন্ন্যাসীর ভ্রান্তির অবসানই প্রদর্শিত হইয়াছে; বাস্তবের ভ্রান্তির অবসান দেখাইবার অবসর কবির ঘটে নাই।

প্রকৃতির প্রতিশোধের বহুকাল পরে লিখিত জীবনস্মৃতিতে তাহার আলোচনা কিয়ৎপরিমাণে কালাত্যয় দোষের দ্বারা খণ্ডিত। নাটকটি লিখিবার সময়ে সাধারণ লোকের প্রাত্যহিক জীবন সম্বন্ধে জীবনস্মৃতিতে' আলোচিত তত্ত্ব কবির মনে ছিল কি না সন্দেহের বিষয়। তিনি যেন বলিতে চাহিয়াছিলেন, ইহাই সংসারের বাস্তব রূপ। হাসিকান্না, ভালমন্দ, তুচ্ছবৃহৎ, সত্যবিদ্রূপ মিলিয়া মিশিয়া সংসার এক সজীব, অদ্ভুত এবং মোটের উপরে আনন্দময় অভিজ্ঞতা। ইহারা পূজার নৈবেদ্য লইয়া যাত্রা করিয়া পথের মধ্যে রঙ্গ-তামাসা করিয়া নিরুদ্বেগে ঘরে ফিরিয়া আসে। "আজ আর মন্দিরে যাওয়া হল না। আবার আর একদিন আসতে হবে।" ইহারা এমনই সংসার রসের রসিক। সূক্ষ্ম হইতে স্থূল, কি স্থূল হইতে সূক্ষ্ম নামক গভীর বিতর্কের সময়ে সামান্য বাক্যখণ্ড পাইয়া নিশ্চিন্তে ঘরে ফিরিয়া যায়—ইহারা এমনই অদ্ভুত। নিতান্ত নিরাশ্রয় ব্যক্তিও স্পর্শদোষ বাঁচাইবার ইচ্ছায় অস্পৃশ্যের কুটীর পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করে—ইহারা এমনই নির্বোধ। চুল-চেরা আদর্শের সঙ্গে না মিলিলে দুঃখ করিয়া ফল নাই। সংসারের চেহারা বদলাইবার সম্ভাবনা নাই—বরঞ্চ আদর্শটাকে গড়িয়া পিটিয়া পরিবর্তন করিয়া লও। ইহাই যেন নাটক রচনাকালে কবির মনের ধারণা। জীবনস্মৃতিতে যেমন লিখিয়াছেন তেমন ধারণা নাটক রচনাকালে থাকিলে নাটকের মধ্যে প্রাত্যহিক নরনারীর বাস্তব মোহভঙ্গের আভাসের একটা ইঙ্গিতও অন্ততঃ থাকিত।

এই নাটকে সন্ন্যাসীর চরিত্র ছাড়া অন্য চরিত্র পূর্ণাঙ্গ করিয়া আঁকিবার চেষ্টা নাই।

রঘু-দুহিতার ব্যক্তিত্ব অতি ক্ষীণ; এই চরিত্রটির একমাত্র উদ্দেশ্য সন্ন্যাসীর সুপ্ত বৃত্তিগুলিকে উদ্বোধিত করা। অন্য সব নরনারী ছায়ামাত্র। কিন্তু এখানে

তাহা দোষ না হইয়া গুণের বিষয় হইয়াছে, কারণ সন্ন্যাসীর চোখ দিয়াই ইহাদের দেখানো হইয়াছে-আর সন্ন্যাসী সুদূর কল্পনার জগৎ হইতে ইহাদের ছায়ারূপেই যে দেখিতে পাইয়াছে।

রঘু-দুহিতার চরিত্রটি বৃহত্তর এক কারণেও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। রবীন্দ্রনাথের অনেক নাটকে, প্রকৃতির প্রতিশোধের আগেও বটে, পরেও বটে, হঠাৎ নাটকের ঘটনাস্রোতের মাঝখানে একটি বালিকা আসিয়া পড়ে; অনেক সময়ে সে ব্যক্তিবিশেষের কন্যা, অনেক সময়েই আবার সে অজ্ঞাতকুলশীলা।[১] তাহার আবির্ভাবের পরে ঘটনাস্রোত অপ্রত্যাশিতপূর্ব পরিণামমুখী হইয়া পড়ে। এই বালিকাগুলির ব্যক্তিত্ব অতি ক্ষীণ, অধিকাংশ সময়েই তাহারা অল্পবিস্তর নিষ্ক্রিয়, অনেক সময়েই ঘটনাস্রোতের মোড় ঘুরাইয়া দিবার পরে তাহারা সরিয়া যায় কিংবা অর্ধ প্রচ্ছন্নভাবে পটভূমিকায় আশ্রয় গ্রহণ করে। ঘটনাস্রোতের তাহারা কারণ হইলেও কার্যের উপরে তাহাদের প্রত্যক্ষ প্রভাব বেশী থাকে না। রঘু-দুহিতা এই জাতীয় বালিকাদের অন্যতম।

রবীন্দ্রনাথের নাটকে অনেক সময়ে স্থান ও কালের সন্নিবেশের মধ্যে গভীর ইঙ্গিত প্রচ্ছন্ন থাকে। বিশেষ, যে নাটকগুলিকে আমরা তত্ত্বনাট্য বলিতেছি, তাহাতে স্থান ও কাল প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতের গুরুত্বে পূর্ণ। এই রহস্য উদঘাটন করিতে পারিলে রসানুভূতি সম্পূর্ণতর হইবার আশা করা যায়।

প্রকৃতির প্রতিশোধের সন্ন্যাসীর 'গুহা' এই রকম একটি রহস্যময় স্থান। প্রথম দৃশ্যের স্থান এই গুহা, শেষ দৃশ্যের স্থান গুহামুখ। এই গুহা আর কিছুই নয়, ইহা সন্ন্যাসীর বিশ্ববিহীন আত্মকেন্দ্রী অন্ধকার ব্যক্তিত্ব মাত্র। এখানেই সন্ন্যাসীকে প্রথম আমরা দেখিতে পাই। বিশ্ববিনাশের সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া এই গুহা ত্যাগ করিয়া সংসারের রাজপথে সে বাহির হইয়া আসিয়াছে।

আমার নিজের প্রথম জীবনে আমি যেমন একদিন আমার অন্তরের একটা

---

১ প্রায় সমকালীন রচনার মধ্যে রাজর্ষির হাসি এবং বাল্মীকি প্রতিভার 'বালিকা' বিশেষভাবে তুলনীয়।

অনির্দেশ্যতাময় অন্ধকার গুহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া বাহিরের সহজ অধিকারটি হারাইতে বসিয়াছিলাম অবশেষে সেই বাহির হইতেই একটি মনোহর আলোক হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করিয়া আমাকে প্রকৃতির সঙ্গে পরিপূর্ণ করিয়া মিলাইয়া দিল, এই প্রকৃতির প্রতিশোধেও সেই ইতিহাসটিই একটু অন্য রকম করিয়া লিখিত হইয়াছে।১

সন্ন্যাসীর গুহা ও উপরে উল্লিখিত 'অন্তরের একটা অনির্দেশ্যতাময় অন্ধকার গুহা' একই বস্তু। ইহার পূর্ব বৎসরে লিখিত 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গের' গুহাও একই ইঙ্গিতে পূর্ণ। নির্ঝর আত্মকেন্দ্রী ব্যক্তিত্বের অন্ধকার গুহা পরিত্যাগ করিয়া বিশ্বভ্রমণে বাহির হইয়া পড়িয়াছে। নির্ঝর, সন্ন্যাসী ও কবি স্বয়ং—তবে প্রত্যেকের পরবর্তী কালের ইতিহাস এক রকম নয়। পরবর্তী কালে কবি যাহাকে 'হৃদয়অরণ্য' নাম দিয়াছেন—তাহাও প্রকৃতির প্রতিশোধের গুহা ছাড়া আর কিছু নয়।

আমার পনেরো ষোল হইতে বাইশ তেইশ বছর পর্যন্ত এই যে একটা সময় গিয়াছে, ইহা একটা অত্যন্ত অব্যবস্থার কাল ছিল। * * * অপরিণত মনের প্রদোষালোকে আবেগগুলা সেইরূপ পরিমাণ বহির্ভূত অদ্ভুত মূর্তি ধারণ করিয়া একটা নামহীন পথহীন অন্তহীন অরণ্যের ছায়ায় ঘুরিয়া বেড়াইত।২

প্রকৃতির প্রতিশোধ কবির তেইশ বছর বয়সে লিখিত।

মোহিতবাবুর গ্রন্থাবলীতে প্রভাত সঙ্গীতের কবিতাগুলিকে নিষ্ক্রমণ নাম দেওয়া হইয়াছে। কারণ, তাহা হৃদয়ারণ্য হইতে বাহিরের বিশ্বে প্রথম আগমনের বার্তা।৩

১ প্রকৃতির প্রতিশোধ—জীবনস্মৃতি, ৪০৯—৪১০, র-র, ১৭শ।
২ ভগ্নহৃদয়—জীবনস্মৃতি, ৩৭৩, র-র, ১৭শ।
৩ প্রভাতসঙ্গীত—জীবনস্মৃতি, ৪০১—৪০২, র-র, ১৭শ।

কবির মত প্রকৃতির প্রতিশোধের সন্ন্যাসীও হৃদয়ারণ্য পরিত্যাগ করিয়া বাহির বিশ্বে 'নিষ্ক্রমণ' করিয়াছে। তাহা হইলে দেখা গেল হৃদয়ারণ্য ও গুহা মূলত একই বস্তু এবং তাহা কবির জীবনের সঙ্গে সম্বদ্ধ।

সপ্তম দৃশ্যের পর্বত শিখরও এমনি একটা প্রচ্ছন্ন আভাসে পূর্ণ। সন্ন্যাসী তখনো সংসারের মধ্যে নামিয়া পড়ে নাই, দূর হইতে, উচ্চ হইতে, সিদ্ধিজাত অহংকারের ঊর্ধ্ব লোক হইতে তখনও সেই সংসারকে দেখিতেছে—সংসারকে নীচু, দূরগত অথচ সুন্দর মনে হইতেছে, পর্বতশিখর হইতে যেমনটি মনে হয় আর কি। সন্ন্যাসীর এই বিবিক্ত উচ্চতার ভাবটি প্রকাশের জন্য পর্বতশিখরের অবতারণা করা হইয়াছে।

চতুর্দশ দৃশ্যের 'প্রভাতটি'ও মহত্তর দ্যোতনায় উজ্জ্বল। ইহা কেবল জাগতিক প্রভাত নয়, সন্ন্যাসীর নবজীবনের প্রভাত; তাহার মোহভঙ্গের প্রভাত; ইহা 'প্রভাত সঙ্গীতের' প্রভাত; ইহা 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' ও 'প্রভাত-উৎসবের' প্রভাত। 'প্রভাত উৎসবের' ও চতুর্দশ দৃশ্যের প্রভাতে সংসারের যে বর্ণনা আছে ভাবের ঐক্য ছাড়াও বহুস্থলে প্রায় আক্ষরিক মিল দেখিতে পাওয়া যাইবে। স্থানের সূত্রে যেমন দেখিয়াছি, কালের সূত্রেও তেমনি দেখিলাম—প্রকৃতির প্রতিশোধের সন্ন্যাসীর অভিজ্ঞতার সঙ্গে কবির ব্যক্তি-জীবনের কতখানি ঐক্য! বাস্তবিক কবি ঠিকই বলিয়াছেন, প্রকৃতির প্রতিশোধেও সেই ইতিহাসটি (কবির ব্যক্তিগত জীবনের) একটু অন্য রকম করিয়া লিখিতে হইয়াছে।

এই নাটকটিতে অনেকগুলি রাজপথ, পথ, পথপার্শ্ব প্রভৃতি দৃশ্য আছে। এগুলি আর কিছু নয়—সংসারের আনাগোনা, চঞ্চল জীবনযাত্রাকে বুঝাইবার উদ্দেশ্যে এগুলি আবশ্যক। সন্ন্যাসীর জীবন ও বাস্তব জীবনে দ্বন্দ্ব দেখানো হইয়াছে, তেমনি রাজপথ ও পথের প্রত্যক্ষ প্রভেদ দেখানো হইয়াছে গুহা ও গুহামুখের সহিত।[১]

১ এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় ফাউস্ট নাটকের দৃশ্যগুলির মধ্যেও অনুরূপ দ্বন্দ্ব ও ইঙ্গিত বর্তমান।

৫

প্রারম্ভে বলিয়াছি যে, রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব নাটকীয় টেক্‌নিকের প্রথম স্থচনা দেখা যায় প্রকৃতির প্রতিশোধে। এখানে সে বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনার স্থান নয়। শুধু এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, রবীন্দ্রপ্রতিভায় বিশিষ্ট নাটকগুলি ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে বাঙলাদেশের মেলার চঞ্চল, জটিল, কোলাহলময় ও সঙ্গীতময় জীবনযাত্রাকে অধিক হইতে অধিকতর পরিমাণে ধরিতে চেষ্টা করিয়াছে। বাংলাদেশের মেলা ও বাংলাদেশের পথ—এই ছুটি মিলিয়া যে রসের স্থষ্টি করে, রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ পরিণত নাটকের সেই রস। এই নাটকখানির পথবহুল দৃশ্যগুলিতে, নানা জাতীয় লোকের নানা কারণে আনা-গোনায়, হাসি-তামাসায়, উদ্দাম কোলাহলে, অকারণ উল্লাসে—কবি মেলার ভাবটিকে প্রথম ধরিতে চেষ্টা করিয়াছেন ; খুব সম্ভব এখনো ইহা তাঁহার সজ্ঞান প্রয়াস নয়—অবচেতন মনের অন্ধ আবেগ। মেলাতে সংসারী লোক ছাড়াও কত অকাজের সন্ন্যাসী বাউল দেখা যায়—এই 'সন্ন্যাসী'টিকেও সেখানে দেখা গেল। পরবর্তী নাটকে শুধু সন্ন্যাসী নয়—বাউলকেও আমরা দেখিতে পাইব।

শারদোৎসব

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার যে সব নাটককে ঋতুউৎসব পর্যায়ের মনে করেন, শারদোৎসবে তাহাদের সূচনা।[১] কিন্তু আমরা তাঁহার নাটকের যে শ্রেণীভেদ করিয়াছি, তাহাতে শারদোৎসব ঋতুনাট্য পর্যায়ভুক্ত নহে। সূক্ষ্ম বিচারে ইহা ঋতুনাট্য শ্রেণীর না হইলেও প্রকৃতি ইহাতে মুখ্য হইয়া উঠিয়া মানুষের সঙ্গে রঙ্গমঞ্চকে ভাগাভাগি করিয়া লইয়াছে। ঋতুনাট্যে মানুষ যেমন একেবারে পটভূমিকায় গিয়া পড়িয়াছে, শারদোৎসবে তেমন নয়—তবে ধারাটা সেই দিকেই চলিয়াছে বটে। কাজেই এখানে ঋতু-উৎসবের মূলতত্ত্ব আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ সাহিত্যের উপজীব্য, আবার মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির সম্বন্ধও সাহিত্যের উপজীব্য। ঋতু-উৎসব এই শেষোক্ত সম্বন্ধজাত শিল্প-সৃষ্টি।

পৃথিবীতে মানবিক পরিধি সঙ্কীর্ণ, কিন্তু মানুষ যখন প্রকৃতির সঙ্গে যুক্ত হয়, তখন এই পরিধি বিস্তৃততর হয়; আবার মানুষ যখন ভগবানের সঙ্গে যুক্ত হয়, তখন এই পরিধি ও চরাচর মিলিয়া অনন্তে পরিণত হয়—তখন সীমায় ও সীমাহীনতায় আর ভেদ থাকে না।

মানুষ যদি কেবল মানুষের মধ্যেই জন্মগ্রহণ করিত, তবে লোকালয়ই মানুষের একমাত্র মিলনের ক্ষেত্র হইত। কিন্তু মানুষের জন্ম তো কেবল লোকালয়ে নহে, এই বিশাল বিশ্বে তাহার জন্ম। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে তাহার

১ বিশ্বভারতী কর্তৃক ১৩৩৩-এ প্রকাশিত ঋতুউৎসব নামক সংগ্রহ গ্রন্থে নিম্নোক্ত পাঁচটি নাটক আছে—শেষবর্ষণ, শারদোৎসব, বসন্ত, সুন্দর, ফাল্গুনী।

প্রাণের গভীর সম্বন্ধ আছে। তাহার ইন্দ্রিয়বোধের তারে তারে প্রতি মুহূর্তে বিশ্বের স্পন্দন নানা রূপে জাগিয়া উঠিতেছে।[১]

মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির দুইটি সম্বন্ধ, একটি প্রয়োজনের, অপরটি প্রেমের। প্রকৃতির সম্পদ গ্রহণ করিয়া মানুষ জীবনধারণ করিতেছে, সেখানে মানুষের সঙ্গে মনুষ্যেতর প্রাণীর ভেদ নাই। এখানে প্রকৃতিকে সে উপকরণমাত্র রূপে দেখিতেছে। কিন্তু যখনি প্রেমের সম্বন্ধ আরম্ভ হয়, প্রকৃতি উপকরণরূপ ত্যাগ করিয়া সজীব সত্তা হইয়া ওঠে। প্রয়োজনের ক্ষেত্রে প্রকৃতির কাজ মানুষের প্রাণের মহলে; প্রেমের ক্ষেত্রে তাহার কাজ মানুষের চিত্তে। এখানে প্রকৃতিকে গ্রহণ করিয়া তাহার নূতন দ্যোতনার সৃষ্টি করিয়া লইতে হয়।

পূর্বেই বলিয়াছি, ফুল-ফল-ফসলের মধ্যে প্রকৃতির সৃষ্টিকার্য কেবলমাত্র এক-মহলা; মানুষ যদি তাহার দুই মহলেই আপন সঞ্চয়কে পূর্ণ না করে, তবে সেটা তাহার পক্ষে বড় লাভ নহে। হৃদয়ের মধ্যে প্রকৃতির প্রবেশের বাধা অপসারিত করিলে তবেই প্রকৃতির সহিত তাহার মিলন সার্থক হয়, সুতরাং সেই মিলনেই তাহার প্রাণ, মন, বিশেষ শক্তি, বিশেষ পূর্ণতা লাভ করে।

মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলনের উৎসব ঘরে ঘরে ঘটিতেছে। কিন্তু প্রকৃতির সভায় ঋতু-উৎসবের নিমন্ত্রণ যখন গ্রহণ করি, তখন আমাদের মিলন আরো বড় হইয়া ওঠে। তখন আকাশ-বাতাস, গাছপালা, পশু-পক্ষী সকলের সঙ্গে মিলি—অর্থাৎ যে-প্রকৃতির মধ্যে আমরা মানুষ তাহার সঙ্গে সত্য-সম্বন্ধ আমরা অন্তরের মধ্যে স্বীকার করি। সেই স্বীকার কখনো নিষ্ফল নহে। কারণ পূর্বেই বলিয়াছি, সম্বন্ধেই সৃষ্টির প্রকাশ। প্রকৃতির মধ্যে যখন কেবল আছি মাত্র, তখন তাহা না থাকিবারই

১ গ্রন্থপরিচয়, র-র, ৭ম খণ্ড

সামিল, কিন্তু প্রকৃতির সঙ্গে প্রাণমনের সম্বন্ধ অনুভবেই আমরা সৃজন-ক্রিয়ার সঙ্গে সামঞ্জস্য লাভ করি। চিত্তের দ্বার রুদ্ধ করিয়া রাখিলে আপনার মধ্যে এই সৃজন-শক্তিকে কাজ করিবার বাধা দেওয়া হয়।

তাই নব ঋতুর অভ্যুদয়ে যখন সমস্ত জগৎ নূতন রঙের উত্তরীয় পরিয়া চারিদিক হইতে সাড়া দিতে থাকে, তখন মানুষের হৃদয়কেও সে আহ্বান করে—সেই হৃদয়ে যদি কোন রঙ না লাগে, কোন গান না জাগিয়া ওঠে, তাহা হইলে মানুষ সমস্ত জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকে।[১]

মানুষের নিজের জন্যই, নিজের আত্মোপলব্ধির জন্যই প্রকৃতির সঙ্গে মিলিত হওয়া আবশ্যক। আত্মোপলব্ধি মানে নিজের সীমানাকে খুঁজিয়া পাওয়া। মানুষ নিজের সীমানা খুঁজিতে বাহির হইলে দেখে, মানুষের সংসার ছাড়াইয়া তাহা বহুদূর বিস্তৃত। প্রাণের প্রয়োজনে মানুষ ও প্রকৃতির জগতের মধ্যে একটা দুর্লঙ্ঘ্য সীমান্ত প্রদেশ আছে, কিন্তু প্রেমের দৃষ্টিতে মানুষ ও প্রকৃতির জগতে বিচ্ছেদের কোন সীমান্ত রেখা নাই, মানুষ প্রেমের আলো হাতে অগ্রসর হইয়া দেখে দুই-এ মিলিয়া এক অখণ্ড বিরাট জগৎ; এই বিরাট জগতে পৌঁছিয়া মানুষ নিজেকে বিরাটতররূপে দেখিতে পায়—ইহাই তাহার যথার্থ আত্মোপলব্ধি।

ইউরোপীয় সাহিত্যে ঠিক এই জাতীয় ঋতুনাট্য আছে কিনা, জানি না, কিন্তু ইউরোপ প্রকৃতির চৈতন্যময় প্রেমঘোষিত রূপটি ঠিক বোঝে না। গ্রীকরা মানুষকে একান্ত করিয়া দেখিয়াছিল। প্রকৃতি যেখানে তাহাদের কাব্যে প্রবেশ করিয়াছে, হয় সেখানে সে ভীষণ, মানুষের সঙ্গে তাহার প্রতি-যোগিতা, সে একটা বিরুদ্ধ শক্তি, নয় সে মুগ্ধ খেলার সামগ্রী; খেলা শেষে তাহা বাহিরের মহলেই পুনঃস্থাপিত হয়, ভিতরের মহলে খেলার সামগ্রীর স্থান কোথায়? মধ্যযুগের 'গথিক' স্থাপত্যের কথা ছাড়িয়া দিলে ইউরোপীয়

১ গ্রন্থ পরিচয়,-র-র, ৭ম খণ্ড

শিল্পে প্রকৃতির স্থান সঙ্কীর্ণ ও মানুষের অনেক নীচে। সংস্কৃত নাটকে ইতর পাত্রপাত্রী যেমন প্রাকৃত ভাষায় কথা বলিত, ইউরোপীয় শিল্পে প্রকৃতিও তেমনি সসম্ভ্রমে, সসঙ্কোচে কথা বলে—শিল্পের উচ্চস্তরে তাহার প্রবেশ বাধাগ্রস্ত।

প্রকৃতিকে অসঙ্কোচে আত্মীয়রূপে চিত্তমহলে গ্রহণ করিবার ভাবটি একান্ত ভাবে ভারতীয়—এবং এদিক হইতে বিচার করিলে রবীন্দ্রনাথের ঋতুনাট্য, প্রকৃতির সহিত প্রেমের সম্বন্ধজ্ঞাপন ভারতীয় ধারার অন্তর্গত। যাঁহারা রবীন্দ্র-সাহিত্যকে মূলত বৈদেশিক অনুপ্রেরণার সৃষ্টি মনে করেন তাঁহারা ভারতীয় শিল্পের স্বরূপ অবগত নহেন বলিয়াই মনে হয়।

সেই বিচ্ছেদ দূর করিবার জন্য আমাদের আশ্রমে আমরা প্রকৃতির ঋতু-উৎসবগুলিকে নিজেদের মধ্যে স্বীকার করিয়া লইয়াছি। শারদোৎসব সেই ঋতু-উৎসবেরই নাটকের পালা।[১]

এই কথাটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। রবীন্দ্রনাথের সমস্ত ঋতুনাট্য ও ঋতু-উৎসবের পালা মুখ্যত শান্তিনিকেতন আশ্রমের জন্যই রচিত। ঋতু-উৎসব এই বিদ্যালয়ের একটি প্রধান অঙ্গ; বস্তুত কবির ঋতু-উৎসবেব পালা ও এই বিদ্যালয়কে ভিন্ন করিয়া দেখা একরকম অসম্ভব। তাঁহার ঋতু-উৎসবের যথার্থ পটভূমি ও পীঠস্থান এই আশ্রমবিদ্যালয়। ইহা কারণও আছে, যাঁহারা রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাতত্ত্বের সঙ্গে পরিচিত, তাঁহারা জানেন, তাঁহার শিক্ষাতত্ত্বে প্রকৃতির বিশেষ স্থান আছে। তাঁহার বিদ্যালয়ে যেমন ধর্মোপদেশের দ্বারা ছাত্রদের কাছে ভগবানের ইঙ্গিতদানের চেষ্টা আছে, তেমনি ঋতু-উৎসবের দ্বারা ছাত্রদের মনকে প্রকৃতির প্রতি উন্মুখ করিয়া তুলিবার চেষ্টাও আছে, কারণ মানুষ, প্রকৃতি ও ভগবানে মিলিয়াই তাঁহার জগৎ সম্পূর্ণ।

আমাদের দেশে সাধারণতঃ যে-শিক্ষা দেওয়া হয়, যে-শিক্ষা তিনি নিজে বাল্যকালে পাইয়াছিলেন, তাহাতে ধর্মোপদেশের স্থান নাই, প্রকৃতি সেখানে

১ গ্রন্থ পরিচয়, র-র, ৭ম খণ্ড।

নির্বাসিত। এইরূপে একপেশে শিক্ষার ফলে আমাদের দেশে মানব-প্রকৃতি পঙ্গু হইয়া গড়িয়া উঠিতেছে। এই পঙ্গুতার বিরুদ্ধেই তাঁর বাল্যকালের চিত্ত বিদ্রোহ করিয়াছিল—ফলে বিদ্যালয়ে যোগ দেওয়া তাঁহার পক্ষে সম্ভব হয় নাই। আমাদের দেশের বিদ্যালয়ে মানব-প্রকৃতিরও যে সম্পূর্ণ স্থান আছে, এমন মনে করিবার কারণ নাই। আমাদের বিদ্যালয়গুলি জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন, তাহাতে মানুষের সবটা রূপ দেখিবার সুযোগ নাই; তাহার মধ্যে পিতামাতা, ভাইবোনরূপে কেহ প্রবেশ করে না—সেখানে কেবল মানুষের শিক্ষক ও ছাত্র রূপটাই প্রত্যক্ষ। কিন্তু সংসারে কেহ তো ছাত্র ও শিক্ষক হইয়া জন্মগ্রহণ করে না; পুত্র-কন্যা, ভাইবোনরূপেই তাহার জন্ম। এই মানবিক সম্বন্ধচ্যুত শিক্ষক ও ছাত্রও মনুষ্যত্বের পঙ্গুরূপ। সেইজন্য আমাদের দেশে প্রাচীনকালের বিদ্যালয়গুলি আশ্রম ছিল, ছাত্র এখানে গুরুর পরিবারভুক্ত হইয়া মানব-সম্বন্ধের পরিপূর্ণতার স্বাদ পাইত। অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের টোল-গুলিতেও এই আদর্শ অনেক পরিমাণে অনুসৃত হইয়াছে।

শান্তিনিকেতন আশ্রমে ছাত্রগণ আশ্রম-পরিবারভুক্ত হইত। অল্প দিনের মধ্যে পরস্পরের মধ্যে পরিবারচৈতন্য শান্তিনিকেতন আশ্রমের প্রধান সম্পদ —অন্যত্র বাল্যকাল হইতে মানব-প্রকৃতি যেমন ক্ষুধিত থাকিয়া যায়, এখানে তাহা পূরণের ব্যবস্থা ছিল। এই যেমন মানব সম্বন্ধের দিক, তেমনি বাল্যকাল হইতে ছাত্রদের প্রকৃতির সত্তার প্রতি সচেতন করিয়া তুলিবার ব্যবস্থা ছিল—কারণ মানব আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ নয়, প্রকৃতির সহিত সম্বন্ধ হইলে তবেই তাহা পূর্ণতর হইয়া উঠে। আবার মানবকে পূর্ণতর করিবার উপায় ধর্মোপদেশের দ্বারা ভগবৎ-সত্তার প্রতি তাহাকে সচেতন করিয়া তোলা—পূর্বেই বলিয়াছি, তাহার ব্যবস্থাও এখানে আছে। এইভাবে মানবকে পূর্ণতার পথে চালিত করাই রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাতত্ত্বের মূলকথা। কাজেই ঋতু-উৎসবগুলি শান্তিনিকেতনের জীবনে একটা সৌখীন বিলাসমাত্র নয়; পড়াশুনা যেমন অত্যাবশ্যক, ঋতু-উৎসবগুলিও তেমনি অপরিহার্য; একই শিক্ষাপদ্ধতির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। এইজন্যই শান্তিনিকেতন আশ্রম ও ঋতু-উৎসবগুলিকে অভিন্ন

বলিয়াছিলাম। এই কথাটি আমাদের দেশের লোকে ঠিক বোঝেন বলিয়া মনে হয় না। পঙ্গুতাতেই আমরা এমন অভ্যস্ত যে, তাহাকেই স্বভাবের নিয়ম বলিয়া মনে করি। যতদিন আমাদের শিক্ষা-পদ্ধতিতে মানবসম্বন্ধের পূর্ণতার স্থান না হইবে এবং প্রকৃতি ও ভগবানের প্রবেশের পথ সেখানে বাধাগ্রস্ত থাকিবে, ততদিন এই পঙ্গুতাই চলিতে থাকিবে ; সর্বাঙ্গীন মানুষ সৃষ্টির রাজপথ প্রস্তুত হইবার কোন আশাই থাকিবে না।

ঋতু-উৎসবের তত্ত্ব সম্বন্ধে কবি এ পর্যন্ত যাহা বলিয়াছেন, তাহা সর্ব ঋতুর বিষয়েই সমানভাবে প্রযোজ্য। কিন্তু ঋতুতে ঋতুতে ভেদ আছে ; এক এক ঋতু এক এক রস বহন করিয়া আসে ; শরৎ ঋতুর বিশেষ রসটি কি ? অন্ততঃ রবীন্দ্রনাথের চোখে শরতের কোন বিশেষ মূর্তি উদ্ভাসিত হইয়াছে ? অর্থাৎ এই শারদোৎসব নাটকের বিশেষ রসটি কি ? কবির কি বাণী ইহাতে আছে, এবারে দেখা যাক্।

শারদোৎসব বড় সাধারণ রকমের নাম। রূপান্তরিত ঋণশোধ নামটিতে নাটকের মর্ম্মকথা অনেকটা প্রকাশিত হইয়াছে। প্রকৃতির প্রেম নিষ্ক্রিয়ভাবে গ্রহণ করিলে মানুষ যে শুধু ঋণী হইয়া থাকে এমন নয়, ঋণের দুর্লঙ্ঘ্য বাধার ফলে মিলনটি খণ্ডিত হইয়া যায়। একদিকে প্রকৃতি যেমন প্রেম দিতেছে, মানুষকেও তেমনি প্রেমদান করিয়া তাহার ঋণশোধ করিতে হইবে—তবেই যথার্থ মিলন হইবে—ইহাই 'ঋণশোধে'র মর্মকথা।

শরৎপ্রকৃতির মধ্যে জগতের এই ঋণশোধের মূর্তিটাই কবির চোখে পড়িয়াছে, বিশেষভাবে ইহাই যেন শরৎপ্রকৃতির লক্ষণ।

সন্ন্যাসী

আমি অনেক দিন ভেবেছি, জগৎ এমন আশ্চর্য সুন্দর কেন ? কিছুই ভেবে পাইনি। আজ স্পষ্ট প্রত্যক্ষ দেখ্‌তে পাচ্ছি, জগৎ আনন্দের ঋণশোধ করছে। বড় সহজে করছে না, নিজের সমস্ত শক্তি দিয়ে সমস্ত ত্যাগ করে করছে! সেই জন্যেই ধানের ক্ষেত এমন সবুজ ঐশ্বর্যে ভরে উঠেছে,

বেতসিনীর নির্মল জল এমন কানায় কানায় পরিপূর্ণ। কোথাও সাধনার এতটুকু বিশ্রাম নেই, সেই জন্যই এত সৌন্দর্য।

ঠাকুরদাদা

একদিকে অনন্ত ভাণ্ডার থেকে তিনি কেবলই ঢেলে দিচ্ছেন, আর একদিকে কঠিন দুঃখে তারই শোধ চল্‌ছে। সেই দুঃখের আনন্দ এবং সৌন্দর্য যে কি, সে কথা তোমার কাছে পূর্বেই শুনেছি। প্রভু কেবল এই দুঃখের জোরেই পাওয়ার সঙ্গে দেওয়ার ওজন বেশ সমান থেকে যাচ্ছে। মিলনটি এমন সুন্দর হ'য়ে উঠ্‌ছে।

প্রকৃতির আনন্দের ঋণশোধের অনুরূপ লীলা মানুষের জগতেও চলিতেছে। সে মূর্ত্তিটি ধরা পড়িয়াছে উপনন্দের চরিত্রে। সে গুরুর ঋণ বড় দুঃখে শোধ করিতেছে, সেই দুঃখই তাহার আনন্দ হইয়া উঠিয়াছে।

উপনন্দ

আজ ছুটির দিন—কিন্তু আমার ঋণ আছে, শোধ করতে হবে, তাই আজ কাজ করছি।

ঠাকুরদাদা

উপনন্দ, জগতে আবার তোমার ঋণ কিসের ভাই ?

উপনন্দ

ঠাকুরদাদা, আমার প্রভু মারা গিয়েছেন; তিনি লক্ষেশ্বরের কাছে ঋণী, সেই ঋণ আমি পুঁথি লিখে শোধ দেব।

ঠাকুরদাদা

হায়, হায়, তোমার মত কাঁচা বয়সের ছেলেকেও ঋণশোধ করতে হয়, আর এমন দিনেও ঋণশোধ ? ঠাকুর, আজ নূতন উত্তরে হাওয়ায় ওপারে কাশের বনে ঢেউ দিয়েছে, এপারে ধানের ক্ষেতের সবুজে চোখ একেবারে ডুবিয়ে দিলে, শিউলি বন থেকে আকাশে আজ পুজোর গন্ধ ভ'রে উঠেছে। এরই মাঝখানে

ঐ ছেলেটি আজ ঋণশোধের আঁয়োজনে বসে গেছে, এও কি চক্ষে দেখা যায় ?

সন্ন্যাসী

বল কী, এর চেয়ে সুন্দর আর কী আছে ? ঐ ছেলেটিই তো আজ শারদার বরপুত্র হ'য়ে তাঁর কোল উজ্জ্বল করে বসেছে। তিনি তাঁর আকাশের সমস্ত সোনার আলো দিয়ে ওকে বুকে চেপে ধরেছেন। আহা, আজ এই বালকের ঋণশোধের মতো এমন শুভ্র ফুলটি কি কোথাও ফুটেছে, চেয়ে দেখ তো। লেখো, লেখো, বাবা তুমি লেখো, আমি দেখি। তুমি পংক্তির পর পংক্তি লিখ্‌ছ, আর ছুটির পর ছুটি পাচ্ছ, তোমার এত ছুটির আয়োজন আমরা তো পণ্ড করতে পারবো না।

ঋণশোধের আনন্দে দুঃখ উজ্জল হইয়া উঠিয়াছে উপনন্দর কাছে—আর তাহার ছুটিই সকলের চেয়ে সার্থক, কারণ সে ছুটি ঋণভার হইতে মুক্তি।

আবার এই ঋণশোধের আর এক মূর্তি সম্রাট বিজয়াদিত্যের মধ্যে। তিনি রাজ ঋণশোধ করিবার জন্য সন্ন্যাসী হইয়াছেন। সিংহাসনের নির্বাসন হইতে মুক্ত হইয়া আজ তিনি দীনতম প্রজাটির সমকক্ষ হইতে চাহেন, আজ তিনি সামন্ত রাজা সোমপালের নিন্দা ও স্পর্ধাবাক্য স্বকর্ণে শুনিয়া নিজেকে পরীক্ষা করিয়া লইবেন।

বিজয়াদিত্য

মন্ত্রীর মনে এই বড় ক্ষোভ যে, রাজত্ব পাবার যে পিতৃঋণ, সে শোধ করবার জন্য আমার মন নেই।

শেখর

বিশ্ব আমাদের চিত্তে অমৃত ঢেলে দিচ্ছে, তার ঋণ আমাদের শোধ করতে হবে।

বিজয়াদিত্য

অমৃতের বদলে অমৃত দিয়ে তবে তো সেই ঋণশোধ করতে হয়। তোমার হাতে সেই শক্তি আছে। তোমার কবিতার ভিতর দিয়ে তুমি বিশ্বকে অমৃত ফিরিয়ে দিচ্ছ। কিন্তু আমার কি ক্ষমতা আছে বল? আমি তো কেবলমাত্র রাজত্ব করি।

শেখর

প্রেম ত সে অমৃত, মহারাজ।১

এখন মানবপ্রকৃতিতে এই ঋণশোধের অন্তরায় কি? তাহার কোন্ দোষে বিশ্বে যে উৎসব চলিতেছে, তাহা উজ্জ্বলতর না হইয়া ম্লান হইয়া যায়?

সন্ন্যাসী

ঠাকুর্দা, যেখানে আলস্য, যেখানে কৃপণতা, সেখানেই ঋণশোধ ঢিল পড়ে যাচ্ছে। সেখানেই সমস্ত কুশ্রী, সমস্তই অব্যবস্থা।

ঠাকুরদাদা

সেইখানেই যে এক পক্ষ কম পড়ে যায়, অন্য পক্ষের সঙ্গে মিলন পুরো হ'তে পায় না।

নাটকের পাত্রগণের মধ্যে এই উৎসবের বাধা কে? লক্ষেশ্বর—সে বণিক্ আপনার স্বার্থ লইয়া টাকা উপার্জন লইয়া সকলকে সন্দেহ করিয়া ভয় করিয়া ঈর্ষা করিয়া সকলের কাছ হইতে আপনার সমস্ত সম্পদ গোপন করিয়া বেড়াইতেছে। এই উৎসবের পুরোহিত কে? সেই রাজা, যিনি আপনাকে ভুলিয়া সকলের সঙ্গে মিলিত হইতে বাহির হইয়াছেন, লক্ষ্মীর সৌন্দর্যের শতদল পদ্মটিকে যিনি চান। সেই পদ্ম যে চায়, সোনাকে সে তুচ্ছ করে। লোভকে সে বিসর্জন দেয় বলিয়াই লাভ সহজ হইয়া সুন্দর হইয়া তাহার হাতে আপনি ধরা দেয়।২

১ ঋণশোধ নাটকের ভূমিকা।
২ গ্রন্থপরিচয়, রু-র, ৭ম খণ্ড।

এই উৎসবের বাধা লক্ষেশ্বর, তাহার মনে আনন্দ না থাকায় সে আনন্দের ঋণশোধ করিতে অক্ষম, আর এক বাধা সোমপাল, ঈর্ষাজর্জরিত সেই হতভাগা রাজত্বের ঋণশোধে অসমর্থ। আর এই উৎসবের সহায় উপনন্দ, সে গুরু ঋণ-শোধ করিতেছে, বিজয়াদিত্য রাজ ঋণশোধ করিতেছে, শেখর কবি কবিত্বের দ্বারা ঋণশোধ করিতেছে, আর ঠাকুরদাদা সর্ববন্ধনহীন ব্যক্তি ভক্তিতে, বাৎসল্যে সংসারের ঋণশোধ করিতেছে।

এই ঋণশোধেরই অপর নাম প্রকাশ। ধানের ক্ষেত প্রকৃতির ঋণ শস্যভারে প্রকাশ করিতেছে, সেই তাহার ঋণশোধ; নদীর ধারা আপন উদ্বেলতা প্রকাশ করিয়া বর্ষার ঋণশোধ করিতেছে। মানবপ্রকৃতিও যেখানে আত্মপ্রকাশশীল, সেখানে তাহার ঋণশোধ হইতেছে; কবি কবিতার দ্বারা, শিল্পী শিল্পসৃষ্টির দ্বারা, কর্মী কর্মের দ্বারা, প্রেমী প্রেমদান করিয়া যুগপৎ আত্মপ্রকাশ ও ঋণশোধ করিতেছে। এই প্রকাশকেই বলে সৌন্দর্য—"বিশ্ব প্রকৃতিতেও এই অমৃতের প্রকাশকেই বলে সৌন্দর্য, আনন্দরূপমমৃতম্।" এই প্রকাশই মুক্তি। "নিজের মধ্যে অমৃতের প্রকাশ যতই সম্পূর্ণ হইতে থাকে, ততই বন্ধনমোচন হয়—কর্মকে এড়াইয়া তপস্যায় ফাঁকি দিয়া পরিত্রাণ লাভ হয় না"।[১]

সেই জন্যই আত্মপ্রকাশের দ্বারা ঋণভারমুক্ত কবি, শিল্পী, সাধক, রাজসন্ন্যাসী সকলেই মুক্তপুরুষ; সেই জন্যই রাজসন্ন্যাসী বিজয়াদিত্যের যোগ্য সহচর শেখর কবি ও ঠাকুরদাদা, আর উপনন্দের সঙ্গে তাহাদের এমন একাত্মকতা!

এতো গেল তত্ত্বের কথা! কিন্তু এই তত্ত্বকে নাট্যরূপ দেওয়া হইয়াছে কি উপায়ে? গল্প-গ্রন্থি, ঘটনাপ্রবাহ, নাটকীয় পরিণাম, চরিত্রসৃষ্টি প্রভৃতি যেসব মাপকাঠির দ্বারা সাধারণ নাটকের বিচার হইয়া থাকে, রবীন্দ্রনাথের শারদোৎ-সব, ফাল্গুনী, ডাকঘর, রক্তকরবী প্রভৃতি তত্ত্বনাট্যে তাহার প্রয়োগ চলিবে না। এসব স্বতন্ত্র জাতির নাটক। এসব নাটকে রসোদ্বোধনের প্রধান উপায়

১ গ্রন্থপরিচয় র-র, ৭ম খণ্ড।

সঙ্গীত ও সময়োপযোগী আবহাওয়ার সৃষ্টি। সুর ও কথার দ্বারা সুকুমার একটি আবহাওয়া ধীরে ধীরে গঠিত হইয়া ওঠে ; এ যেন এক প্রকার কল্পনার কুহেলিকা ; এই কুহেলিকা পাঠক ও দর্শককে বেষ্টন করিয়া ক্ষণকালের জন্য কবির বাণীর সঙ্গে একাত্ম করিয়া ফেলে—তখন ইহার শিল্পরস ধীরে ধীরে পাঠকের মনে সঞ্চারিত হইয়া যায়। রসোদ্বোধনের এই নূতন উপায়টি অনেকে ধরিতে পারেন না, তাঁহারা সাধারণ নাটকের মানদণ্ড ইহাতে প্রয়োগ করিয়া ইহার অপমান করিয়া বসেন। শরৎকালের এই নাটকটি শরতের শিউলি ফুলের মতই সুকুমার, লঘুহস্তে ইহাকে গ্রহণ না করিয়া স্থূলহস্তাবলেপ চাপাইতে গেলে ইহা ম্লান হইয়া পড়ে। এ-সম্বন্ধে কবি সচেতন এবং পাঠককেও বারে বারে সচেতন করিয়া দিয়াছেন।

শারদোৎসবের প্রথম অভিনয় উপলক্ষ্যে কবি একটি নান্দী রচনা করিয়াছিলেন—

শরতে হেমন্তে শীতে বসন্তে নিদাঘে বরষায়
অনন্ত সৌন্দর্যধারে যাঁহার আনন্দ বহি যায়
সেই অপরূপ, সেই অরূপ. রূপের নিকেতন
নব নব ঋতুরসে ভরে দিন সবাকার মন।
প্রফুল্ল শেফালিকুঞ্জ যাঁর পায়ে ঢালিছে অঞ্জলি,
কাশের মঞ্জরীরাশি যার পানে উঠিছে চঞ্চলি,
স্বর্ণদীপ্তি আশ্বিনের স্নিগ্ধ হাস্যে সেই রসময়
নির্মল শারদরূপে কেড়ে নিন সবার হৃদয়।১

পাঠকের হৃদয়কে গোড়া হইতে উদ্‌গ্রীব অবারিত করিয়া রাখিতে হইবে যাহাতে ঋতুস্বরূপের পক্ষে অনায়াসে তাহা চয়ন করিয়া লওয়া সহজ হয়। এইভাবে প্রস্তুত হইবার জন্য পাঠককে কি করিতে হইবে, না সমস্ত ভার বিবর্জিত

১ গ্রন্থপরিচয়, র-র, ৭ম খণ্ড।

ছুটির প্রসন্ন লঘু মনোভাব লইয়া অপেক্ষা করিতে হইবে, কারণ শারদোৎসব ছুটির নাটক, ওর মধ্যে যদি কাজ থাকে, সে কাজেও কর্ম হইতে মুক্তির সাধনা।

ওটা হচ্ছে ছুটির নাটক। ওর সময়ও ছুটির, ওর বিষয়ও ছুটির। রাজা ছুটি নিয়েছে রাজত্ব থেকে, ছেলেরা ছুটি নিয়েছে পাঠশালা থেকে। তাদের আর কোনো মহৎ উদ্দেশ্য নেই কেবল একমাত্র হচ্ছে—'বিনা কাজে বাজিয়ে বাঁশি কাটবে সকল বেলা'। ওর মধ্যে একা উপনন্দ কাজ করছে কিন্তু সেও তার ঋণ থেকে ছুটি পাবার কাজ।[১]

দর্শকদের এই ছুটির আবহাওয়ার জন্য প্রস্তুত করিবার চেষ্টা আছে শারদোৎসবের ভূমিকায়। এ-নাটকখানিকে কিভাবে গ্রহণ করিতে হইবে, বিশদভাবে কবি তাহা বিস্তারিত করিয়াছেন।

রাজা

তাকে (এই নাটককে) শরৎকালের উপযোগী বলবার মানে কী হ'ল?

মন্ত্রী

কবি বলেন, শরৎকালের মেঘ যে হাল্‌কা. তার কোন জলভার নেই, সে নিঃসম্বল সন্ন্যাসী।

রাজা

একথা সত্য বটে।

মন্ত্রী

কবি বলেন, শরৎকালের শিউলী ফুলের মধ্যে যেন কোন আসক্তি নেই, যেমন সে ফোটে, তেমনি ঝরে পড়ে।

১ ভানুসিংহের পত্রাবলী পৃঃ ১৩৬-১৩৭।

রাজা

একথা মানতে হয়।

মন্ত্রী

কবি বলেন, শরৎকালের কাশের স্তবক না বাগানের না বনের; সে হেলাফেলায় মাঠে-ঘাটে অকিঞ্চনতার ঐশ্বর্য বিস্তার করে বেড়াচ্ছে। সে সন্ন্যাসী।

রাজা

একথা কবি বেশ বলেছে।

মন্ত্রী

কবি বলেন, শরতের কাঁচা ধানের যে ক্ষেত দেখি, কেবল আছে তার রঙ, আছে তার দোলা। আর কোন দায় যদি তার থাকে সে-কথা একেবারে সে লুকিয়েছে।

রাজা

ঠিক কথা।

মন্ত্রী

তাই কবি বলেন, তাঁর শারদোৎসবের যে পালা সে ওই রকমই হাল্কা, ও রকমই নিরর্থক। সে-পালায় কাজের কথা নেই, সে-পালায় আছে ছুটির খুশি।[১]

ওর মধ্যে যে রাজা আছেন, তিনিও রাজত্ব হইতে ছুটি লইয়াছেন, যে ছেলের দল আছে, তারাও কাঁচা ধানের ক্ষেতের মত 'ছুটির ভিতরেই ফসলের আয়োজন' গোপন করিয়াছে—আর ঠাকুরদাদা তো মূর্তিমান্ ছুটি।

এই কথাটি এত করিয়া বলিবার কারণ—

১ গ্রন্থপরিচয়, র-র, ৭ম খণ্ড।

রাজা

কিন্তু, মন্ত্রী সহজে খুশি হবার বিদ্যা তো পুরবাসীদের বিদ্যা নয়। এই সব হাল্‌কা, এইসব কাঁচা, এইসব না-শেখা ব্যাপারের মূল্য কি তাঁদের কাছে আছে?

আবহাওয়ার পরিপূর্ণ মূর্তিটি শারদোৎসব নাটকের মধ্যে আছে। রাজ-সন্ন্যাসী ছেলের দলে যোগ দিয়া শারদার পুরোহিত সাজিয়া তাঁহার আবাহন করিতেছেন।

সন্ন্যাসী

এবার অর্ঘ্য সাজানো যাক। এই যে টগর, এই বুঝি মালতী, শেফালিকাও অনেক এনেছ দেখছি। সমস্তই শুভ্র, শুভ্র, শুভ্র। বাবা, এইবার সব দাঁড়াও। একবার পূর্ব আকাশে দাঁড়িয়ে বেদ মন্ত্র পড়ে নিই।১

শারদার আবাহন বেদমন্ত্রে এবং সঙ্গীতে।

সন্ন্যাসী

পৌঁছেছে, তোমাদের গান আজ একেবারে আকাশের পারে গিয়ে পৌঁছেছে। দ্বার খুলেছে তাঁর। দেখ্‌তে পাচ্ছো কি, শারদা বেরিয়েছে!২

বালকরা তাঁহার আবির্ভাব অনুভব করিতেছে, কিন্তু কিসে আবির্ভাব স্পষ্ট করিয়া বুঝিতে পারিতেছে না। সন্ন্যাসী বলিতেছেন,

কিসে! এই তো স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে, আলোতে, আনন্দে! বাতাসে শিশিরের পরশ পাচ্ছো না?

১, ২ শারদোৎসব, র-র, ৭ম খণ্ড।

দ্বিতীয় বালক

পাচ্ছি

সন্ন্যাসী

তবে আর কি! চক্ষু সার্থক হ'য়েছে, শরীর পবিত্র হ'য়েছে, মন প্রশান্ত হ'য়েছে। এসেছেন, এসেছেন, আমাদের মাঝখানেই এসেছেন। দেখছ না, বেতসিনী নদীর ভাবটা! আর ধানের ক্ষেত কি রকম চঞ্চল হ'য়ে উঠেছে![১]

এই আবির্ভাবই শারদোৎসবের মূল কথা—রবীন্দ্রনাথের সমস্ত ঋতু-উৎসবের মূল কথা। এই আবির্ভাবকে পাঠক হৃদয়ের মধ্যে অনুভব করিবে—আর তাহার জন্যই সুরে, কথায়, অনুকূল আবহাওয়া সৃষ্টির চেষ্টা। কবি ও অভিনেতা এবং দর্শক ও পাঠকের মধ্যে যোগ স্থাপনের প্রধানতম উপায়—অনুকূল আবহাওয়া। রবীন্দ্রনাথের ঋতু-উৎসব বিচারের সময় কথাটি মনে রাখিতে হইবে।

রবীন্দ্রনাথের শেষ বয়সের কবিতায় ও তত্ত্বনাট্যে একটা ছায়াসম গুণ আছে, যেন সবটা ধরাছোঁয়া যায় না, ধরিয়াছি মনে করিতেই দেখা যায়, হাতের মধ্যে কিছুই নাই। এ ব্যাপারটা আমরা সকলেই অনুভব করি—কিন্তু কারণ নির্দেশ করিতে পারি না বলিয়া কবিকে দোষী করি, নিজেরাও যে দায়ী হইতে পারি, তাহা বিশ্বাস করি না।

তাঁহার শেষ বয়সের কবিতায় ও তত্ত্বনাট্যে এমন কতগুলি কথা তিনি বলিতেছেন, এমন একটা জগতের খবর দিতেছেন, যাহা প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতার অন্তর্গত নয়। প্রাত্যহিক জীবনের চিহ্ন দ্বারা, প্রাত্যহিক জগতের ভাষার দ্বারা তাহার প্রকাশ সম্ভব নয়, কাজেই বাধ্য হইয়া ছায়ার সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন তাঁহাকে করিতে হইয়াছে। এই 'ছায়াসম' গুণই একমাত্র সেই জগতকে

১ শারদোৎসব, র-র, ৭ম খণ্ড

কথঞ্চিৎ প্রকাশ করিতে সমর্থ; তাহার প্রকৃতির মধ্যেই এমন বাধা আছে, যাহাতে সম্পূর্ণ প্রকাশ আদৌ সম্ভব নয়।

এই কারণেই এইসব নাটকের চরিত্রগুলি ছায়াসম করিয়া গঠিত। অধিকাংশ চরিত্রই type বা শ্রেণীরূপ, চরিত্রের সাধারণ সীমানা আছে, কিন্তু বিশিষ্টতা নাই। ছায়াসম জগতের অধিবাসিগণ শ্রেণীরূপমাত্র. বিশিষ্ট ব্যক্তি নয়। এখানকার রাজা—রাজামাত্র, কোথাকার রাজা জানা অনাবশ্যক।

আবার এইসব নাটকের প্রকৃতিও—প্রকৃতির শ্রেণীগতরূপ, প্রকৃতির সাধারণরূপ, কোন বিশেষ স্থানের প্রকৃতির রূপ নয়। তৎস্থানিকতা ও তৎকালিকতা গুণ নাটকগুলিতে নাই বলিলেই চলে। বরঞ্চ বিশিষ্ট ব্যক্তি বা প্রকৃতির বিশেষরূপ সৃষ্টি করিলে নাটকের 'ছায়াসম' গুণ নষ্ট হইত—আর সে গুণ নষ্ট হইলে কবি কি করিয়া তাঁহার বক্তব্য প্রকাশ করিতেন?

শারদোৎসব নাটকে এই 'ছায়াসম' গুণের সূচনামাত্র, ইহার পরিপূর্ণ রূপ পরবর্তী নাটকে আছে। ইহার সম্রাট বিজয়াদিত্য রাজসন্ন্যাসীর শ্রেণীরূপ, সোমপাল ঈর্ষাজর্জরিত ক্ষুদ্র সামন্তরাজের শ্রেণীরূপ, মানুষের অমায়িক উদারতা যেন দেহের সব গুণ বর্জন করিয়া ঠাকুরদাদারূপে বিচরণ করিতেছে। ঋণশোধের দুঃখ ও আনন্দকে একত্র ঢালাই করিয়া যেন উপনন্দ চরিত্র সৃষ্ট। ঠিক এই ঋণশোধের ভাবটি প্রকাশের জন্য যেটুকু গুণ অত্যাবশ্যক, উপনন্দ চরিত্রে মাত্র তাহাই দেওয়া হইয়াছে, তদতিরিক্ত কিছু দেওয়া হয় নাই। সাধারণতঃ এভাবে বিধাতাপুরুষ মানুষ সৃষ্টি করেন না। কিন্তু কবি তো বিধাতার সৃষ্ট জগতের কথা লিখিতেছেন না, তিনি বিধাতার জগতের পাশে, আর একটা নূতন জগৎ গড়িতেছেন, সেই জগতের প্রয়োজন অনুসারে চরিত্রগুলির সৃষ্টি করিয়া সব লোককে বিচার করিতে হইবে।

একমাত্র লক্ষেশ্বর চরিত্রে কিছু বিশিষ্টতা আছে। কিন্তু চরিত্রটিতে নাটকীয় গুণের অসীম সম্ভাবনা ছিল, কবি ইচ্ছা করিয়াই তাহাদের উন্মেষ না করিয়া কেবল তাহার কৃপণ রূপটাকে প্রকট করিয়া ধরিয়াছেন। ক্ষেত্রান্তরে এই চরিত্রকে বিরাট ট্র্যাজিক চরিত্রে রূপান্তরিত করা যাইতে

পারিত। তাঁহার গজমোতি ও ধন-রত্নের পেটিকা সম্রাটের দ্বারা অপহৃত হইলে লক্ষেশ্বর শাইলকের ট্র্যাজিক মহত্ত্ব লাভ করিতে পারিত। কিন্তু শারদোৎসবের নাট্যক্ষেত্র তাহার যথার্থ স্থান নয়। কবি এ লোভ সংবরণ করিয়া অসীম শিল্পবুদ্ধির পরিচয় দিয়াছেন।

শারদোৎসবের প্রকৃতিও বিশিষ্ট ·গুণ বর্জিত। তাহা শরৎকাল, এই মাত্র—শরতের সাধারণতম গুণগুলি ছাড়া আর কোন উপাধি তাহার নাই। নদীর নাম বেতসিনী দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু তাহা না দিয়া নদীমাত্র বলিলেও ক্ষতি ছিল না। মানুষ যেমন বিশিষ্টতাবর্জিত, প্রকৃতিও তেমন গতবিশেষ। এখানকার মানুষ যে কোন মানুষ, এখানকার স্থান যে কোন স্থান, এখানকার কাল যে কোন কাল। শারদোৎসব ও তত্ত্বনাট্যগুলির বিচারের সময় কথাগুলি সর্বদা মনে না রাখিলে ইহাদের প্রতি সুবিচার করা সম্ভব হয় না।

অচলায়তন

'অচলায়তন' নাটকে প্রকৃতপক্ষে তিনটি ভিন্ন শ্রেণীর অচলায়তন আছে। এই মূল তথ্যটি মনে না রাখিলে ইহার সম্পূর্ণ রস গ্রহণ করা সহজ হইবে না।

প্রথম, অচলায়তনিকদের অচলায়তন

দ্বিতীয়, শোণপাংশুদের অচলায়তন

এবং

তৃতীয়, দর্ভকদের অচলায়তন।

কবির মতে এই তিনটিই অচলায়তন পর্যায়ভুক্ত, তবে নাট্য-শিল্পের খাতিরে মহাপঞ্চকের অচলায়তনের উপরেই শিল্পের আলো উগ্রভাবে ফেলিয়া তাহাকে উজ্জ্বলতর করিয়া দেখানো হইয়াছে, অপর দু'টিকে তেমন উজ্জ্বলভাবে পাঠকের মনোযোগের কেন্দ্রে আকর্ষণ করা হয় নাই। ইহা কেবল নাট্যকলার অনুরোধে। তত্ত্বের বিচারে অচলায়তন সৃষ্টির অপরাধ তিনদলেরই সমান—তবে তিন দলের অচলায়তনের রূপ স্বতন্ত্র।

রূপ যে স্বতন্ত্র, তাহার কারণ তিন দলের সাধনার পথও ভিন্ন।

মহাপঞ্চকের অচলায়তনের সাধনা জ্ঞানমার্গে

শোণপাংশুর অচলায়তনের সাধনা কর্মমার্গে

এবং

দর্ভক দলের অচলায়তনের সাধনা ভক্তিমার্গে।

এই তিন দল বিভিন্ন তিন মার্গে সাধনা করিয়া চলিয়াছে, তিন মার্গের মধ্যে তাহারা কোনরূপ সমন্বয়ের চেষ্টা করে নাই, তাহারা নিজ নিজ সাধন পন্থাকেই শ্রেষ্ঠ ও একমাত্র পন্থা বলিয়া ভাবিয়াছে, সেইজন্য

কেহই গুরুর প্রকৃত স্বরূপ ধরিতে পারে নাই অথচ তিন দলই একই গুরুর অন্বেষণ করিতেছে। ইহাই 'অচলায়তন' নাটকের একেবারে গোড়ার কথা।

মহাপঞ্চকের অচলায়তনিকগণ বিশুদ্ধ জ্ঞানমার্গের সাধনার একাগ্রতায় মন্ত্রকে মননের চেয়ে, আচারকে মানুষের চেয়ে এবং পুঁথিকে গুরুর চেয়ে বড় মনে করিয়াছিল—ফলে জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়া সৃষ্টিছাড়া এক সৃষ্টির মধ্যে তাহারা বাস করিতেছিল। তাহারা নিজেদের চারিদিকে যে প্রাচীর তুলিয়াছিল, তাহা কেবল পাথরেব নয়, মোহের মশলার গাঁথুনিতে তাহা প্রায় দুর্ভেদ্য হইয়া উঠিয়াছিল; এই মোহপিনদ্ধ প্রাচীর ভাঙিবার জন্যই গুরুর আবির্ভাব।

শোণপাংশুর দল কর্মমার্গী—তাহারা কর্মরসিক বলিয়া কাজকেই একমাত্র লক্ষ্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিল। কর্ম যে লক্ষ্য নয়, আব কিছুব উপলক্ষ মাত্র তাহা যেন তাহারা ভুলিয়াই গিয়াছিল। জ্ঞানও যেমন উপলক্ষ, কর্মও তেমনি উপলক্ষ; মহাপঞ্চক প্রভৃতি ও শোণপাংশুব দল উভয়েই ভ্রান্ত—তবে ভ্রান্তির পথ ভিন্ন, প্রভেদ এইটুকু মাত্র।

অচলায়তনের ভাঙা প্রাচীর পুনরায় গাঁথিয়া তুলিবার উপলক্ষে দাদাঠাকুর পঞ্চককে উপদেশ দিতেছেন যে এমনভাবে প্রাচীব গড়িয়া আযতন সৃষ্টি করিতে হইবে, যাহাতে ওখানে সবাইকে ধবিতে পারে।

পঞ্চক

সবাইকে কি কুলবে।

দাদাঠাকুর

না যদি কুলোয়, তাহলে এমনি কবে দেয়াল আবার আর একদিন ভাঙতেই হবে, সেই বুঝে গেঁথো—আমার কাজ আর বাড়িয়ো না।

পঞ্চক

শোণপাংশুদের—

দাদাঠাকুর

হাঁ, ওদেরও ডেকে এনে বসাতে হবে, ওরা একটু বস্‌তে শিখুক।

পঞ্চক

ওদের বসিয়ে রাখা? সর্বনাশ! তার চেয়ে ওদের ভাঙ্‌তে চুরতে দিলে ওরা বেশী ঠাণ্ডা থাকে। ওরা যে কেবল ছট্‌ফট করাকেই মুক্তি মনে করে।

দাদাঠাকুর

ছোট ছেলেকে পাকা বেল দিলে সে ভারি খুশী হ'য়ে মনে করে এটা খেলার গোলা। কেবল সেটাকে গড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়। ওরাও সেই রকম স্বাধীনতাকে বাইরে থেকে একটা মজার জিনিস বলে জানে—কিন্তু জানে না স্থির হ'য়ে ব'সে তার ভিতর থেকে সার পদার্থটা বের ক'রে নিতে হয়। কিছুদিনের জন্য তোমার মহাপঞ্চক দাদার হাতে ওদের ভার দিলেই খানিকটা ঠাণ্ডা হ'য়ে ওরা নিজের ভিতরের দিকটাতে পাক ধরাবার সময় পাবে।

শোণপাংশুরা অন্তরের ভিতর হইতে মুক্তি চায় না, বাহিরের স্বাধীনতা চায়—সে স্বাধীনতার অপর নাম কাজ করিবার অবাধ অবসর। কাজ করিতে করিতে তাহাদের মন শুকাইয়া উঠিয়াছে—তবু তাহারা রসের প্রার্থী নহে, কারণ রসের বর্ষণে কাজ নষ্ট হয় বলিয়া তাহাদের বিশ্বাস।

দাদাঠাকুর

যেখানে আকাশ থেকে বৃষ্টি পড়ে না সেখানে খাল কেটে জল আনতে হয়। ওদের রসের দরকার হবে তখন দূর থেকে ব'য়ে আনবে। কিন্তু দেখেছি ওরা বর্ষণ চায় না, তাতে ওদের কাজ কামাই যায়, সে ওরা কিছুতেই সহ্য করতে পারে না, ঐ রকম ওদের স্বভাব।

এ বিষয়ে মহাপঞ্চক প্রভৃতির সঙ্গে ইহাদের বিস্ময়কর ঐক্য। মহাপঞ্চকও রস চায় না, তাহাতে তাহার সাধনার ব্যাঘাত ঘটিবে বলিয়া বিশ্বাস।

অচলায়তনিকদের যেমন শান্তিভঙ্গ প্রয়োজন, শোণপাংশুদের তেমনি প্রয়োজন শান্তির।

দাদাঠাকুর

নইলে কেবলই কাজের ঘর্ষণে ওদের কাজের মধ্যেই দাবানল লেগে যেত, ওদের মধ্যে কেউ দাঁড়াতে পারতো না।

পৃথিবীর শোণপাংশু যাহারা—কর্মমার্গই যাহাদের অবলম্বন—তাহাদের অবিরাম কাজের ঘর্ষণে সত্যই কি দাবানল লাগিয়া যায় নাই? গুরু কি তাহাদের রক্ষা করিতে পারিয়াছেন!

আগে বলিয়াছি, শোণপাংশুরা গুরুর স্বরূপ বুঝিতে পারে নাই—তাহারা তাঁহাকে কেবল কর্মের সঙ্গী মাত্র মনে করিয়াছে—

যিনি সকল কাজের কাজী, মোরা তাঁরই কাজের সঙ্গী।

গুরুর কর্মরূপটুকু মাত্র তাহারা জানে, সমগ্র রূপ নয়, কাজেই স্বরূপ নয়।

শোণপাংশুদের কর্মের মধ্যে ভাঙা-চোরার কাজটাতেই তাহাদের যেন বেশী আনন্দ। 'তার চেয়ে ওদের ভাঙতে-চুরতে দিলে ওরা বেশী ঠাণ্ডা থাকে।' গুরু অবশ্য অচলায়তনের ভাঙা প্রাচীর গাঁথিয়া তুলিবার কাজে তাহাদের নিয়োগ করিয়াছেন, কিন্তু প্রাচীর ভাঙিবার সময় যে রকম উল্লাসে তাহারা ছুটিয়াছিল—প্রাচীর গড়িবার সময়ে যে তেমনি উল্লাস তাহাদের হইয়াছে, তাহা কেমন যেন বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয় না; অন্ততঃ উল্লাসের কোন পরিচয় তাহাদের কথায় বা ব্যবহারে দেখা যায় নাই। প্রাচীর গড়ায় তাহারা নিযুক্ত কর্তব্যের অনুরোধে, প্রাচীর ভাঙায় তাহারা ধাবিত অন্তরের উল্লাসে।

দর্ভকরা নীরবে, নিরহঙ্কার ভক্তিমার্গে সাধনা করিয়া চলিয়াছে। শোণ-পাংশুদের কাছে যিনি খেলার সাথী, দাদাঠাকুর, অচলায়তনের কাছে যিনি

জ্ঞানলভ্য গুরু, দর্ভকদের কাছে তিনিই গোঁসাইঠাকুর, যে 'পূর্ণিমার দিনে এসে আমাদের পিঠে খেয়ে গেছে, তারপর এই এতদিন পরে দেখা।'

আচার্য

আমাদের আয়তনের পাশেই এই দর্ভকপাড়ায় তুমি আনাগোনা করছ, আর কত বৎসর হ'য়ে গেল আমাদের আর দেখা দিলে না?

দাদাঠাকুর

এদের দেখা দেওয়ার রাস্তা যে সোজা। তোমাদের সঙ্গে দেখা করা তো সহজ ক'রে রাখনি।

দর্ভকপাড়ার পথ ভক্তির পথ—সে পথে সহজেই যাতায়াত চলে। তবু দর্ভকরাও গুরুর স্বরূপ অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপ জানিতে পায় নাই—ভক্তির দ্বারা যে অংশটুকু জানিতে পারা যায় তাহাই মাত্র জানিয়াছে। ভক্তির দ্বারা সম্পূর্ণরূপ জানা যায় কি না সে প্রশ্ন এখানে অবান্তর। কবি তাহার কি ভাবে উত্তর দিয়াছেন তাহাই এখানে একমাত্র আলোচ্য বিষয়। কবির মতে দাদাঠাকুর, গোঁসাই, গুরু—এই তিন মূর্তিতে মিলিয়া গুরুর সম্পূর্ণ রূপ; ইহাদের মধ্যে যে-কোন একটিকে বাদ দিলেই তাঁহাকে খণ্ডিত করা হইল। কবি বলিতে চান জ্ঞান, কর্ম, ভক্তির সমন্বয়েই সাধনার সার্থকতা।

এখানে জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তির সমন্বয়ের কথা বলা হইয়াছে বটে, কিন্তু জ্ঞানমার্গী অচলায়তনিকগণ, কর্মমার্গী শোণপাংশুগণ নাটকের মধ্যে যত গুরুত্ব লাভ করিয়াছে, ভক্তিমার্গী দর্ভকদের সে গুরুত্ব দান করা হয় নাই। ইহা কি কেবল দীর্ঘ হইয়া যাইতেছে এমন নাটককে দ্রুত শেষ করিবার সুলভ পন্থা, না কবির অন্তরের সহানুভূতির কিয়ৎ পরিমাণে অভাব? অন্যত্র যাহাই হোক, আমার কেমন ধারণা হইয়াছে, এই নাটকখানিতে জ্ঞানপন্থা ও কর্মপন্থার প্রতি কবির যে পরিমাণ সহানুভূতি, ভক্তিপন্থা:র উপরে ততটা নয়। মহাপঞ্চক ও শোণপাংশুর চরিত্রের ত্রুটির সঙ্গে মহিমাও ফুটিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু দর্ভক

চরিত্রে কেবলই যেন দীনতা। অচলায়তনের নূতন প্রাচীর গাঁথিবার জন্য গুরু যাহাদের আহ্বান করিয়াছেন তাহাদের মধ্যে অচলায়তনের ব্রহ্মচারীগণ আছে, শোণপাংশুগণ আছে, কিন্তু দর্ভকগণ স্পষ্টত নাই।

'গুরু না দাদাঠাকুর এই প্রশ্নের উত্তরে দাদাঠাকুর বলিতেছেন,'যে জানতে চায় না, আমি তাকে চালাচ্ছি আমি তার দাদাঠাকুর, আর যে আমার আদেশ নিয়ে চলতে চায়, আমি তার গুরু'।

এখানে জ্ঞানমার্গের উল্লেখ আছে, কর্মমার্গের উল্লেখ আছে, কিন্তু ভক্তি-মার্গের দর্শকরা একেবারেই বাদ পড়িয়া গিয়াছে।

ইহাতে আমার মনে হয়, এই নাটকের মধ্যে দর্ভকগণ অর্থাৎ ভক্তিমার্গ কতক পরিমাণে যেন সমস্যা পূরণের জন্যই আনীত হইয়াছে; অন্য দুটির প্রতি কবির যেমন দরদ, ইহার প্রতি দরদ তেমন গভীর নয়। অবশ্য এই মন্তব্য কেবল এই নাটক সম্বন্ধেই প্রযোজ্য—অন্যত্র খাটিবে না।

২

এই নাটকে অচলায়তনিকদের প্রাণহীন আচারের ও মননহীন মন্ত্রের প্রতি কবির ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ বর্ষিত হইয়াছে, কিন্তু জ্ঞানমার্গের মৌলিক মাহাত্ম্যকে তিনি অস্বীকার করিতে পারেন নাই। জ্ঞানমার্গের তপস্যায় মানুষের মন যতই শুষ্ক হোক না কেন, এই শুষ্কতাই তাহার মনকে সংহত, সংযত করিয়া এক প্রকার রুদ্রশক্তি দান করে, জীবনের পক্ষে যাহা অপরিহার্য। ইহার সবচেয়ে বড় প্রমাণ মহাপঞ্চক চরিত্র। অচলায়তনের সাধনাকে সে-ই সবচেয়ে নিঃসংশয়ে, সর্বতোভাবে গ্রহণ করিয়াছিল; তার ফলে সাধারণ জীবনের মানদণ্ডের বিচারে সে হাস্যকর হইয়া উঠিয়াছে বটে কিন্তু যখন বিপদ আসিল, একমাত্র সে-ই বিপদের সম্মুখে সাহসের সঙ্গে দাঁড়াইতে পারিল। উপাধ্যায় সাধনার কথা যতই মুখে বলুক, মনের মধ্যে তাহার ফাঁকি ছিল—সে সরিয়া পড়িয়াছে; উপাচার্য দুর্বল প্রকৃতির লোক, গুরু তাহার সঙ্গে একটি কথাও বলেন

নাই। তিনি এই হাস্যকর কঠিন জীবটিকে আঘাত করিয়াই সম্মান দেখাইয়াছেন।

মহাপঞ্চক

পাথরের প্রাচীর তোমরা ভাঙতে পারো, লোহার দরজা তোমরা খুলতে পারো, কিন্তু আমি আমার ইন্দ্রিয়ের দ্বার রোধ করে এই বসলুম—যদি প্রয়োপবেশনে মরি তবু তোমাদের হাওয়া, তোমাদের আলো লেশমাত্র আমাকে স্পর্শ করতে পারবে না।

প্রথম শোণপাংশু

এ পাগলাটা কোথাকার রে। এই তলোয়ারের ডগাটা দিয়ে ওর মাথার খুলিটা একটু ফাঁক করে দিলে ওর বুদ্ধিতে একটু হাওয়া লাগতে পারে।

মহাপঞ্চক

কিসের ভয় দেখাও আমায়। তোমরা মেরে ফেলতে পারো, তার বেশি ক্ষমতা তোমাদের নেই।

প্রথম শোণপাংশু

ঠাকুর, এই লোকটাকে বন্দী করে নিয়ে যাই, আমাদের দেশের লোকের ভারি মজা লাগবে।

দাদাঠাকুর

ওকে বন্দী করবে তোমরা? এমন কি বন্ধন তোমার হাতে আছে?

দ্বিতীয় শোণপাংশু

ওকে কি কোন শাস্তিই দেব না?

দাদাঠাকুর

শাস্তি দেবে! ওকে স্পর্শ করতেও পারবে না। ও আজ যেখানে বসেছে সেখানে তোমাদের তলোয়ার পৌছয় না।

মহাপঞ্চক ভ্রান্ত হইতে পারে, কিন্তু অবিচলিত নিষ্ঠার দ্বারা যে শক্তি অর্জন

করিয়াছে, তাহাকে সম্মান না করিয়া উপায় কি? জীবন-পথের সে যে দুর্লভ পাথেয়। যেই জন্যই তাহার মত নিষ্ঠাবান্ শক্তিমান্ লোককে গুরু নূতন আয়তন হইতে বাদ দেন নাই। মহাপঞ্চককেও অচলায়তনে প্রয়োজন আছে কি না এই প্রশ্নের উত্তরে গুরু বলিতেছেন,

তার ওখানে অনেক কাজ। এতদিন ঘর বন্ধ করে অন্ধকারে ও মনে করছিল চাকাটা খুব চলছে, কিন্তু চাকাটা কেবল এক জায়গায় দাঁড়িয়েই ঘুরছিল তা সে দেখতেও পায়নি। এখন আলোতে তার দৃষ্টি খুলে গেছে, সে আর সে মানুষ নাই। কী করে আপনাকে আপনি ছাড়িয়ে উঠতে হয়, সেইটে শেখাবার ভার ওর উপর। ক্ষুধা, তৃষ্ণা, লোভ, ভয়, জীবন-মৃত্যুর আবরণ বিদীর্ণ করে আপনাকে প্রকাশ করবার রহস্য ওর হাতে আছে।

অনেকের ধারণা, রবীন্দ্রনাথ এ নাটকে আচার ও মন্ত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছেন—বস্তুতঃ তাহা নয়, বৃথা আচার ও মননহীন মন্ত্রের বিরুদ্ধেই তাঁহার অভিযান। আচার ও মন্ত্র যতক্ষণ উপলক্ষ, জীবনকে অগ্রসর করিয়া দিবার সহায়, ততক্ষণই তাহার প্রয়োজন, কিন্তু যখন সেগুলিই লক্ষ্য হইয়া উঠিয়া জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে, তখন এমন জঞ্জাল আব নাই, সেই জঞ্জাল সাফ করিতেই গুরুর আবির্ভাব।

যে বোধে আমাদের আত্মা আপনাকে জানে, সে-বোধের অভ্যুদয হয বিরোধ অতিক্রম করে, আমাদের অভ্যাসের এবং আরামের প্রাচীর ভেঙে ফেলে। যে-বোধে আমাদের মুক্তি, দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি, দুঃখের দুর্গম পথ দিয়ে সে তার জয়ভেরী বাজিয়ে আসে—আতঙ্কে সে দিক্‌দিগন্ত কাঁপিয়ে তোলে, তাকে শত্রু বলেই মনে করি—তার সঙ্গে লড়াই করে তবে তাকে স্বীকার করতে হয়, কেননা নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ। অচলাযতনে এই কথাটাই আছে।

মহাপঞ্চক

তুমি কি আমাদের গুরু?

দাদাঠাকুর

হাঁ। তুমি আমাকে চিনবে না, কিন্তু আমিই তোমাদের গুরু।

মহাপঞ্চক

তুমি গুরু? তুমি আমাদের সমস্ত নিয়ম লঙ্ঘন করে এ কোন্ পথ দিয়ে এলে। তোমাকে কে মানবে?

দাদাঠাকুর

আমাকে মানবে না জানি, কিন্তু আমিই তোমাদের গুরু।

মহাপঞ্চক

তুমি গুরু? তবে এই শত্রুবেশে কেন?

দাদাঠাকুর

এই তো আমার গুরুর বেশ। তুমি যে আমার সঙ্গে লড়াই করবে—সেই লড়াই আমার গুরুর অভ্যর্থনা।

• • •

মহাপঞ্চক

না, আমি তোমাকে প্রণাম করবো না।

দাদাঠাকুর

আমি তোমার প্রণাম গ্রহণ করবো না—আমি তোমাকে প্রণত করবো।

মহাপঞ্চক

তুমি আমাদের পূজা নিতে আসনি?

দাদাঠাকুর

আমি তোমাদের পূজা নিতে আসিনি, অপমান নিতে এসেছি।

আমি তো মনে করি আজ য়ুরোপে যে যুদ্ধ (প্রথম মহাযুদ্ধ) বেধেছে সে ঐ গুরু এসেছেন বলে। তাঁকে অনেক দিনের টাকার প্রাচীর, মানের

প্রাচীর, অহঙ্কারের প্রাচীর ভাঙতে হচ্ছে। তিনি আসবেন বলে কেউ প্রস্তুত ছিল না।১

এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, রবীন্দ্রনাথের রচনায় যেখানেই প্রকৃত গুরুর আগমন বর্ণিত, সেখানেই এই একই পন্থা অবলম্বিত হইয়াছে। গুরু জড়তাকে আঘাত করিয়া, বাধাকে ভাঙিয়া ফেলিয়া, সযত্নসঞ্চিত জঞ্জালকে অপসারিত করিয়া শিষ্যদের গৃহে প্রবেশ করিয়াছেন, কোন ক্ষুদ্র দয়া, নিরর্থক মমত্ব প্রকাশ করিয়া তাহাদের অপমান করেন নাই। (গুরু বলিতে রবীন্দ্রনাথ ভগবৎ প্রেরিত দূত বুঝিয়া থাকেন।) রাজা নাটকের ঠাকুরদাদাও শেষ মূহূর্তে যোদ্ধবেশে আসিয়াছে। অচলায়তনের গুরু যেমন ভ্রান্তবুদ্ধি অথচ বীর চরিত্র মহাপঞ্চককে আঘাত করিয়া তাহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন, অন্যান্য দ্বিধাগ্রস্ত দুর্বলগণের প্রতি ফিরিয়াও তাকান নাই, রাজা নাটকের যোদ্ধৃবেশী ঠাকুরদাদা সমবেত রাজন্যগণের মধ্যে একমাত্র বীরচরিত্র কাঞ্চী রাজকেই দ্বন্দ্বে আহ্বান করিয়াছেন, অপর সকলকে তিনি দৃষ্টিপাতের যোগ্য মনে করেন নাই।

৩

এ পর্যন্ত গেল ভাঙিবার কথা—বৃথা আচার ও শুষ্কমন্ত্র বর্জনের কথা। কিন্তু গড়িবার কথাও নাটকে আছে। সে দিকটাতে হয়তো তত জোর দেওয়া হয় নাই—ফলে পাঠকের মনোযোগ ভাঙিবার দিকেই বেশি আকৃষ্ট হয়।

অচলায়তনে গুরু কি ভাঙিবার কথাতেই শেষ করিয়াছেন? গড়িবার কথা বলেন নাই? পঞ্চক যখন তাড়াতাড়ি বন্ধন ছাড়াইয়া উধাও হইয়া যাইতে চাহিয়াছিল, তখন তিনি কি বলেন নাই—না তা যাইতে পারিবে

১ আত্মপরিচয়, পৃঃ ৬৭—৬৯

না—যেখানে ভাঙা হইল এইখানেই প্রশস্ত করিয়া গড়িতে হইবে? গুরুর আঘাত, নষ্ট করিবার জন্য নহে, বড়ো করিবার জন্যই। তাঁহার উদ্দেশ্য ত্যাগ করা নহে, সার্থক করা। ...

অচলায়তনে মন্ত্রমাত্রের প্রতি তীব্র শ্লেষ প্রকাশ করা হইয়াছে একথা কখনই সত্য হইতে পারে না—যেহেতু মন্ত্রের সার্থকতা সম্বন্ধে আমার মনে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু মন্ত্রের যথার্থ উদ্দেশ্য মননের সাহায্য করা। ধ্যানের বিষয়ের প্রতি মনকে অভিনিবিষ্ট করিবার উপায় মন্ত্র। আমাদের দেশে উপাসনার এই যে আশ্চর্য পন্থা সৃষ্ট হইয়াছে ইহা ভারতবর্ষের বিশেষ মাহাত্ম্যের পরিচয়।১

নাটকের শেষাংশে স্পষ্টতঃই গড়িবার উল্লেখ আছে। দাদাঠাকুর শোণপাংশুদের বলিতেছে,

আমাদের পঞ্চক দাদার সঙ্গে মিলে ভাঙা ভিতের উপর আবার গাঁথতে লেগে যেতে হবে।

১ গ্রন্থপরিচয়, পৃষ্ঠা ৫০৬—৫০৭, র—র, ১১শ খণ্ড। অচলায়তন নাটক প্রকাশিত হইবামাত্র তাহার বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা সাময়িক পত্রাদিতে প্রকাশিত হইতে থাকে। অচলায়তনের লেখকের বিরুদ্ধে সমালোচকগণের মুখ্য অভিযোগ দুইটী—প্রথম ইহ৩ে কেবল ভাঙিবার কথাই বলা হইয়াছে, দ্বিতীয়, হিন্দুধর্ম্মের মন্ত্র ও আচারগুলিকে নির্মম আঘাত করা হইয়াছে। সমালোচকগণের মধ্যে অক্ষয়কুমার সরকার এবং ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখযোগ্য। রবীন্দ্রনাথকেও এইসব বাদানুবাদে যোগ দিতে হইয়াছিল। তিনি দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, অচলায়তন নাটকে গুরু যেমন ভাঙিবার উদ্দেশ্যে আঘাত করিয়াছেন, তেমনি গড়িবার উদ্দেশ্যে আদেশদানও করিয়াছেন। আর মন্ত্রের আবশ্যক কবি অস্বীকার করেন নাই, কেবল মন্ত্র যখন মননশক্তির বাহন না হইয়া 'স্বাধিকারঃ প্রমত্তঃ' হইয়া ওঠে, তখনই তাহা নিরর্থক হইয়া দাঁড়ায়, তখনই তাহা পরিত্যাগের যোগ্য, ইহাই বলিতে চাহিয়াছেন। কবির উত্তরে সমালোচকগণ সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন কিনা সন্দেহ :

সকলে

বেশ, বেশ রাজি আছি

দাদাঠাকুর

ঐ ভিতের উপর কালযুদ্ধের রাত্রে স্থবিরকের রক্তের সঙ্গে শোণপাংশুর রক্ত মিলে গিয়েছে।

সকলে

হাঁ মিলেছে।

দাদাঠাকুর

সেই মিলনেই শেষ করলে চলবে না। এবার আর লাল নয়, এবার একে-বারে শুভ্র। নূতন সৌধের সাদা ভিতকে আকাশের আলোয় অভ্রভেদী করে দাঁড় করাও। মেলো তোমরা দুই দলে, লাগো তোমাদের কাজে।

অচলায়তনের প্রাচীর আচার ও মন্ত্রের প্রতীক। পুরাতন প্রাচীর ভাঙিয়াছে যেমন সত্য, নূতন প্রাচীর গড়িবার আদেশও তেমনি সত্য। তাহা যদি হয় তবে মানুষের পক্ষে আচার ও মন্ত্রের প্রয়োজন নাই এমন দোষারোপ কবির উপরে করা চলে না।

৪

এবারে নাটকখানির প্রধান কয়েকটি চরিত্র সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইতে পারে। পঞ্চক কে? এ ক্ষেত্রে মনে রাখিতে হইবে পঞ্চক ও মহাপঞ্চকের মধ্যে ভ্রাতৃসম্বন্ধ। মহাপঞ্চক সাধনার নিষ্ঠা ও কঠোরতার দিক, পঞ্চক সাধনার সরসতা ও প্রাণ। এতদিন দুইজনের মধ্যে রক্তের সম্বন্ধ সত্ত্বেও বিরোধ ছিল, কঠোরতা সরসতাকে সহ্য করিতে পারিত না। অথচ দুইজনে মিলিত না হইলে সাধনার পূর্ণতার আশা নাই। তাই গুরু আসিয়া পঞ্চককে মুক্তি না দিয়া নূতন আয়তনের আচার্য করিয়া বসাইয়া দিয়াছেন, আবার

মহাপঞ্চককেও ছাড়েন নাই। গুরুর মতে ইহাদের সম্মিলনের ফলে আয়তন আর অচলায়তন হইয়া উঠিতে পারিবে না, আবার পঞ্চককে উচ্চতর পদ দেওয়াতে এই ইঙ্গিত করা হইয়াছে যে, কঠোরতা ও সরসতার মধ্যে সরসতাকেই তিনি বড়ো মনে করেন, কাজেই সরসতা চালক হইয়া বসিল। কঠোরতাকে উচ্চতর স্থান দিলে সাধন আবার বাঁধন হইয়া পড়িতে পারে এমন আশঙ্কা আছে। (মহাপঞ্চক ও পঞ্চক মিলিয়াই আদর্শ আচার্য।)

আচায ব্যক্তিগত ভাবে মুক্তপুরুষ, কিন্তু আয়তনের সংস্কার ও দায়িত্বের দ্বারা তিনি পীড়িত। আয়তনের ভার তাঁহাকে এমনি ভারগ্রস্ত করিয়া রাখিয়াছে যে, ব্যক্তিগত মুক্তিও তাঁহাকে মুক্তির আনন্দ দিতে পারিতেছিল না। তাঁহার বেদনা এইখানেই। গুরু তাঁহাকে আর নূতন কাজ দিলেন না, তাঁহার কর্মের বন্ধন ক্ষয় হইয়া গিয়াছে, তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গেলেন। আনন্দমঠের মহাপুরুষ কর্তৃক মঠাধিপতি সত্যানন্দকে কর্মশৃঙ্খল হইতে মুক্তি দিয়া সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইবার সঙ্গে এই ঘটনা তুলনীয় বলিয়া মনে হয়।

এই নাটকের গুরু কে? জ্ঞান-কর্ম-ভক্তির ত্রিমার্গের সন্ধিস্থলে যাঁহার মন্দির তিনিই গুরু। ভগবান কি? রবীন্দ্রনাথ কোন নাটকে ভগবানকে কিম্বা ভগবানের অবতার বলিয়া কীর্তিত কোন মহাপুরুষকে রঙ্গমঞ্চে আনেন নাই। রাজা নাটকের রাজা প্রচ্ছন্ন থাকিয়া গিয়াছেন। চণ্ডালিকা নাটকে বুদ্ধদেবকে রঙ্গমঞ্চে আনিবার প্রচুর সুযোগ থাকাতেও তাঁহাকে আনা হয় নাই। দাদাঠাকুরের যোদ্ধৃবেশে প্রবেশের সঙ্গে রাজা নাটকের ঠাকুরদাদার যোদ্ধ-বেশ তুলনীয়। সেখানে ঠাকুরদাদা নিজেকে রাজার (ভগবানের) দূত বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। অচলাযতনের যোদ্ধবেশধারী দাদাঠাকুরকে ভগবৎপ্রেরিত দূত বলিয়াই মনে করিতে হইবে।

শোণপাংশু কাহারা? কোন্ জাতি তাহারা? 'যুণক কথাটি যবন, যোন প্রভৃতি কথারই সমর্থক। অর্থাৎ আমাদের রক্তহীন সংস্কৃতির বাহিরের সচল সক্রিয় কোন জাতি। শোণপাংশুও তাই। শোণ হইল লাল, অর্থাৎ যাহারা বিধিনিষেধকণ্টকিত রক্তহীন, সাদা নয়। 'রা রাজসিক উদ্যমী, যারা আপন

রাজসিক উদ্যমে আপনি স্বাধীনভাবে চলিতে পারে, তাকে শোণপাংশু বলা যাইতে পারে। যূণক হইল যাহাদের জাতিগত বা দেশগত নাম, শোণপাংশু হইল তাহাদের গুণগত ও ক্রিয়াগত নাম। উভয় শব্দেই আমাদের নিরুদ্যম শুদ্ধ শুভ্র সংস্কৃতির বাহিরের উদ্যমী রাজসিক সংস্কৃতির লোকের কথা, যাহারা আমাদের মতো বিধিনিষেধবদ্ধ নহে'।১

৫

এখন, কোন শিল্পসৃষ্টিকে তাহার সার্বভৌম ভিত্তি হইতে টানিয়া সঙ্কীর্ণতর ক্ষেত্রে দাঁড় করাইলে তাহার মর্যাদাহানি হয়—এ কথা সত্য। কিন্তু শোণপাংশু ও অচলায়তনের মধ্যে দ্বন্দ্ব এমন সুস্পষ্টভাবে ভারতীয় ইতিহাসের পক্ষে প্রযোজ্য যে সমালোচকের পক্ষে এই লোভ সম্বরণ করা সহজ নহে। বিশেষ স্বয়ং কবিও এই নাটকখানিকে ভারতীয় সমাজের সঙ্গে বহিরাগত সভ্যতার সংঘর্ষ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন।২ কাজেই সমালোচকও এই স্বাধীনতা লইতে পারে।

শোণপাংশু 'বহিরাগত কোন উদ্যমী রাজসিক কর্মমার্গী জাতি' যাহাদের সংঘর্ষে ভারতবর্ষের অচলায়তনিক জড়শান্তি চিরকালের জন্য দূরীভূত হইয়া গিয়াছে। নাটকে একথা স্পষ্টভাবেই আছে। দাদাঠাকুর বলিতেছেন—

অচলায়তনে আর সেই শান্তি দেখতে পাবে না। তার দ্বার ফুটো করে দিয়ে আমি তার মধ্যে লড়ায়ের ঝোড়ো হাওয়া এনে দিয়েছি। নিজের নাসাগ্রভাগের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে বসে থাকবার দিন এখন চিরকালের মতো ঘুচিয়ে দিয়েছি।

১ পণ্ডিত শ্রীক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রীর ব্যাখ্যা।

২ গ্রন্থপরিচয়, পৃষ্ঠা ৫০৪—৫১১, র-র ১১শ খণ্ড।

ভারতবর্ষ বিরামশীল জাতি। ইহার ভৌগোলিক পরিবেশ এই ভাবের অনুকূল। সমুদ্রপরিখা ও পর্ব্বত-প্রাকারের দ্বারা বেষ্টিত এই দেশ পৃথিবী হইতে যেন বিচ্ছিন্ন। কিন্তু ভারতবর্ষের বিধাতা ইহার উত্তর-পশ্চিম কোণে একটা রন্ধ্র রাখিয়া দিয়াছেন—যুগের পর যুগ এই রন্ধ্রপথে রাজসিক উদ্যমী জাতিরা ঝোড়ো হাওয়ার মত এই দেশে ঢুকিয়া পড়িয়া বারংবার ইহার অচলায়তনিক শান্তি নষ্ট করিয়া দিয়াছে। ভারতবর্ষও বারংবার এই সব জাতিকে আত্মসাৎ করিয়া লইয়া পুরাতন প্রাচীর ভাঙিয়া ফেলিয়া বৃহত্তর পরিধির নূতনতর প্রাচীর গাঁথিয়াছে।

•

বিধাতা ভারতবর্ষের মধ্যে বিচিত্র জাতিকে টানিয়া আনিয়াছেন।··· ঐক্যমূলক যে-সভ্যতা মানবজাতির চরম সভ্যতা, ভারতবর্ষ চিরদিন ধরিয়া বিচিত্র উপকরণে তাহার ভিত্তি প্রতিষ্ঠান করিয়া আসিয়াছে। পর বলিয়া সে কাহাকেও দূর করে নাই, অনার্য বলিয়া কাহাকেও বহিষ্কৃত করে নাই, অসঙ্গত বলিয়া সে কিছুকেই উপহাস করে নাই। ভারতবর্ষ সমস্তই গ্রহণ করিয়াছে, সমস্তই স্বীকার করিয়াছে।··· ভারতবর্ষ পুলিন্দ, শবর, ব্যাধ প্রভৃতিদের নিকট হইতেও বীভৎস সামগ্রী গ্রহণ করিয়া তাহার মধ্যে নিজের ভাব বিস্তার করিয়াছে—তাহার মধ্য দিয়াও নিজের আধ্যাত্মিকতাকে বিস্তার করিয়াছে।··· এই ঐক্য বিস্তার ও শৃঙ্খলা স্থাপন কেবল সমাজ ব্যবস্থায় নহে, ধর্মনীতিতেও দেখি। গীতায় জ্ঞান প্রেম ও কর্মের মধ্যে যে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য স্থাপনের চেষ্টা দেখি তাহা বিশেষরূপে ভারতবর্ষের।[১]

ভারতবর্ষ অচলায়তন হইয়া উঠিলেও নূতনকে আত্মসাৎ করিবার মতো ক্ষমতা তাহার আছে এবং যখন নূতনকে গ্রহণ করে তখন নূতন করিয়া প্রাচীর গাঁথিবার ক্ষমতাও সে হারায় নাই। নাটকের শেষের দিকে দাদাঠাকুর এই শক্তির উল্লেখ করিয়াছেন।

১ নূতন ও পুরাতন, স্বদেশ, পৃঃ ৪৬৯, র-র ১১শ খণ্ড।

আচার্য

অনেক বৎসর অনেক যুগ যে এমনি করেই কেটে গেল—প্রাচীন, প্রাচীন, সমস্ত প্রাচীন হয়ে গেছে—আজ হঠাৎ বোলো না যে নূতনকে চাই—আমাদের আর সময় নেই।

অচলায়তন অতি প্রাচীন—ভারতবর্ষও যে প্রাচীন।

আমরা পুরাতন ভারতবর্ষীয়; বড়ো প্রাচীন, বড়ো শ্রান্ত। আমি অনেক সময় নিজের মধ্যে আমাদের সেই জাতিগত প্রকাণ্ড প্রাচীনত্ব অনুভব করি। মনোযোগপূর্বক যখন অন্তরের মধ্যে নিরীক্ষণ করে দেখি তখন দেখতে পাই, সেখানে কেবল চিন্তা এবং বিশ্রাম এবং বৈরাগ্য। যেন অন্তরে বাহিরে একটা সুদীর্ঘ ছুটি।[১]

কিন্তু এমন করিয়া তো চলে না, পশ্চিমোত্তরের রন্ধ্রপথে ঝোড়ো হাওয়া নূতন জাতিরূপে আমাদের বিশ্রাম, বৈরাগ্য এবং আত্মচিন্তার ঘাড়ে আসিয়া পড়ে।

এমন সময়ে দেখা গেল অবস্থার পরিবর্তন হ'য়েছে।··· হায় ভারতবর্ষের পুরপ্রাচীর ভেঙে ফেলে এই অনাবৃত বিশাল কর্মক্ষেত্রের মধ্যে আমাদের কে এনে দাঁড় করালে।··· ভারতবর্ষ তখন একটি রুদ্ধ দ্বার নির্জন রহস্যময় পরীক্ষাকক্ষের মতো ছিল।··· কিন্তু হঠাৎ দ্বার ভগ্ন করে বাহিরের দুর্দান্ত লোক ভারতবর্ষের সেই পবিত্র পরীক্ষাশালার মধ্যে প্রবেশ করলে···পৃথিবীর লোক সেই পরীক্ষাগারের মধ্যে প্রবেশ ক'রে কী দেখলে। একটি জীর্ণ তপস্বী, বসন নেই, ভূষণ নেই। সে যে কথা বলতে চায়, এখনো তার কোনো

১ ভারতবর্ষের ইতিহাস, স্বদেশ, পৃঃ ৫৪—৫৬

প্রতীতিগম্য ভাষা নেই, প্রত্যক্ষগম্য প্রমাণ নেই, আয়ত্তিগম্য পরিমাণ নেই। অতএব হে বৃদ্ধ, হে চিরাতুর, হে উদাসীন তুমি ওঠো··· ।১

ইহা কি অচলায়তনেরই ইতিহাস নহে, ভারতবর্ষের 'পুরপ্রাচীর' কি অচলায়তনের প্রাচীর নহে, সেই জীর্ণ তপস্বী কি মহাস্থবির নহে? প্রাচীন অচলায়তন, শোণপাংশু নবাগত জাতি—যাহাদের সংঘর্ষে বারংবার পুরাতন প্রাচীর ভাঙিয়া পড়িয়াছে। আর গঠনশীল ভারতবর্ষ বারংবার নূতন করিয়া বৃহত্তর করিয়া জীবনগণ্ডী রচনা করিয়া তুলিয়াছে, কারণ ইতিহাসের বিচিত্র উপকরণকে একীভূত, অঙ্গীভূত করিয়া জীবনগণ্ডী রচনা করিয়া সভ্যতা গঠনের শক্তি ভারবর্ষের পক্ষে স্বাভাবিক।

৬

শিল্পসৃষ্টি হিসাবে অচলায়তনকে ত্রুটিহীন বলা চলে না। ইহার অধিকাংশ চরিত্রই রক্তাল্পতা ব্যাধিগ্রস্ত, ছায়াপ্রায়, আইডিয়ার মুখোস মাত্র। কেবল মহাপঞ্চকের চরিত্রে কিছু পরিমাণে মানবসুলভ সজীবতা আছে। শুধু তাই নয়, তাহার চরিত্রে ট্র্যাজেডির উপাদানও আছে। এই মানবসুলভ গুণের ফলেই বিচিত্র লোকটা পাঠকের অন্তরে প্রবেশলাভে সমর্থ; অন্য সব চরিত্র পাঠকের মস্তিষ্কে মাত্র প্রবেশ করে, অন্তরে নয়—মানুষের অন্তরে কেবল মানুষেরই প্রবেশাধিকার আছে।

ইহার চেয়েও বড় ত্রুটি, অচলায়তন নাটকের সমাজ-ব্যবস্থায় নারীর স্থান নাই। কোন নাটকে নারী থাকিবে বা থাকিবে না তাহার জন্য নাট্যকারের উপর জুলুম চলে না, কিন্তু এখানে সে রকম দাবীর সঙ্গত কারণ আছে। জ্ঞান-কর্ম-ভক্তির মিলনে যে নূতন সমাজের ছক কবি রচনা করিলেন, সেখানে নারীর স্থান কোথায়, স্বভাবতই সে প্রশ্ন মনে আসে। অচলায়তন অবশ্য

১ নূতন ও পুরাতন, স্বদেশ, পৃঃ ৪৬৯—৪৭১; ।

ব্রহ্মচারীদের আয়তন—এখানে নারী না থাকিতে পারে ; শোণপাংশুরাও আততায়ী, নারীকে সঙ্গে না আনিতে পারে—কবির পক্ষ হইতে এই উত্তর দেওয়া যাইতে পারে, কিন্তু তৎসত্ত্বেও ইহা চরম উত্তর নয়। ইহা গল্পমাত্র নয় ; ইহা সমাজ-ব্যবস্থার নূতন একটা ছক্ বা Pattern। তাহা যদি হয়, তবে এই ছকের মধ্যে নরনারী সকলেরই যথাযোগ্য স্থান থাকা আবশ্যক। নারীর সে স্থান ইহাতে কোথায় ? নারীর সেই স্থানটি নির্দিষ্ট হয় নাই বলিয়া গুরুর আদেশে নূতন করিয়া গড়া আয়তনও যথেষ্ট উদার নয়, তাহার চেয়েও মানব প্রকৃতি অনেক ব্যাপক—কাজেই ইহাকেও আবার ভাঙ্গিয়া গড়িতে হইবে। সে আঘাত যদি গুরু না করেন, সে প্রশ্ন যদি কবি না করেন, তবে বাধ্য হইয়া সমালোচককেই সেই দুর্মুখ প্রশ্ন উত্থাপন করিতে হয়। সমালোচক কেবল প্রশ্নই করিতে পারে, সমাধানের ভার তাহার উপর নয়। কিন্তু এই প্রধান ত্রুটির ফলেই নূতন সমাজতত্ত্বরূপে এই নাটক সঙ্কীর্ণ এবং ইহা সর্বজন সর্বকাল গ্রাহ্য হইয়া উঠিতে পারে নাই।

৭

এতক্ষণ কেবল তত্ত্ববিচারের দৃষ্টিতে নাটকখানির আলোচনা করা হইয়াছে, কতক পরিমাণে মহাপঞ্চকের দৃষ্টি যেন সমালোচককে পাইয়া বসিয়াছিল। কিন্তু এখানে শেষ করিলে নাটকটির প্রতি সুবিচার হইবে না। ইহাতে যে প্রচুর কবিত্ব রস আছে, নাটকখানির তাহা একটি প্রধান সম্পদ। তাহার আলোচনার জন্য পঞ্চকের দৃষ্টির আবশ্যক। নববর্ষা সমাগমের সমারোহ এবং আশা, প্রথম বারিপাতের সিক্ত অভ্যর্থনা এবং উল্লাস, পঞ্চকের কণ্ঠের ভাষায় ও সঙ্গীতে প্রকাশ পাইয়াছে। বস্তুতঃ ইহাতে প্রকৃতিকে নাটকের মূল ভাবের প্রতীক করিয়াই কবি বর্ণনা করিয়াছেন। নাটকের ঘটনার প্রারম্ভ গ্রীষ্মকালে, পৃথিবী যখন রসের অভাবে শুষ্ক, ইহার অবসান প্রথম বর্ষা সমাগমে,

পৃথিবী যখন নবধারাপাতে স্নিগ্ধ। অচলায়তনের আচারসর্বস্ব জীবন যেন গ্রীষ্মের প্রতীক, তাহার মানবরূপ যেন মহাপঞ্চক, তাহার চরিত্রে গ্রীষ্মের তাপ ও তপস্যাজাত শক্তি দুই-ই বিদ্যমান। প্রথম বারিসম্পাতে কেবল পৃথিবী স্নিগ্ধ হয় নাই, গুরুর আগমনে অচলায়তনের জীবনেও মাধুর্য ফিরিয়া আসিয়াছে। কবচকিরীচ এবং কিরীটকুণ্ডলধারী যোদ্ধবেশী গুরু যেন বজ্র-বিদ্যুৎসমুজ্জ্বল বর্ষার উদার মেঘাভ্যুদয়। পঞ্চকের তৃষিত চিত্তচাতক এই মেঘাগমের অপেক্ষাতেই ছিল—তাহার কণ্ঠে অনাগত মেঘের বন্দনাকেই আচার্য যেন শুনিতে পাইত, শুনিয়া বুঝিত, মেঘ, মুক্তি ও গুরুর আবির্ভাব আসন্ন। প্রকৃতির প্রতীকী রূপটি বুঝিলে তবেই নাটকখানির উপলব্ধি সার্থক হইবে।

এই প্রসঙ্গে অচলায়তন নাটকের পরিবেশ সম্বন্ধে· কিছু বলা আবশ্যক। রবীন্দ্রনাথ হিন্দু সমাজের জীর্ণতা ও অর্থহীন আচারপরায়ণতাকে আঘাত করিতে উদ্যত হইয়াছেন। কিন্তু এই উপলক্ষে যে কাঠামোটি তিনি গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার ·সহিত হিন্দু সংস্কৃতি ও সমাজ-ব্যবস্থার কোন মিল নাই।

অচলায়তনের দুর্ভেদ্য প্রাচীরবেষ্টিত অট্টালিকা ওদন্তপুরী, নালন্দা ও ও বিক্রমশীলা প্রভৃতি বৌদ্ধ-বিহারকেই মনে আনিয়া দেয়। ব্রাহ্মণ-সংস্কৃতির কেন্দ্র ছিল তপোবন। সেখানে অচলায়তনের মতো কেবল পুরুষ বিদ্যার্থীর বাস ছিল না। তপোবনগুলি জনপদ হইতে দূরে অবস্থিত হইলেও জনপদের কাঠামোকে অনুসরণ করিত। তপোবনে গুরুর আশ্রম সংসারাশ্রমের ছাঁচে ঢালা; পিতা, মাতা, পুত্র, কন্যা—সকলেরই সেখানে স্থান ছিল; যেসব বিদ্যার্থী আসিত, তাহারা পুত্রবৎ পালিত ও শিক্ষিত হইত। অচলায়তনে এসব·কিছুই নাই। ওখানকার সমাজ-ব্যবস্থার ছাঁচটিই তপোবনের ছাঁচ হইতে স্বতন্ত্র। অচলায়তনের 'পিউরিটান' জীবনযাত্রার সহিত হিন্দু সমাজের যোগ আছে বলিয়া মনে হয় না। অচলায়তনের পরিবেশ যেমন বৌদ্ধ-বিহারের আদর্শে রচিত তেমনি ইহার অদ্ভুত ·রীতিনীতি, আচার ব্যবহার, মন্ত্র ও

মন্ত্রের নামের অধিকাংশই মহাযান মতবাদের সংগ্রহ-গ্রন্থ হইতে গৃহীত।[১] বস্তুত নাটকখানির পরিবেশ হিন্দু সমাজের পরিচিত নহে।

আমার ধারণা অচলায়তনের পরিবেশ অধিকতর পরিচিত ও বাস্তব-ঘেঁষা হইলে নাটকখানি শিল্প-সৃষ্টি হিসাবে উচ্চতর স্তরের হইত—আর যে উদ্দেশ্যে ইহা লিখিত তাহাতেও অধিকতর সাফল্যলাভ করিত। ভূতের ঢিল গায়ে লাগে না। কোন কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও পাঠকসাধারণ নাটকখানির দ্বারা আহত হইবার লক্ষণ প্রকাশ করে নাই। ইহার জন্য নাটকের অদ্ভুত ও অবাস্তব পরিবেশ অনেক পরিমাণে দায়ী!

১ রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্পাদিত 'দি স্যানস্ক্রিট বুদ্ধিষ্ট লিটারেচার অব্ নেপাল' গ্রন্থে প্রচুর ধারণী মন্ত্রের উল্লেখ আছে। অচলায়তনে ব্যবহৃত মহাময়ূরী, মারীচি, পর্ণশবরী, শৃঙ্গভেরী, ধ্বজাগ্রকেয়ূরী প্রভৃতি ধারণী কবি উক্ত গ্রন্থ হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন। উহার সহিত কবি আগে হইতেই পরিচিত ছিলেন। মালিনী, পরিশোধ প্রভৃতি অনেক কাব্য ও কবিতার মূল কাহিনী গ্রন্থখানি হইতে সংগৃহীত।

রাজা

রাজা নাটকে অদৃশ্য 'রাজা'কে বাদ দিলে প্রধান চরিত্র চারটি। সুরঙ্গমা, ঠাকুরদা, সুদর্শনা ও কাঞ্চীরাজ। চারজনেই বিভিন্ন পন্থায় রাজার সাক্ষাৎ পাইতে চেষ্টা করিয়াছে। সুরঙ্গমার ও ঠাকুরদার 'রাজা'র উপলব্ধি ঘটিয়াছে, সুদর্শনার ও কাঞ্চীরাজের উপলব্ধির বিচিত্র ইতিহাসই রাজা নাটক। ইহাদের চারজনের উপলব্ধির পন্থা ভিন্ন, অন্যত্র বলিয়াছি। কী সেই পন্থা?

সুরঙ্গমা দাসীভাবে রাজাকে ভজনা করিয়াছে।

ঠাকুরদা তাহাকে ভজনা করিয়াছে বন্ধুভাবে।

সুদর্শনার সাধনপন্থা মধুরভাবে, সে রাজার মহিষী।

আর কাঞ্চীরাজ রাজাকে ভজনা করিয়াছে শত্রুভাবে—সে রাজার শত্রু, সে রাজবিদ্রোহী।

নাটকখানির প্রারম্ভেই দেখিতে পাই যে, সুরঙ্গমা ও ঠাকুরদা সাধনার শেষে উপনীত, তাহারা সিদ্ধকাম। তার কারণ দাসীরূপে ও সখারূপে সাধনার দায়িত্ব গুরুতর নয়, তাই তাহার সিদ্ধিও অপেক্ষাকৃত সহজলভ্য। মধুরভাবের সাধনাই কঠিনতম, তাই তাহার সিদ্ধিতে জীবনের চরমতম সার্থকতা। আবার যে শত্রুরূপে ভজনা করিবার উদ্দেশ্যে নিজের সমস্ত শক্তিকে উদ্যত করিয়া তোলে, অবশেষে অপ্রত্যাশিতভাবে সে ব্যক্তিও সিদ্ধিলাভ করিতে সক্ষম হয়। কেবল যে হতভাগ্য ব্যক্তি দুর্বলতাবশত সাধনপন্থা হইতে দূরে রহিয়া যায়, তাহার গতি হয় না। 'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।'

রানী সুদর্শনার সহচরী সুরঙ্গমা রাজার দাসী। সে রানীর নিকটে আপন সাধনার ইতিহাস বিবৃত করিয়াছে, সিদ্ধিলাভ করিতে অল্প দুঃখ সহ্য করিতে

তাহাকে হয় নাই। সিদ্ধিলাভ সে করিয়াছে বটে—তবু সে দাসীমাত্র, কারণ দাস্যভাবের সহজতর পন্থাকেই সে অবলম্বন করিয়াছিল।

সুদর্শনা। এত ভক্তি তোর? অথচ শুনেছি তোর বাপকে রাজা শাস্তি দিয়েছেন। সে কি সত্যি?

সুরঙ্গমা। সত্যি। বাবা জুয়ো খেলত। রাজ্যের যত যুবক আমাদের ঘরে জুটত—মদ খেত আর জুয়ো খেলত।...

সুদর্শনা। রাজা যখন তোর বাপকে নির্বাসিত ক'রে দিলেন তখন তোর রাগ হয়নি?

সুরঙ্গমা। খুব রাগ হয়েছিল, ইচ্ছে হ'য়েছিল কেউ যদি রাজাকে মেরে ফেলে তো বেশ হয়।

সুদর্শনা। রাজা তোকে বাপের কাছ থেকে ছাড়িয়ে এনে কোথায় রাখলেন?

সুরঙ্গমা। কোথায় রাখলেন কে জানে। কিন্তু কী কষ্ট গেছে। আমাকে যেন ছুঁচ ফোটাত, আগুনে পোড়াত।

সুদর্শনা। কেন, তোর এত কষ্ট কিসের ছিল?

সুরঙ্গমা। আমি যে নষ্ট হবার পথে গিয়েছিলুম—সে-পথ বন্ধ হতেই মনে হল আমার যেন কোনো আশ্রয়ই রইল না। আমি খাঁচায়-পোরা বুনো জন্তুর মতো কেবল গর্জে বেড়াতুম এবং সবাইকে আঁচড়ে কামড়ে ফেলতে ইচ্ছে করত।

সুদর্শনা। রাজাকে তখন তোর কী মনে হত।

সুরঙ্গমা। উঃ কী নিষ্ঠুর। কী নিষ্ঠুর। কী অবিচলিত নিষ্ঠুরতা।...

সুদর্শনা। তোর মন বদল হল কখন?

সুরঙ্গমা। কী জানি কখন হয়ে গেল। সমস্ত দুরন্তপনা হার মেনে একদিন লুটিয়ে পড়ল। তখন দেখি যত ভয়ানক, ততই সুন্দর। বেঁচে গেলুম, বেঁচে গেলুম, জন্মের মতো বেঁচে গেলুম।

ইহাই সুরঙ্গমার সাধনার ও সিদ্ধিলাভের ইতিহাস। কিন্তু সিদ্ধিলাভ সত্ত্বেও সে রাজার দাসী ছাড়া কিছুই নয়—নিম্নতর স্তরের সাধনার সহজসিদ্ধি!

সুদর্শনা। আমার যদি তোর মতো হয় তা হলে যে বেঁচে যাই।...

সুদর্শনা। দাসী হয়ে তোর এত সহজ হল কী করে? রানী হয়ে আমার হয় না কেন?

সুরঙ্গমা। আমি যে দাসী সেইজন্যেই এত সহজ হল।

দাসী হইবার সাধনা সে করিয়াছে, মহিষী হইবার বাসনা সে করে নাই। যে তাঁহাকে যেরূপে পাইবার আকাঙ্ক্ষা করে সেইরূপেই তাঁহাকে লাভ করিয়া থাকে।

এই ভাবটি ঠাকুরদার একটি উক্তিতে সুন্দর প্রকাশ পাইয়াছে। একজন নাগরিক বলিয়া বেড়াইতেছে যে দেশের রাজা কুৎসিত, তাই তিনি দেখা দেন না। ঠাকুরদা বলিতেছেন—"ওর রাজা কুৎসিত বই কি, নইলে তার রাজ্যে বিরূপাক্ষের মতো অমন চেহারা থাকে কেন?...ও আয়নাতে যেমন আপনার মুখটি দেখে আর রাজার চেহারা তেমনি ধ্যান করে।"

ঠাকুরদার ভাষায় "তাঁর আহ্বান যিনি যে-ভাবে গ্রহণ করতে ইচ্ছা করেন বাধা নেই, সকল প্রকার অভ্যর্থনাই প্রস্তুত।"

ঠাকুরদা রাজাকে সখারূপে ভজনা করিয়াছিল, তাই সিদ্ধিলাভ করিবার পরে কেবল রাজার সঙ্গে মাত্র নয়, রাজার সমস্ত প্রজার সঙ্গেই তাহার বন্ধুত্বের সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে। বয়সনির্বিশেষে সে সকলেরই বয়স্য।

সুদর্শনা। শুনেছি তুমি আমার রাজার বন্ধু। আমার প্রণাম গ্রহণ করো, আমাকে আশীর্বাদ করো।

ঠাকুরদা। কর কি, কর কি রানী। আমি কারো প্রণাম গ্রহণ করিনে। আমার সঙ্গে সকলের হাসির সম্বন্ধ।

এ অবস্থায় উপনীত হইতে তাহাকে অল্প দুঃখ পাইতে হয় নাই। ঠাকুরদা বলিয়াছে “চিনে নিয়েছি যে, সুখে দুঃখে তাকে চিনে নিয়েছি, এখন আর সে কাঁদাতে পারে না।” একে একে তাহার পাঁচটি ছেলে মারা গিয়াছে—তবু সে রাজাকে দোষী করে নাই, অল্পবুদ্ধি অন্য লোকের মতো বলে নাই যে দেশে ধর্ম নাই বা রাজা ‘ধর্মের রাজা’ নয়। সবাই যখন শুধায়, এত যে বন্ধুত্ব—তার কী পুরস্কার মিলিল? ঠাকুরদা উত্তর করে “বন্ধুকে কি কেউ কোনো দিন পুরস্কার দেয়?”

পুরস্কার হয়তো রাজা দেন না—কিন্তু সম্মান দেন, গৌরব দেন। গৌরব মানেই সেই বস্তু যাহা বহন করিতে শক্তির আবশ্যক হয়। সাধনার দ্বারা ঠাকুরদা সেই শক্তি অর্জন করিয়াছে। তাই প্রয়োজনের সময় রাজা তাহাকে সেনাপতি সাজাইয়া বিদ্রোহী নৃপতিদের শিবিরে প্রেরণ করেন।

ঠাকুরদাকে দেখিয়া নৃপতিদের একজন শুধায়—“তুমি কে?

ঠাকুরদা। আমি তাঁর সেনাপতিদের মধ্যে একজন।”

অন্যান্য দুর্বলচিত্ত নৃপতিগণ যখন রাজার আহ্বানে পরাভব স্বীকার করিয়া রাজসভায় উপস্থিত হইবে বলিয়া জানায়, কাঞ্চীরাজ স্পর্ধার সঙ্গে বলে— “আচ্ছা, আমিও যাচ্ছি রাজদূত, কিন্তু সভায় নয়—রণক্ষেত্রে।

ঠাকুরদা। রণক্ষেত্রেই আমার প্রভুর সঙ্গে আপনার পরিচয় হবে, সে-ও অতি উত্তম প্রশস্ত স্থান।”

‘যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্’ ঠাকুরদার উক্তি পুরাতনী বাণীরই নূতন ব্যাখ্যা মাত্র।

কাঞ্চীরাজ শত্রুভাবে রাজার ভজনা করিয়াছিল এবং শক্তিমান বলিয়াই শেষ পর্যন্ত সিদ্ধিলাভে সক্ষম হইয়াছিল। রবীন্দ্রসাহিত্যে দেখিতে পাওয়া যাইবে, শক্তির যেখানে বিশেষ প্রকাশ সেখানেই রবীন্দ্রবাণীর আশীর্বাদ বর্ষিত হইয়াছে। সে শক্তি কবির অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধাচারী হইলেও কবির প্রসাদ হইতে বঞ্চিত হয় নাই। অচলায়তন নাটকে মহাপঞ্চক এবং রক্তকরবীর রাজা দৃষ্টান্তস্থল। বিজ্ঞানে শক্তির বিশেষ প্রকাশ বলিয়াই বিজ্ঞানের আপাত অপকারিতার বহু

দৃষ্টান্ত সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ তাহাকে অবহেলার যোগ্য মনে করেন না। কাঞ্চীরাজ সম্বন্ধেও ইহা সর্বথা প্রযোজ্য।

কাঞ্চীরাজ ষড়যন্ত্রকারী এবং বিদ্রোহী, সুদর্শনাকে বলে কাড়িয়া লইতে সে প্রস্তুত; তারপরে সুদর্শনার রাজা যখন দ্বন্দ্বে তাহাকে আহ্বান করিলেন, তখন সে অপর সকলের মতো পিছাইয়া না পড়িয়া অগ্রসর হইয়া গেল। সে পরাজিত হইল বটে—কিন্তু তেমনি রাজার প্রসাদও লাভ করিল। তাহার শক্তি আত্ম-মুখিতার খাত পরিত্যাগ করিয়া ভগবৎমুখিতার পথে প্রবাহিত হইল, কাঞ্চী-রাজের শত্রুভাবের সাধনা সিদ্ধিলাভ করিল।

১৮ সংখ্যক দৃশ্যে দেখিতে পাই কাঞ্চীরাজ রাজার সন্ধানে পথে বহির্গত। ঠাকুরদা শুধাইতেছে—একি কাঞ্চীরাজ তুমি পথে যে!

কাঞ্চী। তোমার রাজা আমায় পথেই বের করেছে।

ঠাকুরদা। ওই তো তার স্বভাব।

কাঞ্চী। তার পরে আর নিজের দেখা নেই।

ঠাকুরদা। সেও তার এক কৌতুক।

কাঞ্চী। কিন্তু আমাকে এমন ক'রে আর কতদিন এড়াবে? যখন কিছুতেই তাকে রাজা বলে মানতেই চাই নি তখন কোথা থেকে কালবৈশাখীর মতো এসে এক মুহূর্তে আমার ধ্বজাপতাকা ভেঙে উড়িয়ে ছারখার করে দিল, আর আজ তার কাছে হার মানবার জন্যে পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছি তার আর দেখাই নেই।

ঠাকুরদা। তা হোক সে যত বড়ো রাজাই হোক হার-মানার কাছে তাকে হার মানতেই হবে।···

১৯ সংখ্যক দৃশ্যে দেখিতে পাই রাজ-সম্মানের পথে সুদর্শনার সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইয়াছে। কাঞ্চীরাজ সুদর্শনাকে মা বলিয়া সম্বোধন করিল। যাহাকে সে উপভোগের বস্তু বলিয়া কামনা করিয়াছিল, বুঝিতে পারি, 'রাজা'র প্রসাদে তাহার সহিত যথার্থ সম্বন্ধে সে স্থাপিত হইয়াছে।

সকলের চেয়ে রানীর সাধনা কঠিনতর, কারণ সে সাধনা মধুর রসের সাধনা। যে ব্যক্তি রাজাকে প্রণয়ীরূপে পাইতে ইচ্ছা করে তাহাকে সুকঠিন দুঃখের জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। রাধিকার চোখের জলে কালিন্দীধারা চির বন্যাময়ী, সে অশ্রুধারার না আছে অন্ত না আছে পার। কারণ কৃষ্ণকে তাহার প্রণয়ীরূপে পাইবার বাসনা। সুদর্শনা ও রাধিকা একই লক্ষ্যের যাত্রী। কিন্তু রাজা অমনি তাহাকে গ্রহণ করেন নাই, দুঃখের আগুনে দগ্ধ করিয়া তাহার অভিমান ও ভ্রান্তি, মলিনতা ও অহঙ্কার নিঃশেষ করিয়া দিয়া তবে তাহাকে গ্রহণ করিয়াছেন। রাজা তাহাকে প্রথম হইতেই প্রেয়সী বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, রানীরূপে ঘোষণা করিয়াছেন। কিন্তু সুদর্শনা তো রাজার স্বরূপ বুঝিতে পারে নাই, তাহাকে যথার্থভাবে পাইতে চেষ্টা করে নাই। সে বাহিরে তাকাইয়াছিল, অন্তরের মধ্যে সন্ধান করে নাই। রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন—

সুদর্শনা রাজাকে বাহিরে খুঁজিয়াছিল। যেখানে বস্তুকে চোখে দেখা যায়, হাতে ছোঁওয়া যায়, ভাণ্ডারে সঞ্চয় করা যায়, যেখানে ধন জন খ্যাতি সেইখানে সে বরমাল্য পাঠাইয়াছিল। বুদ্ধির অভিমানে সে নিশ্চয় স্থির করিয়াছিল যে, বুদ্ধির জোরে সে বাহিরেই জীবনের সার্থকতা লাভ করিবে। তাহার সঙ্গিনী সুরঙ্গমা তাহাকে নিষেধ করিয়াছিল। বলিয়াছিল, অন্তরের নিভৃত কক্ষে যেখানে প্রভু স্বয়ং আসিয়া আহ্বান করেন সেখানে তাঁহাকে চিনিয়া লইলে তবেই বাহিরে সর্বত্র তাঁহাকে চিনিয়া লইতে ভুল হইবে না, নহিলে যাহারা মায়ার দ্বারা চোখ ভোলায় তাহাদিগকে রাজা বলিয়া ভুল হইবে। সুদর্শনা এ-কথা মানিল না। সে সুবর্ণের রূপ দেখিয়া তাহার কাছে মনে মনে আত্মসমর্পণ করিল।[১]

রানী সুবর্ণকে নিজের রাজা বলিয়া ভুল করিল। এই ভুলের আসল কারণ

১ রাজা, গ্রন্থপরিচয়, রবীন্দ্র-রচনাবলী, দশম খণ্ড।

অন্ধকার গৃহের সাধনা তাহার শেষ হয় নাই, শেষ হইবার আগেই সে বহির্বিশ্বে রাজার সন্ধান করিয়াছিল। নাটকের প্রথম দৃশ্যে রানীকে অন্ধকার গৃহে দেখিতে পাই, এখানেই রাজার সহিত তাহার মিলন হইয়া থাকে। রানীর কাছে ঘরের অন্ধকার অসহ্য, সে রাজাকে বলে, "আমাকে বাহিরে লইয়া চলো, আলোয় তোমার সঙ্গে আমার মিলন হইবে।" রাজা বলেন, "কালে তাহা হইবে, আগে তোমার অন্ধকারের সাধনা সমাপ্ত হোক, নতুবা তুমি ভুল করিয়া বসিবে।" রানী শোনে না, বাহিরে তাকে সন্ধান করিবার অনুমতি রাজা দেন, রানী পরম ভুল করিয়া বসেন।

এখন প্রশ্ন এই যে, অন্ধকার গৃহ বলিতে কবি কী বুঝাইতে চাহিয়াছেন। আমার মনে হয়—অন্ধকার গৃহ বলিতে তিনি মানুষের সাধনার পর্বকে বুঝিয়াছেন। আর এ সাধনা যে মধুরভাবের তাহা আগেই বলা হইয়াছে। সব সাধনার জন্যই যদি নৈভৃত্যের আবশ্যক, মধুর রসের সাধনার জন্য তাহার আবশ্যক সমধিক। বস্তুত যেখানে যে-কেহ সাধনা করিয়াছে, তাহাকেই একটা পর্ব অন্ধকার গৃহে কাটাইতে হইয়াছে। সিদ্ধার্থকে নৈরঞ্জনা নদীতীরে সুদীর্ঘ ছয় বৎসর কাল সাধনা করিতে হইয়াছিল, সেটা অন্ধকার গৃহের অনুরূপ। তখন তাহাকে 'মার' কত রূপেই না ছলনা করিতে চাহিয়াছিল। সকল সাধককেই কখনো-না-কখনো সুবর্ণের ছলনায় পড়িতে হয়। কিন্তু যে-সৌভাগ্যবান সিদ্ধার্থ হইয়াছে—তাহাকে 'সুবর্ণ' ভোলাইতে পারে না। সুদর্শনা সিদ্ধি লাভ করিবার পূর্ব্বেই অন্ধকার গৃহ হইতে বাহিরে আসিয়া ঠকিয়া গেল। অমনি তাহার প্রবঞ্চিত চিত্তকে কেন্দ্র করিয়া অগ্নিদাহ, রাজায় রাজায় যুদ্ধ, রাজ্যময় অশান্তি, ও অরাজকতা দেখা দিল।

তখন কেমন করিয়া তাহার চারিদিকে আগুন লাগিল, অন্তরের রাজাকে ছাড়িতেই কেমন করিয়া তাহাকে লইয়া বাহিরের নানা মিথ্যা রাজার দলে লড়াই বাধিয়া গেল, সেই অগ্নিদাহের ভিতর দিয়া কেমন করিয়া আপন রাজার সহিত তাহার পরিচয় ঘটিল, কেমন করিয়া দুঃখের আঘাতে তাহার অভিমান

ক্ষয় হইল এবং অবশেষে কেমন করিয়া হার মানিয়া প্রাসাদ ছাড়িয়া পথে দাঁড়াইল, তবে সে তাহার সেই প্রভুর সঙ্গ লাভ করিল ১, নাটকখানিতে তাহা সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে।

সুদর্শনা চরম ভুল করিয়াছিল বটে, কিন্তু তবু তাহার অন্তরের সুগভীর স্থানে রাজার জন্যে একটা আকুলতা বরাবর ছিল, আবার রাজাও তাহাকে পরম ভুলে ও পরীক্ষায় ফেলিলেও কখনো সত্যই তাহাকে ত্যাগ করেন নাই। কবি যেন বলিতে চান, মানুষ যতই ভুল করুক, যতই দূরে যাক তাহার রাজাকে কখনো আমূল বিস্মৃত হয় না। আবার রাজাও তাহাকে সমূলে পরিত্যাগ করেন না। তিনি মানুষকে দুঃখ দেন বটে কিন্তু সে তো তাঁহার প্রসাদেরই রূপান্তর।

নাটকের শেষ দৃশ্যটিতে আবার অন্ধকার গৃহ। এবারে দেখি অন্ধকার গৃহ সুদর্শনার পক্ষে আর তেমন অসহ্য নয়। প্রথম দৃশ্যের অন্ধকার গৃহের রানী রাজাকে সুন্দর বলিয়া কল্পনা করিয়াছিল—তাই তাহার আলোকের জন্য ব্যাকুলতা ছিল। এখন রানী বুঝিতে পারিয়াছে—তাহার রাজা সুন্দর নয়, অনুপম। তাই তাহার পক্ষে অন্ধকার ও আলো দুই-ই তুল্যমূল্য। তাহার কথা শুনিয়া রাজা বলিলেন—"আজ এই অন্ধকার ঘরের দ্বার একেবারে খুলে দিলুম, এখানকার লীলা শেষ হল। এসো, এবার আমার সঙ্গে এসো, বাইরে চলে এসো,—আলোয়।

সুদর্শনা। যাবার আগে আমার অন্ধকারের প্রভুকে, আমার নিষ্ঠুরকে, আমার ভয়ানককে প্রণাম করে নিই।"

এইখানেই নাটকের পরিসমাপ্তি। অন্ধকারে যাহার সূচনা, আলোতে তাহার উপসংহার, সাধনায় আরম্ভ হইয়া সিদ্ধিতে তাহা উপনীত। অন্ধকার

১ রাজা, গ্রন্থপরিচয়, রবীন্দ্র রচনাবলী, দশম খণ্ড।

গৃহে জীবন যাপনের পালা শেষ হইয়াছে বুঝিতে পারিবামাত্র রাজা রানীর সম্মুখে বহির্বিশ্বের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিলেন। ১

২

বর্তমান নাটকের রাজা কে? চরাচরের যিনি রাজা সেই ভগবানকেই এই নাটকে রাজা বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। ভগবানের অনন্ত রূপের মধ্যে তাঁহার ঐশ্বর্যময় রূপটিই রবীন্দ্রনাথের সবচেয়ে প্রিয়, তাই রাজারূপে তিনি বর্তমান নাটকের নায়ক। ভগবানের সহিত মানুষের যত রকম সম্বন্ধ কল্পনা করা যাইতে পারে তন্মধ্যে আবার মধুর রসের সম্বন্ধটিই রবীন্দ্রনাথের সবচেয়ে প্রিয়, তাই রানীরূপে সুদর্শনা এই গ্রন্থের নায়িকা। জন্মপূর্ব হইতেই মানুষের সঙ্গে ভগবানের প্রেমের সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়া আছে বটে—কিন্তু মানুষকে সাধনার দ্বারা সেই সম্বন্ধটি উপলব্ধি করিতে হয়। এই সাধনার নাম তপস্যা—যে তাপে তপস্যা উজ্জ্বল হইয়া সার্থকতা লাভ করে তাহা দুঃখের তাপ। তাই মহিষী সুদর্শনাকে সুগভীর দুঃখের মধ্যে ফেলিয়া কবি তাহাকে সিদ্ধির তটভূমিতে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। সুদর্শনার দুঃখের মূলে তাহার একটি ভুল—সে তাহার রাজাকে চোখে দেখিতে চাহিয়াছিল। এই ভুলটি হইতে তাহার দুঃখের সূত্রপাত, আর সেই দুঃখ হইতে নাটকীয় ঘটনার বিবর্তন। সুদর্শনার রাজা চোখে দেখিবার বস্তু নহেন।

রাজা নাটকে সুদর্শনা আপন অরূপ রাজাকে দেখতে চাইলে, রূপের মোহে মুগ্ধ হ'য়ে ভুল রাজার গলায় দিলে মালা, তার পরে সেই ভুলের মধ্যে দিয়ে পাপের মধ্যে দিয়ে যে অগ্নিদাহ ঘটালে, যে বিষম যুদ্ধ বাধিয়ে দিলে তা অন্তরে

১ প্রফুল্লর সাধনা সম্পূর্ণ হইয়াছে বুঝিতে পারিয়া ভবানী পাঠকও তাহাকে অবাধ স্বাধীনতা দিয়াছিলেন। প্রফুল্ল স্বাধীনতার অপব্যবহার করে নাই। সুদর্শনাও আর করিবে না বুঝিতে পারা যায়।

বাহিরে যে ঘোর অশান্তি জাগিয়ে তুললে তাতেই তো তাকে সত্য মিলনে পৌঁছিয়ে দিলে। প্রলয়ের মধ্যে দিয়ে সৃষ্টির পথ।১

সুদর্শনার প্রভু কোন বিশেষ রূপে, বিশেষ স্থানে বিশেষ দ্রব্যে নাই. তিনি সকল দেশে সকল কালে। আপন অন্তরের আনন্দরসে তাঁহাকে উপলব্ধি করা যায়—এ নাটকে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে।২

রূপক ছাড়িয়া দিলে নির্গলিত প্রশ্নটি দাঁড়ায় এই যে রবীন্দ্রনাথের ভগবান ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য না ইন্দ্রিয়াতীত, তিনি যদি বিশেষ রূপে, বিশেষ স্থানে, বিশেষ দ্রব্যে না থাকেন, তবে তিনি সকল রূপে, সকল স্থানে, সকল দ্রব্যে অবশ্যই আছেন। কিন্তু সকলের মধ্যে কি বিশেষ অন্তর্গত নয়? তাহা হইলে কি দাঁড়ায় না যে তিনি যুগপৎ বিশেষ ও নির্বিশেষ! অর্থাৎ তিনি একই সঙ্গে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও ইন্দ্রিযাতীত! বস্তুতঃ তিনি দুই-ই। তিনি 'জগতের মাঝে কত বিচিত্র', আবার 'অন্তর মাঝে শুধু একা একাকী', বিচিত্রের আলয়রূপে তিনি আকাশ, আর অন্তরবাসীরূপে তাঁহার আলয় নীড়, 'একাধারে তুমিই আকাশ তুমি নীড়'। তিনি একাধারে ভাবময় ও রূপময় বলিয়া 'ভাব হতে রূপে' এবং 'রূপ হতে ভাবে' জগৎচক্র আবর্তিত হইতে পারে। রাজার এই স্বতোবিরুদ্ধ স্বভাবের সত্যটি বুঝিবার জন্য আপন অন্তরের আনন্দরসে তাহাকে উপলব্ধি করিতে হয়। অন্তরের বীক্ষণাগারে আনন্দরসের দ্বারা তাহাকে বুঝিয়া লইয়া জগতে বাহির হইলে আর ভুল করিবার আশঙ্কা থাকে না। সেই বীক্ষণাগার সুদর্শনার অন্ধকার গৃহ। বীক্ষণাগারের কার্য শেষ হইবার আগেই সে বাহির হইয়া পড়িয়াছিল। ইহাতেই তাহার দুঃখের সূচনা।

রাজা নাটকের ভাব-উপজীব্য হইতেছে মানব-হৃদয়ের ভগবৎ উপলব্ধির ইতিহাস। এই নীরস তথ্যটি নাটক নয়, নাটকের শুষ্ক কঙ্কাল মাত্র। কঙ্কাল

১ ও ২ রাজা, গ্রন্থপরিচয়, রবীন্দ্র-রচনাবলী, দশম খণ্ড

চিরকালই শুষ্ক। আর সমালোচকের দুর্ভাগ্য এই যে অনেক সময়েই তাহাকে কঙ্কালের সন্ধান রাখিতে হয়। যতটা সম্ভব কবির বাক্য উদ্ধার করিয়া কঙ্কালের নীরসতা ঢাকিতে চেষ্টা করিব—কিন্তু একেবারে ঢাকা পড়িবে এমন আশা করিতে কাহাকেও বলি না।

রবীন্দ্রনাথের ভগবান একাধারে বিশেষরূপ ও বিশ্বরূপ। প্রেমের সম্পর্কে তিনি বিশেষরূপ, জ্ঞানের সম্পর্কে তিনি বিশ্বরূপ। অর্জুনের সখারূপে তিনি কৃষ্ণ, অর্জুনের গুরুরূপে তিনি বিশ্বরূপের প্রদর্শক। তিনি সান্ত, তিনি অনন্ত। ঠাকুরদা বলিতেছে—

আমাদের রাজাটির নিজের নাকি রূপের সম্পর্ক নেই তাই তো এই বিচিত্ররূপ সে এত ভালোবাসে, এই রূপই তো তার বক্ষের অলঙ্কার।

রাজা জিজ্ঞাসা করিতেছে—আমার কোনো রূপ কি তোমার মনে আসে না?

সুদর্শনা। এক রকম করে আসে বই কি! নইলে বাঁচব কী ক'রে?

রাজা। কী রকম দেখেছ?

সুদর্শনা। সে তো এক রকম নয়। নববর্ষার দিনে জলভরা মেঘে আকাশের শেষ প্রান্তে বনের রেখা যখন নিবিড় হয়ে ওঠে, তখন বসে বসে মনে করি আমার রাজার রূপটি বুঝি এই রকম—এমনি নেমে-আসা, এমনি ঢেকে-দেওয়া, এমনি চোখ-জুড়ানো, এমনি হৃদয়-ভরানো, চোখের পল্লবটি এমনি ছায়ামাখা, মুখের হাসিটি এমনি গভীরতার মধ্যে ডুবে-থাকা। আবার শরৎকালে আকাশের পর্দা যখন দূরে উড়ে চলে যায় তখন মনে হয় তুমি স্নান করে তোমার শেফালিবনের পথ দিয়ে চলেছ, তোমার গলায় কুন্দ ফুলের মালা, তোমার বুকে শ্বেত চন্দনের ছাপ, তোমার মাথায় হালকা শাদা কাপড়ের উষ্ণীষ, তোমার চোখের দৃষ্টি দিগন্তের পারে—তখন মনে হয় তুমি আমার পথিক বন্ধু…

রাজা। এত বিচিত্র রূপ দেখছ তবে কেন সব বাদ দিয়ে কেবল একটি বিশেষ মূর্তি দেখ্‌তে চাচ্ছ?

আবার কেবল সর্ব প্রকৃতিতে নয়, সর্ব মানবেও তিনি ব্যাপ্ত হইয়া আছেন। ঠাকুরদার ব্যাখ্যা হইতে জানিতে পারি—

প্রজার মধ্যে যে রাজাটুকু আছে তারই গায়ে আঘাত লাগে, তার বাইরে যিনি তাঁর গায়ে কিছুই বাজে না। সূর্যের যে-তেজ প্রদীপে আছে তাতে ফুঁটুকু সয় না, কিন্তু হাজার লোকে মিলে সূর্যে ফুঁ দিলে সূর্য অম্লান থেকেই যায়।

ঠাকুরদার গানেও এই তত্ত্বটি আছে—"আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে।"

প্রাণের মানুষ অর্থাৎ বিশেষ বলিয়াই তিনি বিশ্বরূপ।

আমার প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে
তাই হেরি তায় সকল খানে।

তিনি মানুষের মনের সকল অবস্থাতেই বিরাজমান—

বসন্তে কি শুধু কেবল ফোটা ফুলের মেলা রে?
দেখিস নে কি শুক্‌নো পাতা ঝরা ফুলের খেলা রে?

সার্থকতা, ব্যর্থতা, সুখদুঃখ সকল অবস্থাতেই তাঁহার প্রকাশ।
এ গেল রাজার বিশ্বরূপ।

প্রেমের সম্পর্কে অর্থাৎ সুদর্শনার অন্ধকার ঘরটিতে তিনি বিশেষরূপ, সেখানে তিনি বিশ্বরাজ নহেন, সুদর্শনার হৃদয়ের নিঃসপত্ন রাজা।

সুরঙ্গমা। আলোর ঘরে সকলেরই আনাগোনা, এই অন্ধকারে কেবল একলা তোমার সঙ্গে মিলন।

আবার রাজার কথায় জানিতে পারি—

আলোয় তুমি হাজার হাজার জিনিসের সঙ্গে মিশিয়ে আমাকে দেখতে চাও? এই গভীর অন্ধকারে আমি তোমার একমাত্র হয়ে থাকি না কেন।

ইহাই তাঁহার বিশেষ রূপের পরিচয়। তবে সে বিশেষ রূপ যে সুদর্শনাকে সন্তুষ্ট করিতে পারিল না, সে তাহার দুর্ভাগ্য। দুর্ভাগ্যের আসল কারণ রাজার সহিত তাহার প্রেমের সম্পর্কটি সত্য হইয়া উঠিবার সুযোগ পায় নাই। প্রেমের দৃষ্টিতে তিনি সুন্দর, তিনি অনুপম; আর অপ্রেমের দৃষ্টিতে তিনি ভয়ানক। সুদর্শনা নিজেই সে কথা বলিয়াছে—

সত্য বলছি এই অন্ধকারের মধ্যে যখন তোমাকে দেখতে না পাই অথচ তুমি আছ বলে জানি তখন এক-একবার কেমন একটা ভয়ে আমার বুকের ভিতরটা কেঁপে ওঠে।

সুরঙ্গমাও এক সময়ে অনুরূপ ভীতি অনুভব করিয়াছে—তখন সে রাজাকে 'ভয়ানক' দেখিয়াছিল। তারপরে তাঁহার নিকট নতি স্বীকার করিয়া দাসী হইবামাত্র তাহার সমস্ত বেদনা সার্থক হইয়া গেল।

ভগবানের অভিপ্রায়ের সঙ্গে মানুষের ইচ্ছার সংগতিসাধন প্রেম। তাহার বিপরীত অপ্রেম। এ প্রায় কৃষ্ণদাস কবিরাজের উক্তির মর্মার্থের অনুরূপ—

কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা প্রেম তার নাম।

প্রেমের সম্পর্কে দুই পক্ষ না হইলে চলে না। এ পর্যন্ত গেল মানুষের পক্ষের কথা। ভগবানের পক্ষ হইতেও মানুষের প্রতি টান অল্প নয়। তাঁহার চোখে মানুষ সুন্দর, মানুষ তাঁহার প্রিয়, মানুষ তাঁহার বহুকালের ধ্যানের ধন—নতুবা কি মানুষকে তাঁহার প্রেয়সী বলিয়া কবিরা কল্পনা করিতে পারিত?

সুদর্শনা। আচ্ছা আমি জিজ্ঞাসা করি এই অন্ধকারের মধ্যে তুমি আমাকে দেখতে পাও?

রাজা। পাই বইকি।

সুদর্শনা। কেমন করে দেখতে পাও? আচ্ছা, কী দেখ।

রাজা। দেখতে পাই যেন অনন্ত আকাশের অন্ধকার আমার আনন্দের টানে ঘুরতে ঘুরতে কত নক্ষত্রের আলো টেনে নিয়ে এসে একটি জায়গায় রূপ ধরে দাঁড়িয়েছে। তার মধ্যে কত যুগের ধ্যান, কত আকাশের আবেগ, কত ঋতুর উপহার।

সুদর্শনা। আমার এত রূপ! তোমার কাছে যখন শুনি বুক ভরে ওঠে। কিন্তু ভালো করে প্রত্যয় হয় না, নিজের মধ্যে তো দেখতে পাইনে।

রাজা। নিজের আয়নায় দেখা যায় না, ছোটো হয়ে যায়। আমার চিত্তের মধ্যে যদি দেখতে পাও তো দেখবে সে কত বড়ো! আমার হৃদয়ে তুমি যে আমার দ্বিতীয়, তুমি সেখানে কি শুধু তুমি!

আত্মকেন্দ্রী মানুষ অকিঞ্চিৎকর, সে রূপ তাহার যথার্থ নয়। নিজেকে যথার্থভাবে জানিবার উদ্দেশ্যেই নিজেকে ভগবদ্দর্শনে প্রতিফলিত করিয়া দেখা আবশ্যক। কবি যেন ইহাই বলিতে চান। ইহার জন্যই মানুষের যত ধ্যানধারণা, ধর্মসাধনা, উপাসনা ও প্রার্থনা। নতুবা এত কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকারের আর কোনো সার্থকতা দেখা যায় না। মানুষ দুঃখকষ্ট ক্ষয়ক্ষতির

মধ্য দিয়া ভগবানের সন্ধান করিতেছে। তিনি তাহার চোখ বাঁধিয়া খেলার আঙিনায় ছাড়িয়া দিয়াছেন—আর বলিতেছেন, এবারে ধরো তো। চোখ বাঁধা বলিয়াই খেলার রস জমিয়া ওঠে। চোখের বাধা মনের সাধনার দ্বারা পুরাইয়া লইতে হইবে—ইহাই খেলার নিয়ম, ইহাই তাঁহার অভিপ্রায়। দুর্ভাগিনী সুদর্শনার আর বিলম্ব সহিল না। সে ভাবিল চোখের বাঁধন খুলিয়া ফেলিলেই মনের সাধনার অভাব পূরণ হইতে পারে।

৩

সুদর্শনা সুবর্ণর গলায় মালা দিল। সে বুঝিতে পারিল না যে সুবর্ণ ছদ্মবেশী রাজা, সে ভণ্ড। সুবর্ণ কে ও কী? যাহা কিছু বা যে-কেহ মানুষের দৃষ্টিকে ভিতরের দিক হইতে বাহিরের দিকে টানে, জীবনের চরিতার্থতার দিক হইতে সাংসারিক সার্থকতার দিকে টানে, ভগবানের দিক হইতে তাঁহার বিকল্পের দিকে টানে—তাহা-ই বা সে-ই সুবর্ণ। সুবর্ণ শব্দটির সুপ্রয়োগ হইয়াছে। সুবর্ণ বলিতে সুন্দর, স্বর্ণ ও মিষ্টবাক্য তিনই বোঝায়। প্রধানত এই তিনটির মোহেই মানুষ আত্মবিস্মৃত হয়, সুদর্শনারও আত্মবিস্মরণ ঘটিয়াছিল।

সুবর্ণর ধ্বজায় কিংশুক অঙ্কিত। কিংশুক যথার্থই তাহার প্রতীক। দৃষ্টিসুন্দর এই পুষ্পটি গুণহীন বলিয়া কথিত। বাহ্য সৌন্দর্যের অধিক সম্পদ কাহারো নাই—না পুষ্পটির না ব্যক্তিটির। কিন্তু রাজার পতাকায় অঙ্কিত প্রতীক পদ্ম ও বজ্র কত গভীর ও সূক্ষ্ম ইঙ্গিতে পূর্ণ। পদ্মের সৌগন্ধ্য সৌন্দর্য ও কোমলতা, বজ্রের অটল কঠোরতার সহিত মিলিত হইয়া সার্থক পূর্ণতার সৃষ্টি করিয়াছে। কিংশুক বা সুবর্ণ তাহা কোথায় পাইবে? ভগবান কি একাধারে পদ্মের মতো কোমল এবং বজ্রের মতো কঠিন নয়? রবীন্দ্রনাথের কল্পিত প্রতীকটি অপর এক কবির [illegible] রামচরিত্র স্মরণ করাইয়া দেয়—'বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদুনি কুসুমাদপি!'

৪

নাটকের স্থান কাল ও পাত্রের মধ্যে এ পর্যন্ত পাত্রের আলোচনা হইল। এখন স্থান ও কালের আলোচনা করা যাইতে পারে। আগে কালের আলোচনা করা যাক। নাটকটির কাল শুধু বসন্ত নয়, একেবারে বসন্তোৎসবের দিন। এ সম্বন্ধে আমি অন্যত্র যাহা লিখিয়াছি তাহাই উদ্ধৃত করিয়া দিলে চলিবে।

রাজা নাটককে বসন্তোৎসব নাম দেওয়া যাইতে পারে। বসন্তের সত্যকার রূপটি কি? শারদোৎসবে দেখিয়াছি কবি বলিয়াছেন—রাজা হ'তে গেলে সন্ন্যাসী হওয়া চাই। শরতের মধ্যে সন্ন্যাসের ভাব যদি কিছু থাকে তবে ঋতুরাজ বসন্ত একেবারে সন্ন্যাসী—সে রাজসন্ন্যাসী, তাহার যা কিছু ঐশ্বর্য তাহা বাহিরে, অন্তরে সে ত্যাগের মহিমায় অকিঞ্চন। বসন্ত সম্বন্ধে ইহাই রবীন্দ্রনাথের ধারণা; পরবর্তী নাটকে কাব্যে এই ধারণাই পরিণতি লাভ করিয়াছে, আর পরিবর্তিত হয় নাই।

এই নাটকে দু'জন রাজা আছেন, এক রাজা যাঁহার নাম অনুসারে বইখানির নামকরণ, দ্বিতীয় রাজা ঋতুরাজ বসন্ত। দু'জনের মধ্যেই কবি ভাবের ঐক্য লক্ষ্য করিয়াছেন। ঋতুরাজ অনন্ত-ঐশ্বর্য, কিন্তু অন্তরে তাহার রিক্তসম্পদ্ সন্ন্যাস। অপর রাজাও বাহিরে অনন্ত রূপ, অসংখ্য মূর্তি, ঐশ্বর্যের তাহার অন্ত নাই, কিন্তু অন্তরের অন্ধকার ঘরে তিনি একক, রূপহীন—তিনি অরূপরতন।

এ যে বসন্তরাজ এসেছে আজ
বাইরে তাহার উজ্জ্বল সাজ,
ওরে অন্তরে তার বৈরাগী গায়
তাই রে নাই রে নাই রে না।

যে এই বসন্তকে সত্যভাবে দেখিতে পাইয়াছে সে একই সঙ্গে বাহিরের উজ্জ্বল সাজ ও অন্তরের বৈরাগীর গেরুয়া দেখিয়া ধন্য হইয়াছে। যে

হতভাগ্য কেবল বসন্তের বাহিরের রূপটাই দেখিল তাহার দুর্ভাগ্যের আর অবধি নাই।

রানী সুদর্শনা এমনি একজন হতভাগিনী। তিনি ঋতুরাজের বাহিরটাই কেবল দেখিয়াছেন; তিনি রাজার বাহিরের ঐশ্বর্য দেখিবার জন্য লুব্ধ; বাহিরের সৌন্দর্যের চেয়ে গভীরতর কোনো সত্য তিনি স্বীকার করেন না, তাই তিনি ছদ্মবেশী সুপুরুষ সুবর্ণকে রাজা বলিয়া মনে করিলেন! ইহা তাঁহার লোভের দৃষ্টি।

দাসী সুরঙ্গমার গভীরতর দৃষ্টি আছে। রাজা তাহাকে কৃপা করিয়াছেন। সে জানে রাজাকে বাহিরে দেখিবার নয়, দেখিলে ভুল হইবে, সে জানে রাজাকে অন্ধকার ঘরের মধ্যে দেখিতে হয়। এক সময়ে রাজার প্রতি তাহার বিদ্বেষ ছিল, কিন্তু এখন সে ভক্তি করিতে শিখিয়াছে।...সুরঙ্গমার দৃষ্টিও চূড়ান্ত নয়—ইহা ভক্তের দৃষ্টি, সে রাজার পায়ের তলাকার মাটির দিকেই তাকায়, মুখের দিকে নয়; ইহা প্রেমের দৃষ্টি নয় বলিয়াই সে রাজাকে যথার্থতমভাবে বুঝিতে পারে নাই।

এই নাটকে কেবল ঠাকুরদা গোড়া হইতে সত্যভাবে রাজাকে জানেন, কারণ তাঁহার দৃষ্টি সখার দৃষ্টি, রাজাকে তিনি বন্ধু বলিয়া জানেন। কবি বলিতে চাহেন ভালোবাসার দৃষ্টিতেই কেবল জগতের ও জগৎপতির সত্য পরিচয় পাওয়া যায়। যে সেই দৃষ্টি লাভ করিয়াছে তা. র কাছে বাহিরের ঐশ্বর্য ও ভিতরের বৈরাগ্য যুগপৎ প্রকাশিত হইয়া পড়ে।

ইহার আগে কবি মানুষের জীবনলীলার অনুকল্প প্রকৃতিতে দেখিতে পাইয়াছেন। এখানে অর্থদ্যোতনা গভীরতর। এখানে আর মানুষের লীলা নয়, স্বয়ং জগৎপতির লীলার অনুকল্প প্রকৃতির মধ্যে কবি দেখিতে পাইয়াছেন। বিশ্বরাজের অন্তরে বাহিরে ভাবের যে আপাত-বিরোধ, ঋতুরাজের স্বভাবেও যেন তারই প্রতিধ্বনি; সেইজন্যই বিশেষ করিয়া বিশ্বরাজের লীলামঞ্চের পটভূমিকারূপে ঋতুরাজকে কবি দাঁ- করাইয়াছেন। প-ভূমিকায় ও পুরোভূমিকায় ভাবের সংগতি ঘটিয়া গিয়াছে। অন্তর ও বাহিরের যে

বিরোধ, ঐশ্বর্য ও সন্ন্যাসের মধ্যে যে বিরোধ তাহা আপাত-বিরোধ মাত্র। ঋতুরাজ যথার্থ ধনী বলিয়াই সব ত্যাগ করিতে সক্ষম, বিশ্বরাজের লীলাও অনুরূপ। বাহিরে তাঁহার আলোয় আলোময়, আর একটি অন্ধকার ঘরে রানীর সঙ্গে তাঁর মিলন; বাহিরে তাঁহার অনন্ত সৌন্দর্য, কিন্তু রাণী তাঁহাকে চোখে দেখিতে পাননা; বাহিরে তাঁহার অসংখ্য রূপ, অন্ধকার ঘরে রানীর কাছে তিনি অরূপ; কারণ সুদর্শনার প্রভু—'কোনো বিশেষরূপে, বিশেষ স্থানে, বিশেষ দ্রব্যে নাই, যে-প্রভু সকল দেশে, সকল কালে; আপন অন্তরে আনন্দ-রসে যাঁহাকে উপলব্ধি করা যায়'।১

এতক্ষণ কাল সম্বন্ধে যাহা বলা হইল, তাহাতে বুঝিতে পারা যাইবে তাহার তাৎপর্য্য কী। বুঝিতে পারা যাইবে কবি কেন বিশেষভাবে বসন্তঋতুকেই পট-ভূমিকারূপে প্রয়োগ করিয়াছেন এবং কীভাবে পটভূমিকায় এবং পুরোভূমিকায়, বিশ্বরাজে ও ঋতুরাজে সংগতি ঘটাইয়া দিয়াছেন।

এবারে নাটকের স্থান সম্বন্ধে একটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা যাইতে পারে। নাটকের প্রথম দৃশ্যে একটি অন্ধকার ঘর, আবার ইহার শেষতম দৃশ্যেও দেখিতে পাই সেই অন্ধকার ঘরটিকে। তবে প্রভেদের মধ্যে এই যে, প্রথম দৃশ্যের অন্ধকার ঘর হইতে রানী রাজার অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে বাহির হইয়াছেন—আর শেষের দৃশ্যে রাজা নিজেই দ্বার খুলিয়া রানীকে আলোতে আসিতে অনুমতি দিয়াছেন। শেষ দৃশ্যটিতে এমন যে হইতে পারিল তার কারণ তখন রানীর অন্ধকার ঘরের সাধনায় সিদ্ধিলাভ ঘটিয়াছে। ইহারই আনুসঙ্গিকরূপে মনে রাখিতে হইবে যে প্রথম দৃশ্যের সময় সন্ধ্যাবেলা আর শেষ দৃশ্যের সময় উষা। এই উষা রানীর নবজীবনের সূচক, এ প্রভাত যেমন বহিরাকাশের, তেমনি রানীর অন্তরাকাশেরও বটে।

আরও একটি বিষয়। নাটকটির দৃশ্যসমূহের অনেকগুলিই অন্ধকার ঘরে

১ ঋতুচক্র, রবীন্দ্রনাট্যপ্রবাহ, প্রথম খণ্ড।

ও বসন্ত পূর্ণিমার রাত্রিতে বিভক্ত। আলো-অন্ধকারের মোটা তুলির টানে নাট্যব্যাপারের অঙ্গে সুখদুঃখের ডোরা কাটিয়া দিয়া কবি ইহাকে বিচিত্র করিয়া তুলিয়াছেন। রানীর ঘর অন্ধকার, বাহিরের রাত্রি পূর্ণিমায় উজ্জ্বল; রানী নিঃসঙ্গ, বাহিরে আনন্দোন্মত্ত জনতা; রানী রাজাকে কাছে পাইয়াও দেখিতে পাইতেছে না, বাহিরের জনতা তাঁহাকে শতরূপে দেখিতে পাইয়াও কাছে পাইতেছে না—এই সমস্ত বৈচিত্র্যের দ্বারা কবি নাটকের অর্থকে অধিকতর ব্যঞ্জনায় পূর্ণ করিয়া পাঠকের রসোদ্বোধনে সাহায্য করিয়াছেন।

৫

এবারে নাটকটির গঠনরীতি সম্বন্ধে কিছু বলা যাইতে পারে। নাটকটি কুড়িটি দৃশ্যে বিভক্ত, অঙ্ক ভাগ নাই। কিন্তু অনায়াসে ইহাকে দুই অঙ্কে ভাগ করা চলিতে পারিত। প্রথম আটটি দৃশ্য প্রথম অঙ্ক, শেষের বারোটি দৃশ্য দ্বিতীয় অঙ্ক। এমন যে বলিলাম তার কারণ, প্রথম আট দৃশ্যের স্থান ও কাল এক, 'রাজা'র রাজধানী, রাজপুরী ও প্রাসাদের উদ্যান—সমস্তই একটি মাত্র দিনের ঘটনা। নবম দৃশ্য হইতে স্থানান্তর ও কালান্তর ঘটিয়াছে, ঘটনাও দ্রুততর বেগে পরিণামের মুখে ধাবিত। ষষ্ঠ দৃশ্যে রোহিণীর উক্তিতে আছে—"পরশু যখন তাঁকে রানীর ফুল দিলুম" এবং অষ্টম দৃশ্যে সুদর্শনার উক্তিতে আছে—"কাল থেকে চেষ্টা করছি।" ইহাতে কালান্তর সূচনা করে বটে—কিন্তু 'কাল' ও 'পরশু'-র ব্যবহার অনবধানতার ভুল বলিয়াই মনে হয়। কেননা ঘটনাপ্রবাহের ছেদ লক্ষ্যগোচর হয় না।

১৭ সংখ্যক দৃশ্যটি ১৬ সংখ্যক দৃশ্যের স্থানে বসিলে ঘটনাপ্রবাহের ব্যাখ্যা সহজতর হইত বলিয়া মনে হয়। ১৫ সংখ্যক দৃশ্যের বিষয় বিদ্রোহী রাজগণের প্রতি রাজসেনাপতিবেশী ঠাকুরদার যুদ্ধের আহ্বান। তারপরেই ১৬ সংখ্যক দৃশ্যে সুদর্শনা ও সুরঙ্গমার সংলাপ হইতে জানিতে পারি যে বিদ্রোহীগণ পরাজিত হইয়াছে কিন্তু রাজা তখনো রানীকে লইতে আসেন নাই। ১৭

সংখ্যক দৃশ্যে নাগরিকগণের সংলাপ হইতে যুদ্ধের একটা বিবরণ জানিতে পারা যায়। কিন্তু ১৬ সংখ্যক দৃশ্যেই পাঠক যুদ্ধের পরিণাম জানিতে পারিয়াছে—তারপরে সে বিষয়ে তাহাদের আর তেমন কৌতূহল থাকিবার কথা নয়। ১৭ সংখ্যক দৃশ্যকে আগে আনিলে পাঠক যথাসময়ে যুদ্ধের বিবরণ জানিতে পারিয়া রানীর ভবিষ্যৎ জানিবার জন্য প্রস্তুত হইত।

নাটকটি দুই অঙ্কে ভাগ করিবার কথা বলিয়াছি—কিন্তু সূক্ষ্মতর বিচারে ২০ সংখ্যক দৃশ্যটিকে তৃতীয় অঙ্ক বলিয়া ধরা উচিত। স্থান, কাল ও ঘটনার ছেদ বুঝাইবার উদ্দেশ্যেই অঙ্কপাত করা হইয়া থাকে। ২০ সংখ্যক দৃশ্যটির স্থান প্রথম দৃশ্যের ন্যায় অন্ধকার ঘর—নাটকের ঘটনাচক্র আবার আবর্তিত হইয়া সূচনা-স্থানে ফিরিয়া আসিয়াছে। কিন্তু কবি সেরূপ দায়িত্ব স্বীকার করেন নাই, সরাসরি কুড়িটি দৃশ্য বলিয়া ছাড়িয়া দিয়াছেন। স্থান কাল ও ঘটনা-বিন্যাস অনুসারে নাটকের দৃশ্যযোজনা ও অঙ্কপাত বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের বরাবর একপ্রকার শিথিলতা ছিল। কেন এমন হইয়াছে তাহার আলোচনা স্থানান্তরে করা যাইবে।

৬

এতক্ষণ যে আলোচনা হইল প্রধানত তাহা তত্ত্বের আলোচনা। তত্ত্বের আলোচনা রসের আলোচনা নহে। রসের গৌরবেই সাহিত্যের আদর। নাটকটির মূল উপজীব্য—মানবহৃদয়ের সহিত ভগবানের মিলন যেমন দুরূহ, তেমনি জটিল। এ হেন বিষয়কে রস সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়া তোলা সহজ নহে। এখন দেখিতে হইবে এ বিষয়ে কবি কতদূর কৃতকার্য হইয়াছেন। কারুকার্যময় ভাষা, ঠাকুরদার সহজ প্রজ্ঞা, নাগরিকগণের সরস কথোপকথন, রবীন্দ্রসংগীত বলিতে যে অলৌকিক গীতিকবিতা বুঝায় তাহার প্রচুর প্রয়োগ, ঘটনাবিন্যাসের এক প্রকার দ্রুতি—এই সব উপায়ের দ্বারা কবি যে নাট্য-বিষয়টিকে সজীব ও সক্রিয় করিয়া তুলিতে পারিয়াছেন সন্দেহ নাই। কিন্তু

নাটকের মূল গৌরব চরিত্রসৃষ্টি। প্রাণবান নরনারীই নাটকের প্রধান সম্পদ্। সেই সম্পদে নাটকখানি তেমন সমৃদ্ধ নয়। একমাত্র সুদর্শনা-চরিত্র ব্যতীত আর কোনো মানবচরিত্র পাঠককে তেমন করিয়া আকর্ষণ করে না বলা যাইতে পারে। সুদর্শনার বেদনা, আত্মদ্বন্দ্ব, গ্লানির অনুভূতি, অনুশোচনা ও বিনতি পাঠকের মনকে গভীরভাবে স্পর্শ করে। নাটকের বিষয়টি সাধারণ জনের প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতার অতীত, তাহাকে প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতার গোচর করিয়া তোলা সহজ নয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মতো মহাকবির নিকট হইতে সুলভ সমাধানের প্রত্যাশাই বা কেন করিব? লৌকিক কবির যে দানে মন তৃপ্ত হয় অলৌকিক কবির সে দানে পাঠকের মনে এক প্রকার অতৃপ্তি রহিয়া যায়। 'রাজা' নাটকের পাঠক এই জাতীয় একটা অতৃপ্তি অনুভব করে বলিয়া আমার বিশ্বাস।

ডাকঘর

ডাকঘর নাটক সম্বন্ধে সর্বপ্রথমে উল্লেখযোগ্য ইহার রচনা-কাল। ইহা গীতাঞ্জলি-গীতালি পর্বে লিখিত। খেয়া-কাব্য রচনার সময় হইতে বলাকা-ফাল্গুনী রচনার মধ্যবর্তী পর্বটা কবিজীবনের একটা স্বভাববিরুদ্ধ সময়; এমন সময় তাঁহার জীবনে ইহার পূর্বেও আসে নাই, আর পরেও নয়। কবিজীবনের এই স্বভাববিরুদ্ধতা সম্বন্ধে 'রবীন্দ্রকাব্যপ্রবাহ' গ্রন্থে আমি উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু তৎকালে প্রমাণাভাবে ইহার স্বরূপ নির্ণয় করিতে পারি নাই।

সম্প্রতি তাঁহার যে সব চিঠিপত্র প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে এই পর্বের উপরে আলোক নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। এই সব চিঠিপত্র হইতে জানা যায়, এই পর্বে উৎকট একটা মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা কবিকে পাইয়া বসিয়াছিল। এমন উৎকট আকাঙ্ক্ষা স্বাভাবিক সুস্থ মনের লক্ষণ নয়; রবীন্দ্রনাথের তো নয়ই, কারণ এমন সুস্থ, স্বাভাবিক, বলিষ্ঠ দেহ-মন কদাচিৎ দেখা যায়। তবে এই সাময়িক স্বভাববিরুদ্ধতার কারণ কি? যথাকালে ইহার ব্যাখ্যার চেষ্টা করিব—কিন্তু আরও চিঠিপত্র প্রকাশিত না হইলে সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা সম্ভব নয়। কিন্তু তৎপূর্বে কবি-লিখিত চিঠিপত্রের সাক্ষ্য শোনা যাক।

এখানে [শিলাইদহে] আসবামাত্রই আমার সেই অসহ্য ক্লান্তি ও দুর্বলতা দূর হয়ে গেছে। এমন সুগভীর আরাম আমি অনেক দিন পাইনি। এই জিনিসটি খুঁজতেই আমি দেশদেশান্তরে ঘুরতে চাচ্ছিলুম কিন্তু এ যে এমন পরিপূর্ণভাবে আমার হাতের কাছেই আছে সে জীবনের ঝঞ্চাটে ভুলেই গিয়েছিলুম। কিছুকাল থেকে মনে হচ্ছিল মৃত্যু আমাকে তার শেষ বাণ মেরেছে এবং সংসার থেকে আমার বিদায়ের সময় এসেছে—কিন্তু যস্য ছায়ামৃতং

তস্য মৃত্যুঃ,—মৃত্যুও যাঁর অমৃতও তাঁরি ছায়া—এতদিনে আবার সেই অমৃতের পরিচয় পাচ্ছি।…১৯১২।১

পরবর্তী একটি পত্রখণ্ডে এই উৎকট মৃত্যু-আকাঙ্ক্ষার অধিকতর পরিচয় আছে।

কিছুদিন থেকে আমার মনের মধ্যে যে উৎপাত দেখা দিয়েছে সেটা একটা শারীরিক ব্যামো। সে কথা ক্রমশই আমার কাছে স্পষ্ট হচ্ছে।—তাব দুটো কারণ আমার মনে আসছে।

প্রথম, কিছুকাল থেকেই আমার একটা nervous breakdown হয়েছে তার সন্দেহ নেই। যখন আমার কানে এবং মাথার বাঁ দিকে ব্যথা করতে লাগিল তখন বুঝেছিলুম সেটা ভালো লক্ষণ নয়। যে কোনো কাজ করতুম অত্যন্ত জোর করে করতে হত। আর মনের মধ্যে একটা গভীর বেদনা ও অশান্তি অকাবণে লেগেই ছিল।

তার পরে Younan ডাক্তার এর জন্যে যে ওষুধ দিলেন সেটা হচ্ছে Aurum, খুব high dilution। এটা কেন দিলেন আমি বুঝতে পারিনি। কানাইবাবু বলেছিলেন, এতে আমার অনিষ্ট হবে। আমার বিশ্বাস এই ওষুধের ফলে আমার কানের ব্যথা সেরে গেল বটে কিন্তু এই ওষুধের যে mental effect সে আমাকে চেপে ধরেছে—ওর মানসিক লক্ষণ নিচে লিখে দিচ্ছি—

Melancholy, with inquietude and desire to die.—Irresistible impulse to weep. Sees obstacles everywhere. Hopeless, suicidal; desperate Great anguish. Excessive scruples with conscience. Despair of oneself and others. Grumbling, quarrelsome humour. Alternate peevishness and cheerfulness.

১ চিঠিপত্র, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২১

মেটিরিয়া মেডিকাতে যা লিখেছে এর সব লক্ষণই আমার মধ্যে দেখা দিয়েছে। দিনরাত্রি মরবার কথা এবং মরবার ইচ্ছা আমাকে তাড়না করেছে। মনে হয়েছে আমার দ্বারা কিছুই হয়নি এবং হবে না, আমার জীবনটা যেন আগাগোড়া ব্যর্থ; অন্যদের সকলের সম্বন্ধেই নৈরাশ্য এবং অনাস্থা। তার পরে যখন রামগড়ে ছিলুম তখন থেকে আমার conscience-এ কেবলি ভয়ঙ্কর আঘাত করেছে যে, বিদ্যালয়, জমিদারি, সংসার, দেশ প্রভৃতি সম্বন্ধে আমার যা কর্তব্য আমি কিছুই করিনি—আমার উচিত ছিল নিঃসংকোচে আমার সমস্ত ত্যাগ করে একেবারে রিক্ত হয়ে যাওয়া, এবং আমার সমস্ত পরিবারের লোককে একেবারে চূড়ান্ত ত্যাগের মধ্যে টেনে আনা; সেইটে যতই হচ্ছিল না ততই নিজের উপর এবং সংসারের উপর আমার গভীর অশ্রদ্ধা ঘনিয়ে আসছিল এবং কেবলি মনে হচ্ছিল যখন এ জীবনে আমার idealকে realise করতে পারলুম না তখন মরতে হবে, আবার নূতন জীবন নিয়ে নূতন সাধনায় প্রবৃত্ত হতে হবে। মনের মধ্যে এই রকম সুগভীর অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে বলেই আমি যাদের খুব ভালোবাসি তাদেরই সম্বন্ধে যত রকম মন্দ এবং অকল্যাণ আমার কল্পনায় বারম্বার তোলাপাড়া করেছে, কোনোমতেই তাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারি নি।...

এ রকম একান্ত মূঢ়ের মতো মনের ভাব আমার কোনোকালেই ছিল না। আমি বরঞ্চ স্বভাবতই নিরুদ্বিগ্ন স্বভাবের। তোদের কারো জন্যে কখনো মিছিমিছি ভাবিনি। সেইজন্যই শিশুকাল থেকে তোদের এত অজস্র স্বাধীনতা দিতে পেরেছি, কিন্তু এখন এমন অদ্ভুত ভীরুতা মনে এসেছে যে তুই হয়তো বাইসিকেলে করে একটু কোথায় গেলে আমার ভয় হয় তোর বিপদ হবে—দেরি করে এলে মনে হয় কিছু একটা বিপদ হয়েছে। আমি নির্লিপ্ত এবং নিশ্চিন্ত স্বভাবের অথচ আমার এমন দশা হঠাৎ কি করে হতে পারে আমি ভেবে পাচ্ছিলুম না। আজকাল একেবারে আমার স্বভাবের উলটো চালে চলছি...। সেজন্যে নিজের পরে অশ্রদ্ধাই হচ্ছে।...কাল সন্ধ্যার সময়ে ক্ষণকালের জন্য এই অন্ধকারের ভিতর দিয়ে একটা আলোর আবির্ভাব দেখতে

পেয়েছি। আমার বিশ্বাস এইবার থেকে আমি এই মোহজাল থেকে নিষ্কৃতি লাভ করে আবার আমার প্রকৃতি ফিরে পাব। আজ আমি আমার এই ব্যাধিগ্রস্ত অপ্রকৃতিস্থ স্বভাবকে কতকটা যেন বাইরে থেকে দেখতে পেয়েছি বলেই Materia Medica খুলে সেই Aurum ওষুধের লক্ষণ মিলিয়ে দেখে একেবারে আশ্চর্য হয়েছি—একেবারে সম্পূর্ণ মিলে গেছে। আমি deliberately suicide করতেই বসেছিলুম—জীবনে আমার লেশমাত্র তৃপ্তি ছিল না। যা কিছু স্পর্শ করছিলুম সমস্তই যেন ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলছিলুম। এ রকম একেবারে উল্টো মানুষ যে কি রকম করে হতে পারে এ আমার একটা নতুন experience—সমস্তই একেবারে দুঃস্বপ্নের ঘন জাল। তোদের ভয় নেই এ আমি ছিন্ন করব—এর ওষুধ আমার অন্তরেই আছে।...এই অবস্থায় যা কিছু করেছি তার জন্যে আমি দায়ী নই।...আমার জন্যে তোরা আর ভাবিস নে। অমি কিছুদিন স্থরুলের ছাতে শান্ত হয়ে বসে আবার আমার চিরন্তন স্বভাবকে ফিরে পাব সন্দেহ নেই—মৃত্যুর যে গুহার দিকে নেবে যাচ্ছিলুম তার থেকে আবার অলোকে উঠে আসব কোন সন্দেহ নেই।...১৯১৫।[১]

চিঠিখানা ডাকঘর রচনার পরবর্তী, কিন্তু মনে রাখিতে হইবে ডাকঘর রচনার সঙ্গে সঙ্গেই এই মনোভাব কাটিয়া যায় নাই; যে মনোভাব হইতে ডাকঘরের উদ্ভব, তাহা তখনো চলিতেছিল। ইহার আগের চিঠিখানার তারিখ ১৯১২ সাল। এখন ১৯১১ (ডাকঘর রচনার সময়) হইতে ১৯১৫ পর্বের আরও চিঠিপত্র প্রকাশিত হইলে এই সময়ের রহস্য অধিকতর পরিষ্কৃত হইবে, এমন আশা করা যায়।

যে বছরে ডাকঘর রচিত হয় সেই বছরে লিখিত একখানা চিঠি হইতে কবির পূর্ব্বোক্ত মনোভাবের খানিকটা পরিচয় পাওয়া যায়।

আমি দূর দেশে যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছি। আমার সেখানে অন্য কোনো

১ চিঠিপত্র ২, পৃঃ ২৭—৩২

প্রয়োজন নেই, কেবল কিছুদিন থেকে আমার মন এই বলছে যে, যে পৃথিবীতে জন্মেছি সেই পৃথিবীকে একবার প্রদক্ষিণ করে নিয়ে তবে তার কাছ থেকে বিদায় নেব। এর পরে আর তো সময় হবে না। সমস্ত পৃথিবীর নদী গিরি সমুদ্র এবং লোকালয় আমাকে ডাক দিচ্ছে—আমার চারদিকের ক্ষুদ্র পরিবেষ্টনের ভিতর থেকে বেরিয়ে পড়বার জন্য মন উৎসুক হয়ে পড়েছে। আমরা যেখানে দীর্ঘকাল থেকে কাজ করি সেখানে আমাদের কর্ম্ম ও সংস্কারের আবর্জনা দিনে দিনে জমে উঠে চারদিকে একটা বেড়া তৈরি করে তোলে। আমরা চিরজীবন আমাদের নিজের সেই বেড়ার মধ্যেই থাকি, জগতের মধ্যে থাকি নে। অন্ততঃ মাঝে মাঝে সেই বেড়া ভেঙে বৃহৎ জগৎটাকে দেখে এলে বুঝতে পারি আমাদের জন্মভূমিটি কত বড়—বুঝতে পারি জেলখানাতেই আমাদের জন্ম নয়। তাই আমার সকলের চেয়ে বড় যাত্রার পূর্বে এই ছোট যাত্রা দিয়ে তার ভূমিকা করতে চাচ্ছি—এখন থেকে একটি একটি করে বেড়ি ভাঙতে হবে তারই আয়োজন।...

ইতি ২২শে আশ্বিন, ১৩১৮।১

এই সময়কার আর একখানি পত্রে পাই—

বেরো, বেরো, বেরো, রাস্তায় বেরিয়ে পড়, ফাঁকায় ছুটে আয়, আর একদণ্ড ঘরে নয় এই কথাটা এমন করে অন্তরে বাহিরে ধ্বনিত হয়ে উঠেছে যে, আজ আমার আর অন্য কোনো কথা চিন্তা করবার জো নেই—এর কাছে অন্য সকল কথাই আমার কাছে তুচ্ছ।...২৩শে আশ্বিন, ১৩১৮।২

এই কয়েকটি পত্রখণ্ডে ডাকঘরের প্রত্যক্ষতঃ উল্লেখ নাই; ডাকঘরের সঙ্গে

১ দেশ, ১০ই আশ্বিন, ১৩৪৮

২ বিশ্বভারতী পত্রিকা, শ্রাবণ-আশ্বিন সংখ্যা, ১৩৫৪

ইহাদের সম্বন্ধ অনেক পরিমাণে অনুমানলব্ধ মাত্র। কিন্তু এবারে যে অংশ উদ্ধার করিতেছি, তাহাতে প্রত্যক্ষতঃ ডাকঘরের কথা আছে; ডাকঘর যে-মনোভাব হইতে উদ্ভূত তাহার উল্লেখ আছে; তাহা জানিবামাত্র পূর্বোক্ত পত্রখণ্ডের সঙ্গে ডাকঘরের যে-সম্বন্ধ অনুমানগম্য ছিল তাহা অত্যন্ত সুপ্রত্যক্ষ হইয়া উঠিবে।

ডাকঘর নাটকটি তাঁর নিজের মৃত্যুকল্পনা অবলম্বনেই লেখা। ১৩২২ সালে পৌষ মাসে রবীন্দ্রনাথ আশ্রমবাসীদের সকলের কাছে তাঁর নাটকের বিষয়ে ধারাবাহিক কতকগুলি বক্তৃতা দিয়েছিলেন; ৪ঠা পৌষের বক্তৃতার বিষয় ছিল ডাকঘর। সেই বক্তৃতাগুলি তখন আমার পিতৃদেব কালীমোহন ঘোষ তাঁর দিনলিপি-পুস্তকে লিখে রেখেছিলেন, এখানে তার থেকে খানিকটা উদ্ধৃত করি। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন—

ডাকঘর যখন লিখি তখন হঠাৎ আমার অন্তরের মধ্যে আবেগের তরঙ্গ জেগে উঠেছিল। তোমাদের ঋতু-উৎসবের জন্য লিখিনি।

শান্তিনিকেতনের ছাদের উপর মাদুর পেতে পড়ে থাকতুম, প্রবল একটা আবেগ এসেছিল ভিতরে। চল, চল, বাইরে চল, যাবার আগে তোমাকে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করতে হবে, সেখানকার মানুষের সুখদুঃখের উচ্ছ্বাসের পরিচয় পেতে হবে। সে সময়ে বিদ্যালয়ের কাজে বেশ ছিলুম। কিন্তু হঠাৎ কি হল। রাত দুটো তিনটের সময় অন্ধকার ছাদে এসে মনটা পাখা বিস্তার করল। যাই-যাই এমন একটা বেদনা মনে জেগে উঠল। ··আমার মনে হচ্ছিল, একটা কিছু ঘটবে, হয়তে মৃত্যু। ষ্টেশনে যেন তাড়াতাড়ি লাফিয়ে উঠতে হবে সেই রকমের একটা আনন্দ আমার মনে জাগছিল। যেন এখান হতে যাচ্ছি। বেঁচে গেলুম। এমন করে যখন ডাকছেন, তখন আমার দায় নাই। কোথাও যাবার ডাক ও মৃত্যুর কথা উভয় মিলে, খুব একটা আবেগে, সেই চঞ্চলতাকে ভাষাতে 'ডাকঘরে' কলম চালিয়ে প্রকাশ করলুম। মনের আবেগকে একটা বাণীতে বলার দ্বারা প্রকাশ করতে হল। মনের মধ্যে যে অব্যক্ত অথচ

চঞ্চল তাকে কোনো রূপ দিতে পারলে শান্তি আসে। ভিতরের প্রেরণায় লিখলুম। এর মধ্যে গল্প নেই, এ গদ্য লিরিক। আলঙ্কারিকদের মতানুযায়ী নাটক নয়, আখ্যায়িকা। এটা বস্তুত কি? এটা সেই সময়ে আমার মনের ভিতর যে অকারণ চাঞ্চল্য দূরের দিকে হাত বাড়াচ্ছিল, দূরের যাত্রায় যিনি দূর থেকে ডাকছিলেন, তাঁকে দৌড়ে গিয়ে ধরবার একটা তীব্র আকাঙ্ক্ষা। সেই দূরে যাওয়ার মধ্যে রমণীয়তা আছে। যাওয়ার মধ্যে একটা বেদনা আছে, কিন্তু আমার মনের মধ্যে বিচ্ছেদের বেদনা ততটা ছিল না। চলে যাওয়ার মধ্যে যে বিচিত্র আনন্দ তা আমাকে ডাক দিয়েছিল, বহু দূরে সে অজানা রয়েছে, তার পরিচয়ের ভিতর দিয়ে সে অজানার ডাক, দূর সেখানে মুগ্ধ করেছে, যাত্রা সেখানে রমণীয়, বহু বিস্মৃত অপরিচিতের মধ্যে যে আনন্দ। সেই যখন অন্তরালে বাঁশি বাজিয়ে ডাক দিল, সে ভাবটি প্রকাশ করলুম। থাকব না, থাকব না, যাব, যাব, সবাই আনন্দে যাচ্ছে, সবাই ডাকতে ডাকতে যাচ্ছে—আর আমি কিনা বসে রইলুম। এই দুঃখকে, ব্যাকুলতাকে ব্যক্ত করতে হবে। এই ভাব যদি কারো সম্পূর্ণ অপরিচিত হয় তবে হেঁয়ালি বলতে পারে। এই বেদনা যদি কারো মধ্যে থাকে সে বুঝতে পারবে এর মর্মটা কী।[১]

এই কয়েকখণ্ড রচনা হইতে ডাকঘর-পর্বে কবির মনের অবস্থা জানিতে পারা যায়। মানসিক এই পটভূমি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন না হইলে ডাকঘর নাটক খাপছাড়া বলিয়া বোধ হইবে; পূর্বাপরের সহিত ইহাকে যুক্ত করা যাইবে না; আর পূর্ব্বাপরের সহিত সংযুক্ত তথ্যেরই নাম সত্য।

পূর্ব্বোক্ত রচনাগুলি হইতে কবির মনের অবস্থাকে বিশ্লেষণ করিলে তিনটি ভাবকে পাওয়া যায়। প্রথমত, উৎকট মৃত্যু আকাঙ্ক্ষা; দ্বিতীয়তঃ, অনির্দিষ্ট কোন্ এক সুদূরে চলিয়া যাইবার ইচ্ছা; তৃতীয়তঃ, প্রবাসবেদনার কাতরতা। যেন, যেখানে আছি, তাহা গৃহ নয়, আসল গৃহের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিতে হইবে, যে-বেদনা শীতের শেষে প্রবাসী হাঁসের দলকে অলক্ষিতে মানসোৎকা করিয়া তোলে।

১ রবীন্দ্রসঙ্গীত, পৃঃ ১৩৭—১৩৯, শ্রীশান্তিদেব ঘোষ।

দেহে মনে রবীন্দ্রনাথের সুস্থতা অসাধারণ; তবে এমন ঘটিল কেন? যে কেবল মাত্র সাহিত্য-সমালোচক তাহার পক্ষে এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সহজ নয়, কারণ ইহার মূল বহুদূরব্যাপী; বিশেষ, কবিজীবনের এই পর্ব্ব সম্বন্ধে এখন পর্যন্ত অল্পই জানা গিয়াছে; এখনও তথ্যের ভিত্তি খুব নির্ভরযোগ্য নয়। তবে সাধারণ ভাবে ইহা বলা যায় যে, প্রত্যেক মানুষেরই মধ্যবয়সে, পঞ্চাশের কাছাকাছি এমন একটা অস্বাভাবিক সময় আসে যখন সে একবার পিছনের দিকে তাকাইয়া দেখে, আর সমস্তকে কেন্দ্রচ্যুত, ঝাপসা, মাত্রাহীন বলিয়া মনে করে। তখন সে ছোটকে বড়, বড়কে ছোট, তুচ্ছকে নিত্য, সবসুদ্ধ জড়াইয়া একটানা একটা নৈরাশ্য ও নিষ্ফলতা অনুভব করিতে থাকে। মধ্য বয়সের এই বিভীষিকা মানুষের প্রকৃতিকে অনেক সময় পরিবর্তিত করিয়া ফেলে। অধার্মিক হঠাৎ ধর্মবাতিকগ্রস্ত হইয়া ওঠে, বিশ্বাসী নাস্তিক হয়, বদান্যব্যক্তি নিতান্ত কৃপণস্বভাব হইয়া পড়ে; অল্প লোকেই এই সাময়িক বিভীষিকার হাত এড়াইয়া পুনরায় পূর্বের স্বাভাবিকতা ফিরিয়া পায়।

রবীন্দ্রনাথ যে সগৌরবে পূর্বের স্বভাব ফিরিয়া পাইয়াছেন, ক্রমবিকাশের স্তরে স্তরে উন্নীত হইয়া গিয়াছেন, ইহা তাঁহার অসাধারণ চরিত্রের ফল। অপেক্ষাকৃত অল্প শক্তিমান হইলে এখানেই তাঁহার কবিজীবন পরিসমাপ্ত হইয়া যাওয়া অসম্ভব ছিল না।

এখন, সাধারণ মানুষের জীবনে যে অভিজ্ঞতা ঘটে সূক্ষ্মঅনুভূতিপ্রবণ কবিদের জীবনে তাহা অধিকতর তীব্রতায় ঘটিয়া থাকে; রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রেও তাহাই হইয়াছিল। একদিকে যেমন অপসরণশীল যৌবন ও প্রত্যাসন্ন বার্ধক্য কবির পক্ষে আনন্দদায়ক হয় নাই, তেমনি আবার আর একদিকে কঠিন দৈহিক পীড়া তাঁহার পক্ষে উদ্বেগজনক হইয়া উঠিয়াছিল। ১৯০২ সালে পত্নীর মৃত্যুর পর হইতে ১৯১৩-এর শেষভাগে বিদেশ হইতে ফিরিয়া আসার সময় পর্যন্ত কবির জীবনের একটা শঙ্কাজনক সময়। কেবল দৈহিক স্বাস্থ্যের কথাই যদি ধরা যায়, তবে ইহার পূর্বে বা পরে কখনো তিনি এত দীর্ঘকাল রোগযন্ত্রণা ভোগ করেন নাই। তাঁহার প্রায় সব বয়সের প্রতিকৃতিই আছে, কিন্তু এই সময়ের ছবি-

গুলিতে যে কৃশতা, স্বাস্থ্যহীনতা এমন কি একটা রুগ্ন নিস্তেজতা দেখা যায় এমন আর কখনো নয়। চল্লিশ-বিয়াল্লিশ পর্যন্ত তাঁহার চেহারাতে যে দিব্য কান্তি ছিল, মুখে যে প্রতিভার অলৌকিক দ্যুতি ছিল, এই সময়টায় তাহা যেন কথঞ্চিৎ ম্লান; সেই কান্তি, সেই দ্যুতি পঞ্চান্নর কাছাকাছি ফিরিয়া আসিয়াছে এবং মৃত্যুর পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত তাহাদের অলৌকিক আবাস পরিত্যাগ করে নাই—না, মৃত্যুর পরেও তাহারা সেই আশ্রয় জড়াইয়া পড়িয়া ছিল—কি অসম্ভব আশায়, কি মুগ্ধ বিশ্বাসে! এই সময়টাতে দৈহিক রোগের প্রভাবে তাঁহার প্রতিভায় কি পরিবর্তন ঘটিয়াছিল?—এ জটিল গ্রন্থিউন্মোচন অবশ্য আমার মত অব্যবসায়ীর দ্বারা হইবার নয়।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে অপসরণশীল যৌবন, প্রত্যাসন্ন বার্ধক্য এবং দৈহিক কঠিন পীড়া—এই তিনটিতে মিলিয়া কবির দেহে এবং মনে যে বিপ্লব উপস্থিত করিয়াছিল তাহারই ফলে তাঁহার জীবনের এই সাময়িক অস্বাভাবিকতা, মৃত্যুর উৎকট আকাঙ্ক্ষা, অনির্দেশের আকুতি ও প্রবাসীর গৃহবেদনা।

ইহার মধ্যে দৈহিক পীড়ার উপশম ইংলণ্ডে চিকিৎসার দ্বারা হইয়াছিল; কিন্তু ব্যাধিমুক্ত হইলেও মানসিক পীড়ার কারণ দূরীভূত হয় নাই। আধি মোচন কোনো চিকিৎসকের পক্ষে সম্ভব নয়—নিজের সাধনার দ্বারাই কবিকে তাহা দূর করিতে হইয়াছে—"তোদের ভয় নেই এ আমি ছিন্ন করব—এর ওষুধ আমার অন্তরেই আছে।"

মানসিক অশান্তি হইতে কবি নিজের সাধনাদ্বারা মুক্ত হইয়াছেন; এই মুক্তির একাধারে ঔষধ ও প্রমাণ, বলাকা ও ফাল্গুনী।

দেহের যৌবন অপসরণশীল হইলেও তাহা সত্যই জীবন হইতে একেবারে চলিয়া যায় না, নূতনতর মহিমায়, গভীরতর দ্যোতনায় জীবনে আবার ফিরিয়া আসে; দেহের রঙমহল হইতে অন্তরের খাসমহলে তাহার আসন পাতা হয়। "প্রৌঢ়দেরই যৌবনটি নিরাসক্ত যৌবন। তারা ভোগবতী পার হয়ে আনন্দ-লোকের ডাঙা দেখতে পেয়েছে। তারা আর ফল চায় না, ফলতে চায়।" "আরেক যৌবনলক্ষ্মী আসছেন, মহারাজের কেশে তিনি তাঁর শুভ্র মল্লিকার

মালা পাঠিয়ে দিয়েছেন—নেপথ্যে সেই মিলনের আয়োজন চলছে।" ইহাই সেই গভীরতর যৌবনের স্বরূপ।

'পউষের পাতাঝরা তপোবনে' বিগত যৌবন বার্তা পাঠাইয়া দেয়—

লিখেছে সে—
আছি আমি অনন্তের দেশে।...
লিখেছে সে
এসো এসো চলে এসো বয়সের জীর্ণ পথশেষে
মরণের সিংহদ্বার
হয়ে এসো পার।...
শুধু আমি যৌবন তোমার
চিরদিনকার
ফিরে ফিরে মোর সাথে দেখা তব হবে বারম্বার
জীবনের এপার ওপার।[১]

বলাকার ২৫, ২৬ ও ৪৪ সংখ্যক কবিতায় এই নূতন যৌবনের, প্রৌঢ়ের যৌবনের বার্তা।

আর প্রত্যাসন্ন বার্ধক্য! তাহার সমাধান ফাল্গুনীতে। যৌবনের দল চিরন্তন বৃদ্ধকে ধরিবার জন্য বিশ্বের রহস্য-গুহার মধ্যে ত[illegible]ইয়া গেল—সেখান হইতে যাহাকে টানিয়া বাহির করিল, সে চিরন্তন বৃদ্ধ নয়, চিরন্তন যুবক, তাহাদেরই দলপতি জীবন সর্দার। যৌবনের দলকে সে চালাইয়া লইয়া যায়। যৌবনের দলপতি জীবন সর্দার, তাহার কাজ বিপদ হইতে বিপদে চালনা করা। এই প্রতীকটীর অর্থ কি আর স্পষ্ট করিবার প্রয়োজন আছে? জীবনের আকর্ষণে যৌবন বিপদের মুখে স্বতঃই অগ্রসর হইযা চলে। তবে বার্ধক্য কোথায়?

---

১ বলাকা ১৩

ঋতুর নাট্যে বৎসরে বৎসরে শীত-বুড়োটার ছদ্মবেশ খসিয়ে তার বসন্ত-রূপ প্রকাশ করা হয়, দেখি পুরাতনটাই নূতন।

আবার—

বিশ্বের মধ্যে বসন্তের যে লীলা চলেছে আমাদের প্রাণের মধ্যে যৌবনের সেই একই লীলা।

তবে বুড়ো কোথায়? এই প্রশ্নের উত্তরে গুহা হইতে সদ্যবহির্গত জীবন সর্দার বলিল—'কোথাও তো নেই।' 'তবে সে কি?' 'সে স্বপ্ন।'

শীতের অন্তে বসন্ত; যৌবনের অন্তে প্রৌঢ়দের নূতনতর যৌবন; আর বার্ধক্য—সে স্বপ্নমাত্র। ইহাই ফাল্গুনীর প্রতিপাদ্য ও সমাধান।

অপসরণশীল যৌবন ও প্রত্যাসন্ন বার্ধক্য কবির মনে যে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করিয়াছিল, বলাকা ও ফাল্গুনীতে এই ভাবে তাহার সমাধান তিনি করিলেন। "তোদের ভয় নেই এ আমি ছিন্ন করব—এর ওষুধ আমার অন্তরেই আছে।"

অন্তরের সাধনায় স্পর্শমণির দ্বারা কবি সমস্ত উজ্জ্বল করিয়া তুলিলেন—অস্বাভাবিকতার বিভীষিকাজাল ছিন্ন হইয়া গেল, কবি আবার স্বীয় প্রতিভার ক্ষেত্রে ফিরিয়া আসিলেন। বলাকা-ফাল্গুনীর পর্বে কবির মানসিক স্বাভাবিকতার পুনঃ সূত্রপাত। ডাকঘর নাটক এই স্বভাববিরুদ্ধ পর্বের বিশিষ্ট একটি রচনা।

এই সময়ের প্রধান তিনটি যে লক্ষণ, মৃত্যুর উৎকট আকাঙ্খা, অনির্দিষ্ট সুদূরের জন্য আগ্রহ আর প্রবাসবেদনার কাতরতা—ডাকঘর নাটক এই তিনটি মনোভাবের সম্মিলিত সৃষ্টি। অমল-চরিত্র এই তিনটি উপাদানে গঠিত —এতদধিক চতুর্থ কোনো উপাদান তাহাতে নাই।

এখন, এই নাটকে উল্লিখিত 'চিঠি' ও 'ডাকঘর' কি? বলা বাহুল্য চিঠি ও ডাকঘর প্রতীক। কিসের প্রতীক? প্রতীক হিসাবে চিঠির উল্লেখ রবীন্দ্র-সাহিত্যে বিরল নহে। তাঁহার মতে চিঠির মধ্যে দুটি ভাব আছে, একটি রহস্য আর দ্বিতীয়টি হইতেছে ওই ক্ষুদ্র পত্রপুটকে অবলম্বন করিয়া সুদূরের নিকট আগমন। যে চিঠি প্রতীক নয়, নিতান্ত লৌকিক, তাহার মধ্যেও এ দুটি ভাব নিহিত। অথবা লৌকিক চিঠিতে এ দুটি ভাব আছে বলিয়াই প্রয়োজন অনুসারে তাহাকে প্রতীক রূপে ব্যবহার করা সম্ভব হয়।

চিঠির এই মোহ-রহস্যের উল্লেখ কবির পত্রে কোনো কোনো স্থানে আছে—

পৃথিবীতে অনেক মহামূল্য উপহার আছে, তার মধ্যে সামান্য চিঠিখানি কম জিনিস নয়। চিঠির দ্বারা পৃথিবীতে একটা নূতন আনন্দের সৃষ্টি হয়েছে। আমরা মানুষকে দেখে যতটা লাভ করি, তার সঙ্গে কথাবার্তা কয়ে যতটা লাভ করি, চিঠিপত্র দ্বারা আরো একটা বেশি কিছু পেয়ে থাকি। চিঠিপত্রে যে আমরা কেবল প্রত্যক্ষ আলাপের অভাব দূর করি তা নয়, ওর মধ্যে আরও একটু রস আছে যা প্রত্যক্ষ দেখাশোনায় নেই। এই কারণে, চিঠিতে মানুষকে দেখ্‌বার এবং পাবার জন্য আরো একটা যেন নতুন ইন্দ্রিয়ের সৃষ্টি হয়েছে।··· আমার বোধ হয় ওই লেফাফার মধ্যে একটি সুন্দর মোহ আছে—লেফাফাটি চিঠির প্রধান অঙ্গ—ওটা একটা মস্ত আবিষ্কার।[১]

আবার—

দূরে থাকার একটা প্রধান সুখ হচ্ছে চিঠি—দেখাশোনার সুখের চেয়েও তার একটু বিশেষত্ব আছে।···বাস্তবিক মানুষে মানুষে দেখাশোনার পরিচয়

১ ছিন্নপত্র—৮ই মার্চ, ১৮৯৫

একটু স্বতন্ত্র—তার মধ্যে একরকমের নিবিড়তা গভীরতা একপ্রকার বিশেষ আনন্দ আছে।...১

এ দুটিই লৌকিক চিঠি সম্বন্ধে। কিন্তু দেখিতে পাওয়া যাইবে যে পত্র ক্রমে প্রতীক হইয়া উঠিতেছে এবং প্রতীক হইয়া লৌকিকরস হারায় নাই, বরঞ্চ সে রস আরও প্রগাঢ় হইয়া উঠিয়াছে।

প্রত্যহ প্রভাতে ঘুম হইতে উঠিবামাত্র আমার কেমন মনে হইত, যেন দিনটাকে একখানি সোনালী-পাড়-দেওয়া নূতন চিঠির মত পাইলাম। লেফাফা খুলিয়া ফেলিলে যেন কী অপূর্ব খবর পাওয়া যাইবে।২

রবীন্দ্রনাথের কাব্যে প্রতীক-চিঠির উল্লেখ বহুত্র আছে—তন্মধ্যে উৎসর্গের ১১শ সংখ্যক কবিতা এবং পূরবীর 'হে ধরণী কেন প্রতিদিন' বিশেষ-ভাবে উল্লেখযোগ্য। অমলের রাজার চিঠির সঙ্গে ইহাদের প্রভেদ নাই—একই ডাকহরকরা তাহাদের বহন করিয়া আনিয়াছে; রহস্য ও সুদূরময়তা ইহাদের প্রধান অঙ্গ। যে-সুদূরের জন্য অমলের মন লালায়িত, সেই সুদূরই যেন ওই পত্রপুটের শিশিরকণায় প্রতিবিম্বিত নীলিমা রূপে তাহার হাতে ধরা দিবার জন্য আসিয়াছে। অমলের কাছ হইতে সুদূর, এ যেমন রহস্যের একটা দিক, তেমনি আবার সুদূরের কাছ হইতে অমল, আর-একটা দিক; সেই দিকের বাণীবহ প্রতীক ওই চিঠি।

আর চিঠির প্রতীকটিকে একটি বাস্তব-পারিপার্শ্বিক দিয়া সজীব করিয়া তুলিবার জন্য 'ডাকঘরটির' অবতারণা। ইহারই আনুষঙ্গিকভাবে ডাকহরকরাকে দেখিতে হইবে। অমলের মতে তাহার প্রধান রহস্য ও সুখ এই যে, সে

১ ছিন্নপত্র, ১

২ বাহিরে যাত্রা, জীবনস্মৃতি

সুদূর ও নিকটের মধ্যে নিরন্তর দৌত্য করিতেছে; অমল যে-সুখ হইতে বঞ্চিত, তাহা ওই লোকটির নিত্যকার পেশা। অমল যেন নিজের আকাঙ্ক্ষাকে ওই লোকটির মধ্যে ভ্রাম্যমাণ দেখিতে পায়।

এখন আর একটা প্রধান প্রশ্ন এই যে, রাজ-কবিরাজের আগমনে অমলের ধীরে ঘুমাইয়া পড়াটা কি? মৃত্যু? না কোনো রকমের প্রতীক-নিদ্রা? রাজা আসিয়া ডাকিলেই অমল জাগিয়া উঠিবে এই সূত্র ধরিয়া কেহ কেহ ইহাকে খৃষ্টীয় Resurrection জাতীয় কিছু মনে করিয়াছেন।

ইহা যে মৃত্যু নয় তাহা নিশ্চিত করিয়া বলা যায়। কারণ মৃত্যুকে জীবনের চূড়ান্ত অবসান হিসাবে কোনো তত্ত্বনাট্যে রবীন্দ্রনাথ ব্যবহার করেন নাই; এরকম মতবাদ তাঁহার তত্ত্বের বিরোধী। বিশেষ অমল তো মরে নাই; স্পষ্টই উল্লিখিত আছে রাজার ডাকের অপেক্ষায় ঘুমাইয়া পড়িয়াছে মাত্র।

ইহাকে মৃত্যু বলিয়া মনে করার চেয়ে এক রকমের প্রতীক-নিদ্রা মনে করা অধিকতর সঙ্গত। কারণ কবির কাব্যে বহুস্থানে এই নিদ্রা-প্রতীকের ব্যবহার আছে। আকাঙ্ক্ষিতের জন্য যখন রাত্রি জাগিয়া বিরহিণী ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, সেই নিদ্রাকে সার্থক করিয়া আকাঙ্ক্ষিত আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন—এরূপ ভাব রবীন্দ্রকাব্যে অবিরল।

খেয়ার 'মুক্তিপাশ' কবিতা এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বিরহিণী বলিতেছে—

ওগো নিশীথে কখন এসেছিলে তুমি
কখন যে গেছ বিহানে
তাহা কে জানে।

তাঁহার আসিবার আগে অমলের ঘরটির মতই বিরহিণীর

রুদ্ধ আছিল আমার এ গেহ,

অমলও তাহার মতো জাগিয়া উঠিলে বলিতে পারিত, কিম্বা নিশ্চিত থাকিতে পারি যে জাগিয়া উঠিয়া সে বলিবে—

আজ নয়ন মেলিয়া এ কি হেরিলাম
বাধা নাই কোনো বাধা নাই—
আমি বাঁধা নাই।...
দেখিনু কে মোর আগল টুটিয়া
ঘরে ঘরে যত দুয়ার জানালা
সকলি দিয়েছে খুলিয়া—

অমলের মতোই তাহার—

রুদ্ধদুয়ার ঘরে কতবার
খুঁজেছিল মন পথ পালাবার—১

সত্যই তো রাজ-কবিরাজ আসিয়া ক্ষুদ্রতর কবিরাজের আদেশে বন্ধ অমলের ঘরের সমস্ত জানালা খুলিয়া দিয়াছেন—এখন স্বয়ং রাজা আসিয়া ডাকিলে তাহার শেষ বন্ধনও খসিয়া পড়িবে। তিনি অমলকে সঙ্গে করিয়া বাহির হইবেন।

অমলের নিদ্রা ও এইসব নিদ্রা মূলতঃ এক; তবে গীতিকবিতায় যাহা একতন্ত্রী, নাটকের ঘটনার দাবিতে তাহাকে বিচিত্রতর, পূর্ণতর করিয়া দেখানো হইয়াছে, প্রভেদ মাত্র ইহাই।

এই নিদ্রা বা মৃত্যু খৃষ্টীয় Resurrection কি না? Resurrection যদি একমাত্র মৃত্যুর পরেই সম্ভব হয়, তবে ইহা নিশ্চয় Resurrection নয়, কিন্তু

১ খেয়া

পুনর্জীবন যদি এ জীবনেই লভ্য হয়, জীবনের হীনতর অংশ ভস্মীভূত হইয়া মহত্তর অংশ উদ্ভূত হয়—তবে ইহাকে Resurrection মনে করিতে আপত্তি নাই, কারণ তখন Resurrection ও পূর্বোক্ত প্রতীক-নিদ্রায় আর কোনো ভেদ থাকে না।

The Post Office-এর ভূমিকায় কবি ইয়েট্স্ তাঁহার মত প্রকাশ করিয়াছেন—

The deliverance sought and won by the dying child is the same deliverance which rose before his imagination, Mr. Tagore has said, when once in the early dawn he heard, amid the noise of a crowd returning from some festival, this line out of an old village song, "Ferryman, take me to the other shore of the river." It may come at any moment of life, though the child discovers it in death, for it always comes at the moment when the 'I,' seeking no longer for gains that cannot be 'assimilated with its spirit is able to say, "All my work is thine" (Sadhana pp. 162, 163).

ইয়েট্স্ যাহা বুঝিতেছেন তাহা মৃত্যু নয়, জীবন্মুক্তি জীবন্মুক্তি মৃত্যুর মুহূর্তেও লাভ করা যায় বটে, কিন্তু তখন তাহা তো আর লৌকিক অর্থে মৃত্যু নয়; অমলের মৃত্যু যদি জীবন্মুক্তিই হয় তবে তাহা জীবনেরই অঙ্গ, জীবনের অবসান নয়। মনে রাখিতে হইবে কবি শিল্পসৃষ্টি করিতে বসিয়াছেন। শিল্পের দাবি মিটাইতে গিয়া তত্ত্বের যৌক্তিক অলঙ্ঘ্য পরিণামকে অনেক সময়ে সংকুচিত করিতে হয়; তত্ত্বকে অনুসরণ করিয়া কবি যে পর্যন্ত যাইতে রাজি ছিলেন, শিল্প, বিশেষ নাট্যশিল্প, তাহার বিরোধী, সেইজন্য তিনি রাজাকে রঙ্গমঞ্চে আনিতে পারেন নাই, অমলকে জাগাইয়া তুলিতে পারেন নাই;

নাট্যরচনার বেলায় কবি শিল্পের অনুরোধে যেখানে থামিয়াছেন নাট্যসমালোচনার বেলায় সমালোচক সেখানে থামিতে বাধ্য নয়; শিল্পের দাবি স্বীকার করিয়া লইয়াও সমালোচক তত্ত্বের যৌক্তিক সীমানা নির্দেশ করিতে বাধ্য।

পূর্বেই বলিয়াছি, জীবনের এই পর্বটাতে কবি ও অমল একই আকাঙ্ক্ষা, আগ্রহ ও অস্বাভাবিকতার মধ্য দিয়া যাইতেছিলেন—অথবা কবি নিজেকেই অমলের মধ্যে প্রক্ষেপ করিয়া নিজেকে স্বতন্ত্র করিয়া দেখিতেছিলেন। আমরা দেখিয়াছি প্রচণ্ড ব্যক্তিত্ব ও সাধনার বলে কবি এই অস্বাভাবিকতা কাটাইয়া উঠিয়াছেন; তাহার কতক চিহ্ন বলাকাতে, কতক ফাল্গুনীতে। ডাকঘরের বেলাতেও ইহার ব্যতিক্রম নাই। অমলের জাগরণ নাটকের অন্তে নাই বটে, কিন্তু তাহা কবির জীবনে ঘটিয়াছে। অমল কবির জীবনে জাগিয়া উঠিয়াছে। পরবর্তী কবিই রাজকবিরাজের দ্বারা সান্ত্বনাপ্রাপ্ত, স্বয়ং রাজার দ্বারা মহত্তর জীবনে উদ্বুদ্ধ অমল; যে-সুধার ফুলের আকাঙ্ক্ষা লইয়া অমল ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, সেই সুধার ফুল নবোদ্বোধিত কবির করতলগত হইয়াছে; সুধার ফুল আর কিছুই নয়, প্রেম, মানুষের ভালবাসা। "তোদের ভয় নেই এ আমি ছিন্ন করব—এর ওষুধ আমার অন্তরেই আছে।…মৃত্যুর যে গুহার দিকে নেবে যাচ্ছিলুম তার থেকে আবার আলোকে উঠে আস্‌ব।"—এই বেদনা অমলও নিশ্চয় প্রকাশ করিতে পারিত, অন্ততঃ অনুভব যে করিত তাহাতে সন্দেহ নাই। ডাকঘরের উপসংহার লিখিত হয় নাই বটে, তাহা কবির জীবনে অভিনীত হইয়া গিয়াছে। "আমি কিছুদিন স্কুলের ছাতে শান্ত হয়ে বসে আবার আমার চিরন্তন স্বভাবকে ফিরে পাব সন্দেহ নেই।" অমলেরও এই একই আকাঙ্ক্ষা, রুগ্নতাকে কাটাইয়া চিরন্তন স্বভাবকে ফিরিয়া পাইবার। নাটকের শেষে তাহার অর্ধসমাপ্ত সাধনা ও অর্ধলব্ধ আকাঙ্ক্ষার উপরে যবনিকা পড়িয়া গিয়াছে সত্য, কিন্তু যবনিকা উঠিয়া গেলে শান্ত সমাহিত কবিকে সুস্থতর অবস্থায় ও মহত্তর জীবনে আবার ফিরিয়া পাওয়া গেল। কবি আপনাকে ও জীবনকে ফিরিয়া পাইয়াছেন, কারণ ইহার ঔষধ তাঁহার অন্তরেই ছিল।

এই নাটকে অন্যান্য যে-সব পাত্র-পাত্রী আছে তাহাদের বুঝিতে হইলে

অমলের সঙ্গে তাহাদের সম্বন্ধের দ্বারা বুঝিতে হইবে। অমলের সঙ্গে সম্বন্ধ অনুযায়ী ইহাদের তিন ভাগে ভাগ করা চলে। একদল অমলকে ভালোবাসে না, তাহারা তাহাকে বদ্ধ করিয়া রাখিতে চায়, যেমন কবিরাজ ও মোড়ল; আর একদল তাহাকে ভালোবাসে, কিন্তু ঘর হইতে বাহির হইতে দিতে নারাজ, যেমন মাধব দত্ত, দইওয়ালা, পাহারাওয়ালা, বালকগণ, সুধা; তৃতীয় দল তাহাকে ভালোবাসে এবং ঘর হইতে মুক্তি দিতে উৎসুক, যথা ঠাকুর্দা, রাজকবিরাজ।

কবিরাজ চিকিৎসাশাস্ত্র পড়িয়াছে; দেহের অতিরিক্ত আর কিছু আছে বলিয়া সে জানে না; সে জানে, অমলকে ঘরে ধরিয়া রাখিতে পারিলেই সে নিরাময় হইবে।

মোড়ল নিজের উচ্চতাকেই জগতের মাপকাঠি বলিয়া জানে। তাহার চেয়ে বড়ো, চোখে-দেখার চেয়ে বেশী তাহার জগতে কিছু নাই। শিশুর সরলতা তাহার কাছে হয় উপহাসের, নয় ঈর্ষার। অমলের মতো গরিবঘরের ছেলে রাজার চিঠির আশায় বসিয়া আছে—ইহা তাহার কাছে অসহ্য। কিন্তু অদৃষ্টের পরিহাস তাহার পরিহাসের চেয়েও কৌতূহলকর। তাহার বিদ্রূপই শেষে সত্যে পরিণত হইল; অমলকে যাহারা ভালোবাসিত তাহারা রাজার চিঠির সংবাদ দিতে পারিল না; আর মোড়লের বিদ্রূপকে সত্য করিয়া তুলিয়া রাজার চিঠি আসিয়া পৌঁছিল।

কবিরাজ ও মোড়ল দু'জনেই ফিলিস্টাইন।

মাধব দত্ত সংসারী লোক। তাহার জীবনের মধ্যে অমলের মত আকাশ-বিলাসী বিহঙ্গশিশু আসিয়া পড়িয়াছে। সংসারের ক্ষুদ্র পিঞ্জরে কেমন করিয়া সে তাহাকে আটকাইয়া রাখিবে ইহাই তাহার একমাত্র চিন্তা। সে অমলকে ভালোবাসে বটে তবে সে ভালোবাসা অমল-কেন্দ্রী নয়, আত্মকেন্দ্রী; অমলের মৃত্যুতে নিজের ঘর যে শূন্য হইবে, ইহাই যেন তাহাকে সবচেয়ে বেশী পীড়া দিতেছে। তাহার সাংসারিকতা এতই প্রবল যে রাজা আসিয়া পৌঁছিলে অমলকে ভালোমত কিছু প্রার্থনা করিতে সে শিখাইয়া দিতেছে। সে অমলকে ভালোবাসে, কিন্তু সে ভালোবাসা

জীবনের বেদনা হইতে উদ্ভূত নয়। সমাজের দাবী, সংসারের দাবী যেন সেই ভালোবাসা তাহার উপর চাপাইয়া দিয়াছে; সেইজন্য অমলকে কবি তাহার পুত্র না করিয়া পোষ্যপুত্ররূপে অঙ্কিত করিয়াছেন। সে ভালোবাসা সাংসারিক রূপের সঙ্গেই মাত্র পরিচিত, তাহার বেশী কিছুতে সে বিশ্বাস করে না; সে অবিশ্বাসী। সেইজন্য শেষ মুহূর্তে ঠাকুর্দা তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছে—'চুপ করো অবিশ্বাসী।'

দইওয়ালা, পাহারাওয়ালা, বালকগণ অমলকে ভালোবাসে, কিন্তু কবিরাজের অনুশাসনকেই তাহারা বালকের পক্ষে হিতকর বলিয়া মনে করে। অমলের মনোভাবের প্রতি তাহাদের আন্তরিক আকর্ষণ আছে। কিন্তু বাহ্যশাসনকে লঙ্ঘন করিবার ইচ্ছা তাহাদের নাই।

এমন কি সুধা, যে-সুধা অমলকে ভালোবাসে, অন্য সকলের চেয়ে বেশি করিয়া, সে-ও অমলের আধখানা খোলা দরজা, রুগ্ন অমলের একমাত্র সান্ত্বনা, বন্ধ করিয়া দিতে চায়।

ঠাকুর্দা একজন জীবন্মুক্ত পুরুষ; অমল যাহা হইলে-হইতে-পারিত ঠাকুর্দা তাহা-ই; সেইজন্য তাহার প্রতি বালকের একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ আছে।

ঠাকুর্দার মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা নাই, আবার মৃত্যুকে সে ভয়ও করে না। নিরুদ্দেশ সুদূরকে সে দেখিয়া আসিয়াছে তাই ঘরের কোণটিও তাহার কাছে কম মনোরম নয়। আর প্রবাসের বেদনা! সমস্ত জগৎটাই তাহার গৃহ হইয়া উঠিয়াছে তাহার কাছে প্রবাস কোথায়? ঠাকুর্দা এই গৃহ-কারাগারের একমাত্র সান্ত্বনা ও আশ্রয়। সে যেন অমলের দূরবীক্ষণযন্ত্র। অমল তাহার মধ্য দিয়া নিজের আকাঙ্ক্ষিত জগৎকে দেখিতে পায়।

রাজকবিরাজের তুলনায় মাধব দত্তর গৃহচিকিৎসকের কত প্রভেদ। রাজ-কবিরাজ আসিয়া রুদ্ধ দরজা জানালা খুলিয়া দিল; বাতির আলো নিভাইয়া ঘরে তারার আলো প্রবেশের পথ করিয়া দিল। তাপিত বালকের দেহ নিদ্রার অমৃত-প্রলেপে স্নিগ্ধ করিয়া দিল। রাজকবিরাজ আসন্নপ্রায় মুক্তির আভাস—আভাসে মুক্তি যদি এত মধুর, স্বয়ং মুক্তির না জানি কি স্বাদ!

ডাকঘরের সমস্ত চরিত্রই ক্ষীণতম রেখায় অঙ্কিত; ন্যূনতম অপরিহার্যকে রাখিয়া সমস্ত অবান্তর বিষয়কে বাদ দেওয়া হইয়াছে। চরিত্রসৃষ্টি ও ঘটনাসংস্থানে 'human habitation ও name'-এর ভার চাপাইয়া দিলে নাটকটির রহস্যলোক পীড়িত হইয়া ভাঙিয়া পড়িত। যে-সুদূরের জন্য অমলের চিত্ত উৎসুক, তাহার দিকে যাত্রার উপযোগী সজ্জা—সর্বভারবর্জিত ক্ষিপ্রগামী ছিপ-নৌকা, অবান্তরপীড়িত, উদ্দিষ্টলক্ষ্য, মন্থরগামী বজরা নহে।

রবীন্দ্রনাথের অল্প নাটকই আছে যাহাকে লইয়া তিনি ভাঙাগড়া করেন নাই; এই বারম্বার ভাঙাগড়া ও সংযোজনা শিল্পগত অস্বস্তির পরিচয়! কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ ডাকঘরকে তিনি স্পর্শ করেন নাই। ডাকঘর রবীন্দ্রনাথের নাটকের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন নহে, কিন্তু রবীন্দ্র-বৈশিষ্ট্যের লক্ষণ ইহাতে যথেষ্ট আছে—আকৃতির অনতিদীর্ঘতা, অবান্তরবর্জিত অপরিহার্য রেখায় চরিত্রসৃষ্টি, climax-হীন শান্তিময় পরিণাম, অস্ফুট ছায়ালোকের মোহময় রহস্য, পাত্রপাত্রীর নির্দিষ্টজাতিহীনতা এবং ইতিহাস-ও ভূগোল-বিবর্জিত কালে ও দেশে ঘটনার সংস্থান।

দু'একখানা নাটক বাদ দিলে রবীন্দ্রনাথের সব নাটকেই গান আছে। গানের বহুলতায় রবীন্দ্রনাথের নাটকের গতির স্বাভাবিক মন্থরতাকে মন্থরতর করিয়া তুলিয়াছে। এই ক্ষুদ্র নাটকে একটিও গান না থাকাতে ইহার ক্ষীণ ঘটনাস্রোত অপ্রতিহত গতিতে শান্তিপারাবারের দিকে প্রবাহিত হইতেছে; স্বভাবতই ইহার আবহাওয়া এমন রহস্যময় যে গানের দ্বারা তাহা বাড়াইয়া তুলিবার আবশ্যক হয় নাই।[১]

---

১ মৃত্যুর কয়েক বৎসর পূর্বে রবীন্দ্রনাথ ডাকঘর অভিনয়-প্রস্তাব উপলক্ষে নাটকটির স্থানে স্থানে পরিবর্তন করিয়াছিলেন, তবে তাহা উল্লেখযোগ্য নহে, এইরূপ শুনিয়াছি। ঐ সময়ে ডাকঘর নাটকের জন্য তিনি কয়েকটি গানও লিখিয়াছিলেন। কলিকাতায় অভিনয়কালেও ডাকঘর নাটকে তিনি কয়েকটি গান জুড়িয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু ডাকঘরের কোনো সংস্করণেই তিনি সে গানগুলি গ্রন্থভুক্ত করেন নাই—সুতরাং উল্লিখিত তথ্যদ্বারা আমার বক্তব্য খণ্ডিত হয় না।

অমলের 'মৃত্যু' প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের এই পত্রখণ্ড উদ্ধারযোগ্য—"ডাকঘরের অমল মরেছে বলে সন্দেহ যারা করে তারা অবিশ্বাসী—রাজবৈদ্যের হাতে কেউ মরে না, কবিরাজটা ওকে মারতে বসেছিল বটে।...১৭।২।৩৯"

ফাল্গুনী

রবীন্দ্রকাব্যপ্রবাহে বলাকার যে স্থান, রবীন্দ্রনাট্যপ্রবাহে ফাল্গুনী নাটকের সেই স্থান ও সেই গুরুত্ব। দুইখানি গ্রন্থেই রবীন্দ্রনাথের শিল্প ও জীবন মোড় ঘুরিয়াছে। অনেকে ইহাকে অপ্রত্যাশিত মনে করেন—কিন্তু মূলের গতি ও প্রকৃতি স্মরণ রাখিলে তেমন অপ্রত্যাশিত মনে হইবে না। বলাকাতে ও ফাল্গুনীতে রবীন্দ্র-জীবন পুনরায় স্বাস্থ্য ও স্বাভাবিকতা লাভ করিয়াছে। এই সময়ের পূর্ববর্তী পর্বে কয়েক বৎসর ধরিয়া কবির জীবনে একটা অস্বাভাবিকতার ভাব চলিতেছিল। ডাকঘর নাটকের আলোচনা-প্রসঙ্গে আমরা দেখিয়াছি অস্বাভাবিকতার স্বরূপটা কি। এখানে তাহার পুনর্বিবরণ দান অনাবশ্যক—ইঙ্গিত মাত্র দিলেই চলিবে।

ডাকঘর নাটকের আলোচনার ক্ষেত্রে কবির একখানি চিঠির উল্লেখ করিয়াছিলাম। সেই চিঠিখানার বিষয় পুনরায় স্মরণ করা যাইতে পারে।[১] এই চিঠিখানা কবির আত্মিক ব্যাধির পূর্ণ বিবরণ বহন করিতেছে। এই সময়ে কবি এক প্রকার আত্মিক ব্যাধিতে ভুগিতেছিলেন। তাঁহার লক্ষ্যভ্রষ্ট জীবন ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে, বাঁচিয়া থাকিবার আর প্রয়োজন নাই, এখন মৃত্যুই একমাত্র কাম্য—এইরূপ একটা ধারণা তাঁহাকে পাইয়া বসিয়াছিল। অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে এই অস্বাভাবিকতার হাত হইতে মুক্তি পাইবার একটা চেষ্টাও তাঁহার মনে ছিল। পরবর্তী চিঠিখানিতে আসন্ন মুক্তির স্বাদ রহিয়াছে।[২] কবির আত্মিক ব্যাধির অভিজ্ঞতা হইতে ডাকঘর নাটকের জন্ম; ডাকঘরের

১ চিঠিপত্র, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৭—৩২, ১৯১৫ সাল।

২ চিঠিপত্র, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩৩, ১৯১৫ সাল, জুলাই।

বালক-নায়ক কবিরই ব্যাধিগ্রস্ত স্বরূপ, ডাকঘরের মুক্তপুরুষ ঠাকুরদা কবিরই কল্পিত মুক্ত জীবনের প্রতীক।

বলাকা কাব্যে এবং ফাল্গুনী নাটকে দেখা যাইবে যে, ব্যাধিমুক্ত কবি পুনরায় জীবনের স্বাভাবিক উদারক্ষেত্রে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন।

এই আত্মিক ব্যাধিটা কি ? প্রত্যেক মানুষেরই জীবনে, বিশেষ যাঁহারা কল্পনাপ্রবণ আদর্শনিষ্ঠ পুরুষ, তাঁহাদের জীবনে প্রৌঢ় বয়সে এমন একটা অস্বাভাবিকতার সময় আসিয়া থাকে। তখন তাঁহারা দেখিতে পান যে, 'এতকাল নদীকূলে, যাহা লয়ে ছিনু ভুলে'—সমস্তই যেন ব্যর্থ হইতে চলিয়াছে। বস্তুতঃ ইহা সত্য না হইতেও পারে, কিন্তু ঐরূপই তাঁহাদের ধারণা হইয়া থাকে। ইহাকে প্রৌঢ় বয়সের গোধূলি সময়েব অনিশ্চয়তা বলা যায়। মনীষী ব্যক্তিরা সাধনবেগে এই সময়টাকে উত্তীর্ণ হইয়া নূতন স্বস্তি, নূতন শান্তি এবং নবতব ভাবসাম্যের ক্ষেত্রে উপনীত হন। ববীন্দ্রনাথও হইয়াছেন। তাঁহার পক্ষে সেই নূতন ক্ষেত্র বলাকা ও ফাল্গুনী। দু'টি রচনাই সমসাময়িক।

এই ব্যাধিব পূবে রবীন্দ্রনাথের মনে হইয়াছিল যে, তাঁহাব দেহগত যৌবন তো অপনীত হইল—কিন্তু তার পরিবর্তে নূতন কোন স্বাদ, মহত্তব কোন ইঙ্গিত তো জীবনে উপনীত হইল না। এই প্রসঙ্গে পূর্ববর্তী কয়েক বৎসরের তাঁহার জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতা স্মরণ রাখা আবশ্যক। স্ত্রী-বিয়োগ, পুত্র ও কন্যা বিয়োগ, নিজের শারীরিক পীড়াদায়ক ব্যাধি—যাহার সঙ্গে রহিয়াছে আসন্ন বার্ধক্যের প্রসারিত-প্রায় ছায়া। চল্লিশেব কোঠা হইতে যেদিন যৌবনকে বিদায় দিয়াছিলেন, সেটা ছিল কল্পনার ব্যাপার। কিন্তু বাস্তবে সেই মুহূর্ত যখন আসন্ন হইয়া উঠিল, তখন আর তেমন প্রসন্ন মনে বলিতে পারিলেন না—'যারে সোনার জন্ম নিয়ে, সোনার মৃত্যুপারে।' বরঞ্চ যৌবনকেই আঁকড়াইয়া ধরিবার একটা ইচ্ছা যেন তিনি অনুভব করিলেন। কিন্তু তেমন ইচ্ছা তো সফল হইবার নয়। দেহের যৌবনের চলিয়া যাওয়াই তো ধর্ম, তাহাকে রাখিতে গেলেও থাকিবে না। তখন এই অবস্থায় দেহের যৌবনের বিকল্প অনুসন্ধানে তিনি ব্যস্ত হইলেন। যতদিন এই বিকল্পের সন্ধান

তিনি পান নাই, ততদিন তাঁহার মন সুস্থ হয় নাই, ততদিন তাঁহার জীবনে অশান্তি ও অস্বাভাবিকতা ছিল। ইহাই তাঁহার ব্যাধি। ডাকঘরে এই ব্যাধির পরিচয়। বলাকা ও ফাল্গুনীতে তাঁহার ব্যাধিমুক্তি, কারণ তখন তিনি দৈহিক যৌবনের বিকল্পের সন্ধান পাইয়াছেন, তখন তিনি দৈহিক যৌবনের বিকল্পকে আবিষ্কার করিয়া অলকানন্দার সুদৃঢ় পাষাণ ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইতে সমর্থ হইয়াছেন। বলাকা ও ফাল্গুনী বিকল্প যৌবন বা প্রৌঢ়ের যৌবনের কাব্য। "প্রৌঢ়দের যৌবনটিই নিরাসক্ত যৌবন। তারা ভোগবতী পার হ'য়ে আনন্দ-লোকের ডাঙা দেখতে পেয়েছে। তারা আর ফল চায় না, ফলতে চায়।"[১] এ দু'খানি বই নিরাসক্ত যৌবনের আনন্দলোকের কাব্য।

দৈহিক যৌবনের বিদায় ও নিরাসক্ত যৌবনের আবির্ভাব ফাল্গুনী নাটকের সূচনায় সুন্দরভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। তাহার বিশদ আলোচনার পূর্বে বলাকা কাব্যের প্রাসঙ্গিক অংশ স্মরণ করা যাইতে পারে।

পউষের পাতা-ঝরা তপোবনে
আজি কী কারণে
টলিয়া পড়িল আসি বসন্তের মাতাল বাতাস ;

. . .

বহুদিনকার
ভুলে-যাওয়া যৌবন আমার
সহসা কী মনে ক'রে
পত্র তার পাঠায়েছে মোরে

.

লিখেছে সে
আজি আমি অনন্তের দেশে

১ সূচনা, ফাল্গুনী, রঃ রচনাবলী, ১২শ খণ্ড।

লিখেছে সে
এসো এসো চলে এসো বয়সের জীর্ণপথ শেষে
মরণের সিংহদ্বার
হ'য়ে এসো পার।

. . .

শুধু আমি যৌবন তোমার
চিরদিনকার,
ফিরে ফিরে মোর সাথে দেখা তব হবে বারম্বার
জীবনের এপার ওপার।১

কবি বলিতে চান, বয়োধর্মেই দৈহিক যৌবন গত হয় বটে, কিন্তু একেবারে বিলুপ্ত হয় না, সে যৌবন নবতর মূর্তিতে, দিব্যরূপে অপেক্ষা করিয়া থাকে, তারপরে মানুষ যখন 'মরণের সিংহদ্বার' অতিক্রম করে, তখন যৌবনের বরমাল্য সে পুনরায় লাভ করে।

এই আশ্বাসে সান্ত্বনা থাকিলেও সে সান্ত্বনা সুদূরপরাহত ; কেন না, 'মরণের সিংহদ্বার' অতিক্রম করিতে না পারা অবধি পুরাতন যৌবনকে নূতনভাবে লাভ করাতো চলিবে না।

আর একটি কবিতায় দেখিতেছি কবি আরও অনেকটা অগ্রসর হইয়া গিয়াছেন—

যে-বসন্ত একদিন করেছিল কত কোলাহল
লয়ে দলবল
আমার প্রাঙ্গণ তলে—

. . .

সে আজ নিঃশব্দে আসে আমার নির্জনে…২

১ বলাকা, ১৩শ সংখ্যক কবিতা।
২ বলাকা, ২৫ সংখ্যক কবিতা।

এখানে দেখা যাইতেছে যে, নিরাসক্ত যৌবনকে লাভ করিবার জন্য মরণের সিংহদ্বার পার হইবার আর প্রয়োজন নাই। নিরাসক্ত যৌবন অপেক্ষা করিয়া না থাকিয়া নিজেই অগ্রসর হইয়া কবির কাছে আসিয়াছে। নিরাসক্ত যৌবনের বিবর্তনের ইতিহাসে কবি এখানে আরও এক ধাপ অগ্রসর হইয়া গিয়াছেন। এই বিবর্তনের ইতিহাসের পূর্ণ পরিণতি ফাল্গুনী নাটক। এই দুই যৌবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী স্বতন্ত্র। দৈহিক যৌবনের অধিষ্ঠাত্রী উর্বশী, আর নিরাসক্ত যৌবনের অধিষ্ঠাত্রী লক্ষ্মী।

২

কবির ব্যক্তিগত বেদনা কিভাবে ফাল্গুনী নাটকের সূচনার কাহিনীতে রূপান্তরিত হইয়াছে এবারে তাহা বিচার করা যাইতে পারে। ইক্ষ্বাকুবংশের এক রাজা একদিন সন্ধ্যায় মাথায় একটি পাকা চুল দেখিয়া হতাশ হইয়া পড়িলেন, বুঝিলেন যে, মৃত্যুর পত্র বহন করিয়া ঐ পাকা চুলটি আসিয়াছে। বার্ধক্যের ঐ পরওয়ানা দেখিয়া জীবন সম্বন্ধে তিনি বিতৃষ্ণা অনুভব করিলেন। জরুরী রাজকার্যে আর তাঁহার মন বসিল না। তিনি শ্রুতিভূষণের সাহচর্যে বৈরাগ্য-সাধন করিতে মনস্থ করিলেন। এমন সময়ে তাঁহার রাজকবি আসিয়া রাজাকে বলিলেন যে, বৈরাগ্যসাধনের প্রকৃত সহায় তিনিই হইতে পারেন। কবি বলিলেন যে, কবিরাই প্রকৃত বৈরাগী; কারণ সংসারটাকে তাঁহারা পথ বলিয়া মনে করেন, সংসারকে নিত্য মনে করিয়াও, তাহার দাবীদাওয়া পালন করিয়াও তাহাকে বর্জন করিতে শেখাই প্রকৃত বৈরাগ্য। কবি আরও বলিলেন, যে পাকা চুলটি দেখিয়া রাজা ভগ্নহৃদয় হইয়া পড়িয়াছেন, সেই পাকা চুলের ভূমিকার উপরেই নূতন যৌবনের মল্লিকার মালা স্থাপিত হইবে।

কবি বলিলেন—

১ বলাকা, ২৩শ সংখ্যক কবিতা।

মহারাজ, এ যৌবন ম্লান যদি হ'ল তো হোক না। আরেক যৌবন-লক্ষ্মী আসছেন, মহারাজের কেশে তিনি তাঁর শুভ্র মল্লিকার মালা পাঠিয়ে দিয়েছেন, নেপথ্যে সেই মিলনের আয়োজন চলছে।

কবির উক্তিতে রাজা ভাবিলেন যে, তাঁহার বৈরাগ্যসাধনের সংকল্প বুঝি বা বিচলিত হয়, তিনি শ্রুতিভূষণকে ডাকিতে আদেশ করিলেন। ইহা শুনিয়া কবি বলিলেন,

তাঁকে কেন মহারাজ?

—বৈরাগ্যসাধন করবো।

—সেই খবর শুনেই তো ছুটে এসেছি, এ সাধনায় আমিই তো আপনার সহচর।

—তুমি?

—হাঁ, মহারাজ, আমরাই তো আছি পৃথিবীতে মানুষের আসক্তি মোচন করবার জন্য।

—বুঝতে পারলুম না।

—এতদিন কাব্য শুনিয়ে এলুম, তবু বুঝতে পারলেন না? আমাদের কথার মধ্যে বৈরাগ্য, সুরের মধ্যে বৈরাগ্য, ছন্দের মধ্যে বৈরাগ্য। সেই জন্যই তো লক্ষ্মী আমাদের ছাড়েন, আমরাও লক্ষ্মীকে ছাড়বার জন্যে যৌবনের কানে মন্ত্র দিয়ে বেড়াই।

—তোমাদের মন্ত্রটা কি?

—আমাদের মন্ত্র এই যে, ওরে ভাই ঘরের কোণে তোদের থলি থালি আঁকড়ে বসে থাকিস নে, বেরিয়ে পড় প্রাণের সদর রাস্তায়, ওরে যৌবনের বৈরাগীর দল।

—সংসারের পথটাই বুঝি বৈরাগ্যের পথ হ'ল?

—তা নয় তো কি মহারাজ? সংসারে যে কেবলি সরা কেবলি চলা;

তারই সঙ্গে সঙ্গে যে লোক একতারা বাজিয়ে নৃত্য করতে করতে কেবলি সরে, কেবলি চলে, সেই তো পথিক, সেই তো কবি বাউলের চেলা।

কবি বুঝাইলেন যে, নিবাসক্ত যৌবন কর্মকে নিরাসক্তভাবে গ্রহণ করিতে শেখায়, আর নিরাসক্তভাবে কর্মকে গ্রহণ করাই তো প্রকৃত বৈরাগ্য।

কবির উপদেশে রাজার জীবন-তৃষ্ণা ফিরিয়া আসিল। যে-দুর্ভিক্ষকাতর প্রজার দল অন্ন প্রার্থনায় রাজসমীপে আসিয়াছিল, তাহাদের প্রতি রাজা কর্তব্য পালনে সচেতন হইলেন। পরে রাজার আদেশে কবি রাজসভাতে ফাল্গুনীর গীতিনাটিকা অভিনয়ের আয়োজন করিলেন।

কবির উপদেশে রাজার জীবন-তৃষ্ণা ফিরিয়া আসিল বটে; কিন্তু সে তৃষ্ণা ঠিক পূর্ববর্তী তৃষ্ণা আর হইল না। পূর্ববর্তী যৌবনের মধ্যে সম্ভোগের ইচ্ছাটাই প্রবল ছিল, এবারে যে মহত্তর যৌবনের পালা আরম্ভ হইল, তাহার মধ্যে ত্যাগের ইচ্ছাটাই প্রবল। ত্যাগ মানে ছাড়া নয়, 'ছাড়তে ছাড়তে পাওয়া।' ত্যাগের দৃষ্টিতে জীবনকে দেখিলে জীবনের কর্তব্য পালন সহজ হইয়া আসে।

নদী কেমন করে ভার বহন করে দেখেছেন তো? মাটির পাকা রাস্তা হ'ল যাকে বলেন ধ্রুব, তাই তো ভারকে সে কেবলি ভারি করে তোলে; বোঝা তার উপর দিয়ে আর্তনাদ করতে করতে চলে, আর তারও বুক ক্ষতবিক্ষত হ'য়ে যায়। নদী আনন্দে বয়ে চলে, তাইতো সে আপনার ভার লাঘব করছে বলেই বিশ্বের ভার লাঘব করে। আমরা ডাক দিয়েছি সকলের সব সুখদুঃখকে চলার লীলায় বয়ে নিয়ে যাবার জন্যে। আমাদের বৈরাগীর ডাক।

কবির মতে দৈহিক যৌবন পথ, আর প্রৌঢ়ের নিরাসক্ত যৌবন নদী। একটির ধর্ম সুখ বা সম্ভোগ, আর একটির ধর্ম আনন্দ বা ত্যাগ। এই ধর্মকে যে গ্রহণ করিতে পারে সেই তো বৈরাগী। জীবনধর্ম পালনই যথার্থ বৈরাগ্য সাধন।

নিরাসক্ত বা মহত্তর যৌবনের মধ্যে একটি বৃহৎ কর্মের আহ্বান আছে। এই কর্ম সাধনাতেই মানুষের মুক্তি। বৃহৎ কর্ম সাধনার জন্যে প্রয়োজন বীর্যের—বৈরাগীই প্রকৃত বীর। কবিশেখরের ভাষায়—

যারা অপর্যাপ্ত প্রাণকে বুকের মধ্যে পেয়েছে বলেই জগতের কিছুতে যাদের উপেক্ষা নেই,জয় করে তারা, ত্যাগ করেও তারাই, বাঁচতে জানে তারা, মরতেও জানে তারা, তারা জোরের সঙ্গে দুঃখ পায়, তারা জোরের সঙ্গে দুঃখ দূর করে, সৃষ্টি করে তারাই, কেন না তাদের মন্ত্র আনন্দের মন্ত্র, সবচেয়ে বৈরাগ্যের মন্ত্র।

ফাল্গুনী নাটকের বাউল বলিয়াছে—যুগে যুগে মানুষ লড়াই করছে, আজ ব—ন্তের হাওয়ায় তারি ঢেউ।…যারা ম'রে অমর, বসন্তের কচি পাতায় তারাই পত্র পাঠিয়েছে। দিগ্‌দিগন্তে তারা রটাচ্ছে—আমরা পথের বিচার করিনি, আমরা পাথেয়ের হিসাব রাখিনি, আমরা ছুটে এসেছি, আমরা ফুটে বেরিয়েছি। আমরা যদি ভাবতে বসতুম তাহ'লে বসন্তের দশা কি হ'ত ?

এবারে রবীন্দ্রনাথ কি বলিতেছেন দেখা যাক— ফাল্গুনীর গোড়াকার কথাটা হচ্ছে এই যে, যুবকেরা বসন্ত উৎসব করতে বেরিয়েছে। কিন্তু এ উৎসব তো শুধু আমোদ নয়, এ তো অনায়াসে হবার জো নেই। জরার অবসাদ, মৃত্যুর ভয় লঙ্ঘন ক'রে তবে সেই নবজীবনের আনন্দে পৌছানো যায়। তাই যুবকেরা বল্‌লে, আনবো সেই জরা বুড়োকে বেঁধে, সেই মৃত্যুকে বন্দী ক'রে। মানুষের ইতিহাসে তো এই লীলা, এই বসন্তোৎসব বারে বারে দেখ্‌তে পাই। জরা সমাজকে ঘনিয়ে ধরে, প্রথা অচল হ'য়ে বসে, পুরাতনের অত্যাচার, নূতন প্রাণকে দলন করে নির্জীব করতে চায়, তখন মানুষ মৃত্যুর মধ্যে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে, বিপ্লবের ভিতর দিয়ে নব বসন্তের উৎসবের আয়োজন করে। সেই আয়োজনই তো য়ুরোপে চলছে। সেখানে নূতন যুগের বসন্তের হোলি খেলা আরম্ভ হ'য়েছে। মানুষের ইতিহাস আপন

চিরনবীন অমর মূর্তি প্রকাশ করবে বলে মৃত্যুকে তলব করেছে। মৃত্যুই তার প্রসাধনে নিযুক্ত।১

সমসাময়িক বলাকা কাব্যের উক্ত ভাবদ্যোতক কবিতাগুলি এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়।২

মহত্তর যৌবনের কর্মসাধনায় আপাতদৃষ্টিতে উন্মত্ততা থাকিলেও তাহার পরিণামে একটি শান্তি ও স্নিগ্ধ সাফল্য বিরাজিত, কারণ ইহার অধিষ্ঠাত্রী দেবী লক্ষ্মী—একথা পূর্বেই বলিয়াছি। কাজেই মহত্তর যৌবনের অধিষ্ঠাত্রী শেষ পর্যন্ত কর্ম সাধনার গতিকে

···ফিরাইয়া আনে
অশ্রুর শিশির স্নানে
স্নিগ্ধ বাসনায়,
হেমন্তের হেমকান্ত সফল শান্তির পূর্ণতায় ;
ফিরাইয়া আনে
নিখিলের আশীর্বাদ পানে······

ফিরাইয়া আনে ধীরে
জীবন মৃত্যুরে
পবিত্র সঙ্গমতীর্থ তীরে
অনন্তের পূজার মন্দিরে।৩

এ পর্যন্ত যাহা বলিলাম তাহাতে বুঝিতে পারা যাইবে যে, কবি নিজের

১ আত্মপরিচয়, ৩, পৃঃ ৭১
২ বলাকা, কবিতা সংখ্যা ৪৪, ৪৫, সবুজের অভিযান, সর্বনেশে, আহ্বান, পাড়ি
৩ বলাকা, কবিতা সংখ্যা ২৩

জীবনবেদনাকে রাজার জীবনে প্রক্ষেপ করিয়া একটি সমাধানে পৌঁছাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। সে সমাধানটি হইতেছে যে, দৈহিক যৌবন গত হইলেই মানুষের আশা ভরসা, উৎসাহ উদ্যম অন্তর্হিত হইবার কারণ নাই। বরঞ্চ নূতন যৌবনলক্ষ্মী প্রদত্ত মহত্তর যৌবনের কৃপায় জীবনকে গভীরভাবে উপলব্ধি করিবার ক্ষমতা তখন মানুষের জন্মে। জীবনকে গভীরভাবে উপলব্ধি বলিতে রবীন্দ্রনাথ নিরাসক্তভাবে কর্মসাধনা বুঝিয়া থাকেন। ইক্ষ্বাকুবংশের রাজা কবির উপদেশে বিষাদ হইতে মুক্তি পাইয়াছিলেন; অবসাদগ্রস্ত অর্জুনও নিরাসক্তভাবে কর্ম সাধনার উপদেশে জড়তা হইতে মুক্তি পাইয়াছিলেন; বর্তমান কবি মুক্তি পাইয়াছেন কি? তাঁহার পরবর্তী কাব্যসাধনার ও কর্মসাধনার যে চিহ্ন বর্তমান তাহাতে মনে হয় যে, এই মুক্তির দিকেই তিনি অগ্রসর হইয়া গিয়াছেন। অন্ততঃ যে জড়তা ও বিষাদ কয়েক বৎসর ধরিয়া তিনি ভোগ করিতেছিলেন, তাহাদের কবল হইতে তিনি মুক্ত হইয়াছেন।

৩

কবির উপদেশে রাজার জীবনে বিতৃষ্ণা ঘুচিলে ফাল্গুনের দিনে কোন কিছু একটা অভিনয়ের ব্যবস্থা করিতে রাজা কবিকে অনুরোধ জানাইলেন। কবি রাজসভায় ফাল্গুনী গীতিনাট্যের আয়োজন করিলেন। এই নাটকে যে সমস্যার অবতারণা করা হইয়াছে তাহা রাজার জীবনসমস্যার অনুরূপ। কবি রাজাকে বুঝাইলেন যে, রাজার নিজের বা যে-কোন মানুষের জীবনে যে লীলা চলিতেছে বিশ্বেও সেই লীলাই অভিনীত হইতেছে। নাট্যের বিষয় সেই বিশ্বলীলা। তাহা হইলে দেখা গেল যে রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত জীবনে যে-সমস্যা রাজার জীবনেও সেই সমস্যা—আবার সেই সমস্যাই রূপান্তরে বিশ্বজীবনে। এইভাবে রাজার জীবনের সূত্রে রবীন্দ্রনাথের বা যে-কোন মানুষের জীবন বৃহত্তর বিশ্বজীবনের সহিত সম্পৃক্ত হইয়া পড়িয়াছে

এবার দেখা যাক, বিশ্বজীবনে কোন সমস্যার সমাধান হইতেছে, বা কোন লীলার অভিনয় হইয়া চলিয়াছে। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ একখানি পত্রে লিখিতেছেন—

ফাল্গুনীর ভিতরকার কথাটি এতই সহজ যে, ঘটা করে তার অর্থ বোঝাতে সঙ্কোচ হয়। জগৎটার দিকে চেয়ে দেখলে দেখা যায় যে, যদিচ তার উপর দিয়ে যুগ যুগ চলে যাচ্ছে তবু সে জীর্ণ নয়, আকাশের আলো উজ্জ্বল, তার নীলিমা নির্মল। ধরণীর মধ্যে রিক্ততা নেই, শ্যামলতা অম্লান, অথচ খণ্ড খণ্ড করে দেখতে গেলে দেখি ফুল ঝরছে, পাতা শুকচ্ছে, ডাল মরছে। জরা মৃত্যুর আক্রমণ চারদিকেই দিনরাত চলেছে, তবুও বিশ্বের চিরনবীনতা নিঃশেষ হল না। Facts-এর দিকে দেখি জরা মৃত্যু, Truth-এর দিকে দেখি অক্ষয় জীবন যৌবন। শীতের মধ্যে এসে যে মুহূর্তে বনের সমস্ত ঐশ্বর্য দেউলে হল বলে মনে হল সেই মুহূর্তেই বসন্তের অসীম সমারোহ বনে বনে ব্যাপ্ত হয়ে পড়লো। জরাকে মৃত্যুকে ধরে রাখতে গেলেই দেখি, সে আপন ছদ্মবেশ ঘুচিয়ে প্রাণের জয়পতাকা উড়িয়ে দাঁড়ায়। পিছন দিক থেকে যেটাকে জরা বলে মনে হয়, সামনের দিক থেকে সেটাকেই দেখি যৌবন। তা যদি না হত, তাহলে অনাদিকালের এই জগৎটা আজ শতজীর্ণ হয়ে পড়তো, এর উপরে যেখানেই পা দিতুম ধ্বসে যেতো। বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে প্রতি ফাল্গুনে চিরপুরাতন এই যে চির নূতন হয়ে জন্মাচ্ছে, মানুষ প্রকৃতির মধ্যেও সে লীলা চলেছে। প্রাণশক্তিই মৃত্যুর ভিতর দিয়ে আপনাকে বারে বারে নূতন করে উপলব্ধি করছে। যা চিরকালই আছে তাকে কালে কালে হারিয়ে হারিয়ে না যদি পাওয়া যায় তবে তার উপলব্ধিই থাকে না। ফাল্গুনীর যুবক দল প্রাণের উদ্দামবেগে প্রাণকে নিঃশেষ করেই প্রাণকে অধিক করে পাচ্ছে। সর্দার বলছে ভয় নেই, বুড়োকে আমি বিশ্বাসই করিনে—আচ্ছা দেখ, যদি তাকে ধরতে পারিস তো ধর। প্রাণের প্রতি গভীর বিশ্বাসের জোরে চন্দ্রহাস মৃত্যুর

গুহার মধ্যে প্রবেশ করে সেই প্রাণকেই নূতন করে, চিরন্তন করে দেখতে পেলে। যুবকের দল বুঝতে পারলে জীবনকে যৌবনকে বারে বারে হারাতে হবে, নইলে ফিরে পাবার উৎসব হতে পারবে না। শীত না থাকলে ফাল্গুনের মহোৎসবের মহাসমারোহ তো মারা যেতো।[১]

রাজা মাথায় পাকা চুল দেখিয়া খেদ করিতেছেন, রবীন্দ্রনাথ আসন্ন বার্ধক্যের ছায়ায় বিষণ্ণ, ফাল্গুনীর কবিশেখর দুই জনের উদ্দেশ্যেই বলিতেছেন—

এ যৌবন ম্লান যদি হল তো হোক না। আরেক যৌবন লক্ষ্মী আসছেন, মহারাজের কেশে তিনি তাঁর শুভ্র মল্লিকার মালা পাঠিয়ে দিয়েছেন, নেপথ্যে সেই মিলনের আয়োজন চলছে।

রাজা যেখানে জরা দেখিতেছেন, কবিশেখরের দূরতর প্রসারী দৃষ্টি সেখানে নূতন যৌবনলক্ষ্মীকে দেখিতে পাইতেছে, রাজার দৃষ্টি যেখানে বিনাশ ও Fact-কে দেখিতেছে, কবিশেখরের দৃষ্টি সেখানে নূতনতর জীবনের সূত্রপাত ও Truth-কে দেখিতেছে।

রাজা শুধাইলেন—গানের বিষয়টা কি?

কবি বলিলেন—শীতের বস্ত্রহরণ।

—এতো কোন পুরাণে পড়া যায়নি।

—বিশ্বপুরাণে এই গীতের পালা আছে। ঋতুর নাট্য বৎসরে বৎসরে শীত বুড়োটার ছদ্মবেশ খসিয়ে দিয়ে তার বসন্তরূপ প্রকাশ করা হয়, দেখি, পুরাতনটাই নূতন।

—এতো গেল গানের কথা, বাকিটা?

—বাকিটা প্রাণের কথা।

—সে কি রকম?

১ গ্রন্থ পরিচয় পৃঃ ৬০৭, র-রচনাবলী ১২শ খণ্ড

—যৌবনের দল একটা বুড়োর পিছনে ছুটে চলেছে। তাকে ধরবে বলে পণ। গুহার মধ্যে ঢুকে যখন ধরলে তখন—

—তখন কি দেখ্‌লে ?

—কি দেখ্‌লে সেটা যথাসময়ে প্রকাশ হবে।

—কিন্তু একটা কথা বুঝতে পারলুম না। তোমার গানের বিষয় আর তোমার নাট্যের বিষয়টা আলাদা নাকি ?

—না মহারাজ, বিশ্বের মধ্যে বসন্তের যে লীলা চলেছে আমাদের প্রাণের মধ্যে যৌবনের সেই একই লীলা। বিশ্ব কবির সেই গীতি-কাব্য থেকেই তো ভাব চুরি করেছি।

এবারে নাটকটির সংগঠনরীতি স্মরণ করা আবশ্যক। নাটকটির প্রত্যেক অঙ্কের প্রারম্ভে একটি করিয়া গীতিভূমিকা আছে। গীতিভূমিকায় আছে প্রকৃতির লীলা, নাটকে আছে মানবজীবনের লীলা—আর যে রাজসভায় এই অভিনয় চলিতেছে সেখানে আছে রাজার ব্যক্তিগত জীবনের লীলা। তিন লীলাকে সুকৌশলে একটি শিল্পের ফ্রেমে আঁটিয়া দিয়া রবীন্দ্রনাথ তিনকে এক দেখাইয়াছেন, তিনি যেন বলিতে চান যে, তিন লীলার ধর্ম শুধু এক নয়, বস্তুত তাহারা এক।

কবি বলিতে চান যে, চরম বিচারে প্রকৃতির মধ্যে জরা মৃত্যু নাই ; শীত আসিয়া যখন সব শেষ হইয়া গেল মনে করিতেছি, তখনই দেখিতেছি বসন্তের আবির্ভাব—এইভাবে বিশ্বে বসন্তচক্রের চিরন্তন আবর্তন চলিতেছে।[১] মানব জীবন সম্বন্ধে তাঁহার বক্তব্য দুই ভাগে বিভাজ্য। সমষ্টিগতভাবে মানব জগতেও জরা মৃত্যুর চরম স্থান নাই, কারণ জরা মৃত্যু সত্ত্বেও মানবসংসার নবীন। কিন্তু ব্যক্তিজীবন সম্বন্ধে তো এমন বলা যায় না। সেখানে দেখি চুলে পাক ধরে, বার্ধক্যের ছায়া যৌবনের জ্যোতিকে ম্লান করিয়া দেয়—ইহার সমাধান

১ এই প্রসঙ্গে ফাল্গুনী নাটকের ইংরাজী অনুবাদের The Cycle of Spring নামটি স্মরণীয়।

কোথায়? কবি বলিতে চান যে, অনায়াসলব্ধ দৈহিক যৌবনের পরিবর্তে মানুষ ইচ্ছা করিলে সাধনলব্ধ যৌবনের ক্ষেত্রে উপনীত হইতে পারে। সে যৌবন অদৃশ্য হইতে পারে, কিন্তু তাই বলিয়া তাহাকে অস্বীকার করিবার উপায় নাই। অন্য নামের অভাবে কবি ইহাকে নিরাসক্ত যৌবন বলিয়াছেন। ইহার অপর ব্যাখ্যাগত নাম আসক্তি হইতে মুক্তি বা আত্মার চিরানন্দ অবস্থা। ইহাকে জীবন্মুক্তি নাম দেওয়া অসঙ্গত হইবে না। ইহা আত্মার যৌবন।

মানবজীবন ত্রিভুজের এক কোণে দৈহিক যৌবন, আর এক কোণে বার্ধক্য—আর এই দুইয়ের ঠেলাঠেলির ফলে তৃতীয় কোণে বিরাজ করিতেছে মহত্তর যৌবন। ইহা সাধনলভ্য এবং দুর্লভ বলিয়াই সকলে এ অবস্থায় উপনীত হইতে পারে না। এই অবস্থাকেই রবীন্দ্রনাথ মানব-জীবনের চরম লক্ষ্য বলিয়া মনে করেন।

৪

এবারে নাটকটির পাত্রপাত্রীর পরিচয় লওয়া যাইতে পারে—তাহাতে নাটকের মর্মের পরিচয় পাওয়া যাইতে পারে। রাজা শুধাইলেন:

—তোমার নাটকের প্রধান পাত্র কে কে?

কবি বলিলেন—এক হচ্ছে সর্দার।

—সে কে?

—যে আমাদের কেবল চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আর একজন হচ্ছে চন্দ্রহাস।

—সে কে?

—যাকে আমরা ভালবাসি, আমাদের প্রাণকে সেই প্রিয় করেছে।

—আর কে আছে?

—দাদা, প্রাণের আনন্দটাকে যে অনাবশ্যক বোধ করে, কাজটাকেই সে সার মনে করেছে।

—আর কেউ আছে ?

—আর আছে এক অন্ধ বাউল।

—অন্ধ ?

—হাঁ মহারাজ, চোখ দিয়ে দেখেনা বলেই সে তার দেহ মন প্রাণ সমস্ত দিয়ে দেখে।

এবারে কবিকৃত ব্যাখ্যা শোনা যাক। এই ঘরছাড়া দলের মধ্যে বয়স নানা রকমের আছে। কারো কারো চুল পাকিয়াছে কিন্তু সে খবরটা এখনো তাদের মনের মধ্যে পৌছায় নাই। ইহারা যাকে দাদা বলে তার বয়স সবচেয়ে কম। সে সবে চতুষ্পাঠী হইতে উপাধি লইয়া বাহির হইয়াছে। এখনও বাহিরের হাওয়া তাকে বেশ করিয়া লাগে নাই। এই জন্যই সে সবচেয়ে প্রবীণ। আশা আছে বয়স যতই বাড়িবে সে অন্যদের মতোই কাঁচা হইয়া উঠিবে; বিশ ত্রিশ বছর সময় লাগিতে পারে। ইহারা যাকে সর্দার বলিয়া ডাকে সর্দার ছাড়া তার অন্য কোন পরিচয় খুঁজিয়া পাওয়া গেল না।……এই লোকটির কাজ চালাইয়া লওয়া, পথ হইতে পথে, লক্ষ্য হইতে লক্ষ্যে, খেলা হইতে খেলায়। কেহ যে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবে, সেটা তার অভিপ্রায় নয়। কিন্তু যেহেতু সত্যকার সর্দার মাত্রেই বাহিরে হাঙ্গামা করে না, ভিতরে কথা কয়, এই লোকটিকে রঙ্গমঞ্চে দেখা গেলেই ইহার পরিচয় সুস্পষ্ট হইবে।[১]

ফাল্গুনীর পাত্রগণের তালিকায় কবি তাহাদের যে বিশেষ পরিচয়ের উল্লেখ করিয়াছেন তাহাতে দেখিতেছি সর্দারকে জীবন সর্দার বলা হইয়াছে। এই জীবন সর্দার নামটি বিশেষ ইঙ্গিতপূর্ণ মনে হয়।

ফাল্গুনী নাটক পুরাপুরি ‘এলিগরি’ বা রূপক নাট্য না হইলেও কোন কোন

১ গ্রন্থ পরিচয়, পৃঃ ৫৯৯, র-রচনাবলী, ১২শ খণ্ড

স্থলে 'এলিগরি' বা রূপকের ছাঁচে ঢালাই করা হইয়াছে। জীবন সর্দার, চন্দ্রহাস, দাদা ও অন্ধ বাউল চারজনকেই রূপক মনে করা যাইতে পারে।

জীবন সর্দার বলিতে রবীন্দ্রনাথ জীবন বা 'লাইফ প্রিন্সিপল' বুঝিয়াছেন। 'এই লোকটির কাজ চালাইয়া লওয়া, পথ হইতে পথে, লক্ষ্য হইতে লক্ষ্যে, খেলা হইতে খেলায়। কেহ যে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবে, সেটা তার অভিপ্রায় নয়।' ইহা কি জীবনেরই স্বভাব নয়? অন্তত রবীন্দ্রনাথের মতে ইহাই জীবনের ধর্ম, গতিই জীবন, স্থিতিই জীবনহীনতা।১ জীবন সর্দার বা জীবনই নব যৌবনের দলকে পথে বাহির করিয়া দুস্তরের অভিমুখে চালিত করিয়াছে, চিরকালের বুড়াকে ধরিয়া আনিতে সেই তো নব যৌবনের দলকে উৎসাহিত করিয়াছে, তারপরে মৃত্যুর অন্ধকার গুহা হইতে চিরকালের বুড়ার পরিবর্তে যে বাহির হইয়া আসিয়া সকলকে বিস্মিত করিয়া দিল—সে তো এই জীবন সর্দার বা জীবন ছাড়া অপর কেহ নহে।

গুহা হইতে সর্দারকে বাহির হইয়া আসিতে দেখিয়া বিস্মিত চন্দ্রহাস বলিয়া উঠিয়াছে—

তবে তুমিই চিরকালের?

—হাঁ,

—আর আমরাই চিরকালের?

—হাঁ,

—এতো বড় আশ্চয! তুমি বারে বারেই প্রথম, তুমি ফিরে ফিরেই প্রথম!

সংসারে বার্ধক্য নাই, আছে চিরন্তন জীবন, পিছন হইতে ধুলা বালির আড়াল হইতে, কখনো কখনো তাহাকে বুড়া বলিয়া মনে হইলেও সম্মুখ হইতে দেখিবামাত্র জীবনের চিরনবীনরূপ প্রকাশ হইয়া পড়ে।

১ বলাকার চঞ্চলা কবিতা স্মরণীয়

কবি চন্দ্রহাসকে নব যৌবনের দলের প্রিয় সখা বলিয়াছেন। চন্দ্রহাসকে আমরা প্রেম বলিতে পারি। প্রেম আছে বলিয়াই নানা বাধা বিঘ্ন সত্ত্বেও জীবনের প্রতি আসক্তি আছে। শুধু তাহাই নয়, একমাত্র প্রেমই মৃত্যুর অন্ধকারে তলাইয়া গিয়া জীবনের রহস্যভেদ করিতে সক্ষম। নাটকের শেষ অঙ্কে নব যৌবনের দল যখন অবসন্ন হইয়া বসিয়া পড়িল, তখন চন্দ্রহাস সাহস করিয়া অন্ধকার গুহার মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল এবং সূর্যোদয়ের মুহূর্তে বাহির হইয়া আসিয়া আশার সংবাদ শুনাইয়া দিল—ধরেছি, তাকে ধরেছি। এই ইঙ্গিত হইতে মনে হয় যে কবির মতে জীবনের কাজ চালাইয়া লওয়া, আর প্রেমের কাজ সেই চলাকে মধুর করিয়া তাহাকে অর্থময় করিয়া তোলা। প্রেমের স্পর্শ না পাইলে জীবনের দুর্বারগতি নিরর্থক ও বিড়ম্বনা হইয়া ওঠে। চন্দ্রহাস সঙ্গে না থাকিলে নব যৌবনের দল অনেক আগেই খেলায় ভঙ্গ দিত, জীবনের তাগিদও তাহাদের চালিত করিতে পারিত কিনা সন্দেহ!

দাদা নব যৌবনের দলের প্রবীণ যুবক। বয়স তাহার অল্প—তবু তাহাকে বৃদ্ধ বলিয়া মনে হয়, ভিন্নার্থে 'বার্ধক্যং জরসা বিনা।' বয়স অল্প হইলেও যে জরার কবলিত হওয়া যায়, জরা যে মনের ধর্ম, ইহা দেখাইবার উদ্দেশ্যেই কবি দাদাকে প্রবীণ যুবক করিয়া আঁকিয়াছেন। আমাদের জন্মজরাগ্রস্ত দেশে দাদার অভাব নাই। পাঠশালার বয়স হইতেই তাহারা প্রাজ্ঞের মতো কথা বলিতে শুরু করে। ইহাদের দেহের বয়সে আর মনের বয়সে থাপ খাইতে চায়না—সেই তরুণ বৃদ্ধদের রূপক করিয়া কবি দাদাকে সৃষ্টি করিয়াছেন।

আর আছে এক অন্ধ বাউল। এই লোকটি চোখ দিয়া দেখে না বলিয়াই বুড়ার (আসলে জীবনের) সন্ধান জানে। এই প্রসঙ্গে 'রাজা' নাটকের বিষয় স্মরণীয়। 'রাজা' চোখে দেখিবার নহেন, রাণী চোখে দেখিতে চাহিয়া ভুল করিয়াছিল। রাণী চোখে দেখার আশা ছাড়িলে তবে 'রাজাকে' উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিল। অন্ধ বাউল অনেক দিন হইল চোখে দেখার প্রথা ছাড়িয়াছে—তাই সে এখন জীবনের স্বরূপ অবগত। 'রাজা' নাটকের রাণী সুদর্শনা অনেক দুঃখ ভোগের পরে নাটকের অন্তে যে-অবস্থায় উপনীত হইয়াছে,

অন্ধ বাউলের আজ সেই অবস্থা, তাহার সাধনার পর্ব শেষ হইয়াছে, সে এখন সিদ্ধকাম। অন্ধ বাউলকে প্রজ্ঞার রূপক বলিতে পারা যায়।

সবশুদ্ধ মিলিয়া ব্যাপারটা দাঁড়াইয়াছে এই যে, জীবন সর্দার বা জীবন নব যৌবনের দলকে চালিত করিতেছে, চন্দ্রহাস বা প্রেম সেই চলাকে মধুর করিয়া সার্থক করিয়া তুলিয়াছে—কিন্তু ইহাই যথেষ্ট নয়, প্রজ্ঞা ব্যতীত প্রেমও পথ দেখিতে পায় না। অন্ধ বাউল সেই প্রজ্ঞা, যাহার নিকটে সন্ধান পাইয়া চন্দ্রহাস বুড়াকে ধরিবার আশায় অন্ধকার গুহার মধ্যে প্রবেশ করিতে সমর্থ হইয়াছে।

রূপকটিকে পূর্ণতর করিবার জন্য দাদারও প্রয়োজন ছিল। মানুষের ব: নব যৌবনের দলের মানসিক জরার বাহ্যরূপ দাদা। নব যৌবনের দল ছুটিয়া চলিয়াছে, আর তাহাদের মনে যে জরা আছে, যে-নিরুৎসাহ আছে, যে-সন্দেহ আছে, যে-অপরিণত অভিজ্ঞতা আছে—সে সমস্ত দাদার মধ্যে মূর্তিমান হইয়া চৌপদী রচনা করিতে করিতে নব যৌবনের দলের পিছনে পিছনে চলিয়াছে।

পূর্ণাঙ্গ 'এলিগরি' বা রূপক নাট্য রবীন্দ্রনাথ কখনো লেখেন নাই, তাহা তাঁহার শিল্প-স্বভাবসঙ্গত নয়, বিশেষ একটা বাঁধানো রাস্তায় অধিকক্ষণ তিনি চলিতে পারেন না—কিন্তু তত্ত্বনাট্য বলিয়া পরিচিত নাটকগুলির অনেকস্থলে তিনি রূপকের আংশিক ব্যবহার করিয়াছেন। তন্মধ্যে ফাল্গুনী অন্যতম প্রধান বলিয়া মনে হয়।

৫

ফাল্গুনী নাটকের কাল ফাল্গুন মাস, বসন্তকাল। বসন্তকালে ঋতুচক্র পূর্ণ আবর্তিত হইয়া আবার নূতন বৎসরে প্রবেশ করে। শীতের জরাতে পৃথিবীর দীনতা প্রকাশিত হয়—কিন্তু ঐখানেই শেষ নয়, তারপরেই আবির্ভূত হয় বসন্ত, বসন্তে পৃথিবী আবার নূতনভাবে নবীন হইয়া দেখা

দেয়। এই সত্যটিকে কবি মানব জীবনের বার্ধক্যজাত জরা ও তদুত্তর নূতন জীবনের প্রতীকরূপে ব্যবহার করিয়াছেন। প্রকৃতির জীবনে ও মানব জীবনে একই লীলার ধারা বহমান—ইহা দেখাইবার উদ্দেশ্যেই কবি বসন্ত ঋতু নাটকের কাল হিসাবে বাছিয়া লইয়াছেন।

কিন্তু এ বসন্ত মানুষের মহত্তর যৌবনের প্রতীক—ইহার মধ্যে সুখ ও দুঃখ, আনন্দ ও অশ্রু দুই-ই আছে; ইহাতে আনন্দের উল্লাস যেমন আছে, তেমনি কর্মের আহ্বানও আছে—তাহা না থাকিলে এ বসন্তের বাণী মানুষের মনকে তেমন করিয়া স্পর্শ করিতে পারিত না।

—এবার আমাদের বসন্ত-উৎসবে এ কি রকম সুর লাগছে। এ যেন ঝরা পাতার সুর।১

—এতদিন বসন্ত তার চোখের জলটা আমাদের কাছে লুকিয়ে ছিল।

—ভেবেছিল আমরা বুঝতে পারবো না, আমরা যে যৌবনে দুরন্ত।

—আমাদের কেবল হাসি দিয়ে ভুলোতে চেয়েছিল।

আর বসন্তের মধ্যে যে কর্মের আহ্বান নিহিত তাহাও জানিতে পাই।

বাউল। সে [চন্দ্রহাস] বলে, যুগে যুগে মানুষ লড়াই করেছে, আজ বসন্তের হাওয়ায় তারি ঢেউ।

—তারি ঢেউ?

বাউল। হাঁ, খবর এসেছে মানুষের লড়াই শেষ হয়নি।

—বসন্তের এই কি খবর?

স্পষ্টই বোঝা যাইতেছে ইহা বসন্তের আদর্শায়িত রূপ, মানুষের যৌবনের আদর্শায়িত রূপ। এ বসন্ত কেবল পার্থিব নয়, এ যৌবন কেবল দৈহিক

১ তুলনীয় 'রাজা' নাটকের বসন্তের রূপ—'বসন্তে কি শুধু কেবল ফোটা ফুলের মেলা রে'

নয়। এ বসন্ত কবির চোখে দেখা বসন্ত, এ যৌবন পরিণত মনে অনুভব করা যৌবন। অনেকে বলেন, রবীন্দ্রনাথ কেবলই তারুণ্যের জয়গান করিয়াছেন। এ উক্তি আংশিক সত্য মাত্র। কেননা, রবীন্দ্রনাথের জয় ধ্বনি দৈহিক তারুণ্যের উদ্দেশ্যে তেমন নয়, যেমন আদর্শায়িত তারুণ্যের উদ্দেশ্যে। কিংবা বলা উচিত, বলাকা ও ফাল্গুনীতে আসিয়া কবি দৈহিক তারুণ্যের অনুকল্পরূপে প্রৌঢ়ের যৌবনকে নির্বাচন করিয়া লইয়া তাহার কণ্ঠে প্রতিভার স্বয়ম্বর মাল্য অর্পণ করিয়াছেন।

এখানে সংক্ষেপে নাটকের স্থানের আলোচনা করিয়া লওয়া যাইতে পারে। কবি বলিয়াছেন যে—"এই নাট্য কাণ্ডটার দৃশ্য পথে ঘাটে বনে বাদাড়ে। বিশেষ করিয়া তাহার উল্লেখ করার দরকার নাই।" ইহার বিস্তৃতরূপ নাট্য দৃশ্যগুলিতে পাওয়া যাইবে। প্রথম দৃশ্যের স্থান পথ, দ্বিতীয় দৃশ্যের স্থান ঘাট, তৃতীয় দৃশ্যের স্থান মাঠ, চতুর্থ দৃশ্যের স্থান গুহাদ্বার। অর্থাৎ ঘটনাস্রোত পথে ঘাটে মাঠে চলিতে চলিতে চরম দৃশ্যে গুহাদ্বারের সম্মুখে আসিয়া পড়িয়াছে। অর্থাৎ নব যৌবনের দল পথের টানে ভাসিতে ভাসিতে গুহাদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। যথাস্থানে পথ ও গুহাদ্বারের আলোচনা করা যাইবে।

৬

ফাল্গুনী নাটকখানিকে রবীন্দ্রনাথের শিল্প ও জীবনদর্শনের মোড় ঘুরিবার স্থান বলিয়া বর্ণনা করিয়াছি। এবারে সেবিষয় আলোচনা করা যাইতে পারে। এখানে তিনি প্রকৃতিকে মানুষের অনুকল্পরূপে নিশ্চিতভাবে গ্রহণ করিয়াছেন, এবং পরবর্তী কাব্যে ও নাটকে আর এই ভাব হইতে বিচ্যুত হন নাই।

প্রকৃতির জীবনে যে লীলা চলিতেছে মানবজীবনে যে ঠিক তাহারই

অনুরূপ ব্যাপার ঘটিতেছে তাহা দেখাইবার উদ্দেশ্যে ফাল্গুনীতে এক অভিনব শিল্পরীতিকে কবি আশ্রয় করিয়াছেন। নাটকটির প্রত্যেক দৃশ্যের প্রারম্ভে একটি করিয়া গীতিভূমিকা সংযোজিত। গীতিভূমিকার নায়ক নায়িকা প্রকৃতির পাত্রপাত্রী, নাট্যদৃশ্যে নায়ক মানব পাত্রগণ। গীতিভূমিকায় যাহা ভাবাকারে উক্ত, নাট্যদৃশ্যে তাহাই ঘটনাকারে বিবৃত, গীতিভূমিকা যদি হয় সূত্র, নাট্যদৃশ্য তবে তাহার টীকাভাষ্য।

নবীনের আবির্ভাব, যুবকদলের প্রবেশ ॥
প্রবীণের দ্বিধা, সন্ধান ॥
প্রবীণের পরাভব, সন্দেহ ॥
নবীনের জয়, প্রকাশ ॥

গীতিভূমিকা ও নাট্যদৃশ্যের পূর্বোক্তরূপ পরিচয় বিবৃতি কবি কর্তৃক প্রদত্ত হইয়াছে। আর ইহাই স্মরণ করিয়া কবিশেখর রাজাকে বলিয়াছিল —"হাঁ মহারাজ, গানের চাবি দিয়েই এর এক একটি অঙ্কের দরজা খোলা হবে।"

শেষ জীবনের নাটকগুলিতে রবীন্দ্রনাথ নাট্যদৃশ্যের ঘটনা-স্থানরূপে একটি আদর্শায়িত পথের কল্পনা করিয়াছেন। ফাল্গুনীর ঘটনাস্রোতও একটি পথকে অনুসরণ করিয়া প্রবাহিত। যৌবনের দল কর্তৃক চিরন্তন বৃদ্ধের অনুসন্ধান নাট্যবিষয়, কাজেই নাট্যবিষয়ের সঙ্গে নাট্যদৃশ্যের সুসঙ্গতি হইয়াছে। নাট্য দৃশ্যে পথের ভাবটা দর্শকদের চোখে ফুটাইয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে কবি নাট্য ব্যবস্থাপকগণকে নির্দেশ দিতেছেন—"রাস্তা দিয়ে পথিক চলাচলের by-play-টা তোমরা করে নিতে পারবে? সমস্তক্ষণই আমাদের অভিনয়ের পিছন দিয়ে কেবল এইরকম যাতায়াত চালালে বেশ হয়।"১

১ গ্রন্থ পরিচয় পৃঃ ৬০১, র-র, ১২শ খণ্ড

৭

ফাল্গুনীতে প্রতীক-ভাবসম্পন্ন বস্তুর অভাব নাই। পূর্বোক্ত পথটাই প্রতীক-ভাবসম্পন্ন। কিন্তু পূর্ণাঙ্গ প্রতীক বলিতে শেষ দৃশ্যের গুহাটিকে বুঝি। এই গুহা কিসের প্রতীক?

কবির ভাষায়—প্রাণের প্রতি গভীর বিশ্বাসের জোরে চন্দ্রহাস মৃত্যুর গুহার মধ্যে প্রবেশ করে, সেই প্রাণকেই নূতন করে দেখতে পেলে। যুবকের দল বুঝতে পারলে জীবনকে, যৌবনকে বারে বারে হারাতে হবে, নইলে ফিরে পাবার উৎসব হতে পারবে না। শীত না থাকলে ফাল্গুনের মহোৎসবের মহা-সমারোহ তো মারা যেতো।[১]

এই গুহা যে মৃত্যু, গুহার অন্ধকার যে মৃত্যুর রহস্য—তাহার সপক্ষে কবির আরও উক্তি পাওয়া যায়।

জীবনকে সত্য বলে জানতে পেলে মৃত্যুর মধ্য দিয়ে তার পরিচয় পাই। যে-মানুষ ভয় পেয়ে মৃত্যুকে এড়িয়ে জীবনকে আঁকড়ে রয়েছে, জীবনের পরে তার যথার্থ শ্রদ্ধা নেই বলে জীবনকে সে পায়নি। তাই সে জীবনের মধ্যে বাস করেও মৃত্যুর বিভীষিকায় প্রতিদিন মরে। যে-লোক নিজে এগিয়ে গিয়ে মৃত্যুকে বন্দী করতে ছুটেছে, সে দেখতে পায়, যাকে সে ধরেছে, সে মৃত্যুই নয়, সে জীবন। যখন সাহস করে তার সামনে দাঁড়াতে পারিনে, তখন পিছন দিক থেকে তার ছায়াটা দেখি। সেইটে দেখে ডরিয়ে ডরিয়ে মরি। নির্ভয়ে যখন তার সামনে গিয়ে দাঁড়াই, তখন দেখি যে-সর্দার জীবনের পথে আমাদের এগিয়ে নিয়ে যায়, সেই সর্দারই মৃত্যুর তোরণদ্বারের মধ্যে আমাদের বহন করে নিয়ে যাচ্ছে। ফাল্গুনীর গোড়ার কথাটা হচ্ছে এই যে, যুবকেরা বসন্ত-

১ গ্রন্থ পরিচয়, পৃঃ ৬০৭, র-র, ১২শ খণ্ড

উৎসব করতে বেরিয়েছে। কিন্তু এই উৎসব তো শুধু আমোদ করা নয়, এ-তো অনায়াসে হবার জো নেই। জরার অবসাদ, মৃত্যুর ভয় লঙ্ঘন করে তবে সেই নবজীবনের আনন্দে পৌঁছানো যায়।[১]

ইহার পরে গুহাটার স্বরূপ সম্বন্ধে আর কোন সন্দেহ থাকা উচিত নয়। তারপরে যখন মনে পড়ে যে, গুহাকে মৃত্যুর প্রতীকরূপে তিনি আগেও ব্যবহার করিয়াছেন—তখন তাহার স্বরূপ সম্বন্ধে আর কোন সন্দেহ থাকে না।

১ গ্রন্থ পরিচয়, পৃঃ ৬০৮, র র, ১২শ খণ্ড

মুক্তধারা

মুক্তধারা নাটকের সঙ্গে পূর্বতন প্রায়শ্চিত্তের কিছু কিছু মিল আছে মুক্তধারার গল্পাংশের আভাস প্রায়শ্চিত্তে পাওয়া অসম্ভব নয় ; পরবর্তী নাটকের একটি চরিত্রের একমেটে রূপ পূর্ববর্তী নাটকে আছে ; কয়েকটি গানও উভয় নাটকে এক ; আর ধনঞ্জয় বৈরাগী সশরীরে প্রায়শ্চিত্ত নাটক হইতে গৃহীত। কিন্তু খুব বেশী ঐক্য এই দুই নাটকে অনুসন্ধান করা অনাবশ্যক— কারণ জাতিতে ইহারা স্বতন্ত্র।

মুক্তধারার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয়, ইহাতে প্রতীক ব্যবহার করা হইয়াছে। এই প্রতীক সম্বন্ধে সচেতন হইয়া তবেই ইহার বিচারে অবতীর্ণ হইতে হইবে।

দূরে আকাশে একটা অভ্রভেদী লৌহযন্ত্রের মাথাটা দেখা যাইতেছে এবং তাহার অপর দিকে ভৈরব মন্দির চূড়ার ত্রিশূল।১

মুক্তধারার নাট্যক্ষেত্রের সর্বত্র হইতে এই যন্ত্র ও ত্রিশূল যেমন দৃশ্যমান, নাটকের সমালোচকের মনের মধ্যেও তেমনি সর্বদা এই দুটি প্রতীককে উপস্থিত রাখা আবশ্যক। তানপুরায় যেমন গানের মূল সুরটিকে ধরিয়া রাখে—এই দুটি প্রতীকেও তেমনি নাটকের মূল তত্ত্বটি ধরিয়া রাখিয়াছে।

ওই যন্ত্রটা মুক্তধারার বাঁধের একাংশ ; উত্তরকূটের দেবতা মানুষের জন্য যে ঝরণা দিয়াছেন, উত্তরকূটের যন্ত্ররাজ তাহাকে বাঁধিয়া নিজেদের প্রয়োজনের জন্য সংযত করিয়াছে। উত্তরকূটের একদিকের আকাশে লৌহযন্ত্র, অপর দিকের

---

১ মুক্ত ধারা, রচনাবলী, ১৪শ খণ্ড, পৃঃ ১৮৭

আকাশে ভৈরব মন্দিরের ত্রিশূলের চূড়া। দুই বিপরীত দিকে দুটি প্রতীককে স্থাপন করিয়া কবি যেন ইহাদের মধ্যে বিরোধটা চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিতে চাহেন। বিরোধের মূলে উত্তরকূটের দেবলক্ষী স্পর্ধা। ভৈরব যে জল মানুষের জন্য দিয়াছেন, উত্তরকূটীয়েরা নিজের দেশের রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসাধনের জন্য তাহাকে বাঁধিয়াছে; মানুষমাত্রেরই যাহা সম্পত্তি তাহাকে দেশবিশেষের সম্পত্তি বলিয়া তাহাদের ধারণা হইয়াছে। এই যে ধারণা, তাহার মূলেও আবার আর একটা বৃহত্তর ভ্রান্তি; ভৈরব যিনি সকলেরই দেবতা, উত্তরকূটের লোকেরা তাঁহাকে কেবল নিজেদের দেবতা বলিয়াই মনে করিয়াছে। দেবতাকে যখন বিশেষ জাতির দেবতা বলিয়া মনে হয়, দেবতার দান যখন বিশেষ জাতির ভোগত্র বলিয়া পরিগণিত হয়, সেই বিশেষ জাতি তখন দেবতার একমাত্র অনুগৃহীত মনে করিয়া অন্য সব জাতির উপরে দেবতার প্রতিনিধিরূপে স্বার্থপাশ নিক্ষেপ: করিয়া দেবতার অভিনয় করিতে থাকে। প্রকৃত দেবতাকে তখন তাহারা আলাদিনের প্রদীপের মত অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন স্বার্থসাধনের উপকরণমাত্র মনে করে। উত্তরকূটীয়দের সেই চরম দুর্দশা ঘটিযাছে। এখানেই মুক্তধারার অন্তর্নিহিত ট্র্যাজেডি।

যন্ত্ররাজ বিভূতি বহুবৎসরের চেষ্টায় মুক্তধারাকে বাঁধিয়া ফেলিয়াছে, সেই সফলতার জন্য সকলে ভৈরব মন্দিরে পূজা দিতে চলিযাছে—স্বযং রাজাও পদব্রজে ভৈরব মন্দিরের যাত্রী। এই ঘটনায় অদৃষ্টের শ্লেষ বড় নিদারুণ। যিনি মানুষের জন্য মুক্তধারার সৃষ্টি করিযাছেন, বাঁধ বাঁধিয়া তাঁহাবই বিধানকে লঙ্ঘন, আবার সেই লঙ্ঘনের গৌরবে আনন্দিত হইয়া তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য পূজার সমারোহ।

রণজিৎ। প্রণাম। খুড়া মহারাজ, তুমি আজ উত্তরভৈরবের মন্দিরে পূজায় যোগ দিতে আসবে এ সৌভাগ্য প্রত্যাশা করিনি।

বিশ্বজিৎ। উত্তরভৈরব আজকের পূজা গ্রহণ করবেন না—এই কথা জানাতে এসেছি।

রণজিৎ। তোমার এই দুর্বাক্য আমাদের মহোৎসবকে আজ—

বিশ্বজিৎ। কী নিয়ে মহোৎসব? বিশ্বের সকল তৃষিতের জন্য দেবদেবের কমণ্ডলু যে জলধারা ঢেলে দিচ্ছে সেই মুক্তজলকে তোমরা বন্ধ করলে কেন?

রণজিৎ। শত্রু দমনের জন্যে—

বিশ্বজিৎ। মহাদেবকে শত্রু করতে ভয় নেই?

রণজিৎ। যিনি উত্তরকূটের পুরদেবতা, আমাদের জয়ে তাঁরই জয়। সেই জন্যেই আমাদের পক্ষ নিয়ে তিনি তাঁর নিজের দান ফিরিয়ে নিয়েছেন। তৃষ্ণার শূলে শিবতরাইকে বিদ্ধ করে তাকে তিনি উত্তরকূটের সিংহাসনের তলায় ফেলে দিয়ে যাবেন।

বিশ্বজিৎ। তবে তোমাদের পূজা পূজাই নয়, বেতন।[১]

দেবতা ভৃত্য হইয়াছেন, পূজা বেতন হইয়া পড়িয়াছে, এই কথা বলিয়া দিবার জন্য বিশ্বজিৎ আছেন, ধনঞ্জয় আছে, যুবরাজ অভিজিৎ আছেন। অভিজিৎ মুক্তধারার বাঁধ ভাঙিয়া দিয়া দেবতাকে দাসত্ব হইতে, অর্ঘ্যকে বৃত্তিত্ব হইতে মুক্তি দিয়াছেন। মুক্তধারা খুলিয়া দেওয়ায় ঝরণা যে কেবল মুক্তি পাইয়াছে তাহা নয়, দেবতা ভৃত্যত্ব হইতে এবং মানুষ দেবলঙ্ঘী মনিবত্ব হইতে মুক্তি পাইয়াছে। মুক্তধারার বাঁধভাঙা এই দুইটি মুক্তিরই প্রতীক।

রবীন্দ্রনাথের শেষ বয়সের তত্ত্বনাট্যে বক্তব্য বিষয়কে চরিত্র ও ঘটনার দ্বারা যেমন প্রকাশ করিতে চাহিয়াছেন, তেমনি ভাব প্রকাশের আর একটি উপায়—অনুকূল আবহাওয়া সৃষ্টি। বরঞ্চ, চরিত্র ও ঘটনা-স্রোতের চেয়ে আবহাওয়ার উপরেই তিনি যেন বেশি নির্ভর করিয়াছেন। রবীন্দ্র-তত্ত্বনাট্যের ইহা একটি প্রধান লক্ষণ।

মুক্তধারায় আবহাওয়ার গুরুত্ব খুব বেশি, কবির বক্তব্যের অধিকাংশই আবহাওয়ার দ্বারা প্রকাশিত। বাঁধের লৌহযন্ত্র ও ভৈরব মন্দিরের চূড়া, বৃহত্তর আবহাওয়ার অংশ মাত্র।

১ তদেব, পৃঃ ১২৪-১২৫।

উত্তরকূট পার্বত্য প্রদেশ, আসন্ন অমাবস্যার রাত্রি; সায়াহ্নের ম্লান আকাশে দিনের আলো নাই, আবার রাত্রির অন্ধকারও ঘনীভূত হয় নাই—উদ্ধত স্পর্ধার মত লৌহ যন্ত্রটা মাত্র দৃশ্যমান আর বিপরীত দিকে আসন্ন প্রলয়ের বিদ্যুৎশিখার মত ত্রিশূলের ত্রিধা নিঃশব্দ সতর্কবাণী।

অন্ধকারের মধ্যে একটা আম বাগান; আম বাগানের পাশ দিয়া মন্দির-গামী পথ; পথ দিয়া মন্দির যাত্রীরা অবিরাম চলিয়াছে। মাঝে মাঝে ভৈরবমন্ত্রে দীক্ষিত সন্ন্যাসীদলের ধূপ দীপ হাতে গম্ভীর স্বরে মন্ত্রোচ্চারণ। আবার কখনো বা যন্ত্রমহিমার গান করিয়া উল্লসিত জনতার যন্ত্ররাজকে কাঁধে করিয়া প্রবেশ ও প্রস্থান। পূজা যে কাহার, তাহাতেই যেন সংশয়, ভৈরবের না যন্ত্ররাজ বিভূতির? পুত্রহারা অম্বার বিলাপ এবং পৌত্রহারা বটুকের সাবধানবাণীও এই আবহাওয়ার অন্তর্গত। আবহাওয়াকে শোকে ও সতর্কতায় ভয়রোমাঞ্চ করিয়া তোলাই তাহাদের প্রধান কাজ। আরও একটা ব্যাপার আছে। এতদিন উত্তরকূটের সর্বত্র হইতে মুক্তধারার কলধ্বনি শোনা যাইত—আজ তাহা আর শোনা যাইতেছে না। সেই অভ্যস্ত অথচ অশ্রুত কলধ্বনিও এই আবহাওয়ার একটা নঙর্থক অংশ। এই অনভ্যস্ত নিস্তব্ধতা দেবতার নীরব রোষের মত উত্তরকূটের মাথার উপরে উদ্যত।

ইহার উপরে আছে যন্ত্র ও ত্রিশূল। দিনের বেলায় যন্ত্রটাকে দেখিয়া লোকের অহঙ্কাব হইত, অন্ধকারে সেটাকে দেখিযা তাহাবা শঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছে।

ওই ভাই ওই দেখ্। সূর্য অস্ত গেছে, আকাশ অন্ধকার হ'য়ে এলো, কিন্তু বিভূতির যন্ত্রের চূড়াটা এখনও জল্‌ছে। রোদ্দুরের মদ খেয়ে যেন লাল হ'য়ে রয়েছে।

আর ভৈরব মন্দিরের ত্রিশূলটাকে অস্তসূর্যের আলো আঁকড়ে রয়েছে, যেন ডোব্‌বার ভয়ে কী রকম দেখাচ্ছে।[১]

১ তদেব, পৃঃ ২২২।

অন্ধকার আরও ঘনীভূত হইবার পরে—

কুন্দন। ওই দেখো চেয়ে। গোধূলির আলো যতই নিবে আস্‌ছে আমাদের যন্ত্রের চূড়াটা ততই কালো হ'য়ে উঠ্‌ছে।

—দিনের বেলায় ও সূর্যের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এসেছে, অন্ধকারে ও রাত্রি-বেলাকার কালোর সঙ্গে টক্কর দিতে লেগেছে। ওকে ভূতের মত দেখাচ্ছে।

কুন্দন। বিভূতি তার কীর্তিটাকে এমন ক'রে গড়্‌ল কেন ভাই? উত্তরকূটের যেদিকেই ফিরি ওর দিকে না তাকিয়ে থাক্‌বার জো নেই, ও যেন একটা বিকট চীৎকারের মতো।[১]

যন্ত্রটা যে উত্তরকূটের স্পর্ধার প্রতীক, কাজেই উত্তরকূটের সর্বত্র ওই যন্ত্রটাকে না দেখিয়া উপায় কি?

এমন কি স্বয়ং রাজাও একবার অসতর্ক মুহূর্তে যন্ত্রটার প্রকৃত রূপ দেখিয়া চমকিয়া উঠিয়াছেন। কিন্তু সত্যকার রূপ বুঝিতে তাঁহাকে অনেক দুঃখ স্বীকার করিতে হইয়াছে।

রণজিৎ। মন্ত্রী, ওটা কী, আকাশে?

মন্ত্রী। মহারাজ, ভুলে যাচ্ছেন, ওটাই তো সেই যন্ত্রের [illegible]।

রণজিৎ। এমন স্পষ্ট তো কোনদিন দেখা যায় না।

মন্ত্রী। আজ সকালে ঝড় হ'য়ে আকাশ পরিষ্কার হ'য়ে গেছে, তাই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে।

রণজিৎ। দেখেছ, ওর পিছনে থেকে সূর্য যেন ক্রুদ্ধ হ'য়ে উঠেছেন। আর ওটাকে দানবের উদ্যত মুষ্টির মতো দেখাচ্ছে। অতটা বেশী উঁচু ক'রে তোলা ভাল হয় নি।

১ তদেব, পৃ° ২২৭।

মন্ত্রী। . আমাদের আকাশের বুকে যেন শেল বিঁধে রয়েছে মনে হচ্ছে।১

রাজা বলিয়াছেন অতটা উঁচু করা ভাল হয় নাই—কিন্তু কতটা উঁচু সত্যই তিনি যদি জানিতেন! যন্ত্রের মাথা যে দেবমন্দিরের চূড়াকে অতিক্রম করিয়া গিয়াছে।

এতক্ষণ যে প্রতীক, ঘটনা বা লোকগুলির কথা বলিলাম তাহারা নাটকের গল্পের বিবর্তনে কোন সাহায্য করে নাই; নাটকের গল্প যে ক্ষেত্রে বিবর্তিত হইতেছে সেই ক্ষেত্রকে সৃষ্টি করিয়া তাহারা নাটকের অঙ্গীভূত হইয়াছে। ইহারা নাটকের নিষ্ক্রিয় অংশ। এই নিষ্ক্রিয় অংশের পটভূমিকাতেই নাটকের সক্রিয় অংশ ঘটনার বিবর্তন করিতে করিতে পরিণামের মুখে ছুটিয়াছে।

প্রতিভাবান্ প্রযোজকের হাতে পড়িলে রঙ্গমঞ্চে মুক্তধারা বিশেষ সাফল্যলাভ কবিতে পারে বলিয়া মনে হয়।

আমি সমস্ত সপ্তাহ ধ'রে একটা নাটক লিখছিলুম শেষ হয়ে গেছে তাই আজ আমার ছুটী। এ নাটকটা "প্রায়শ্চিত্ত" নয়, এর নাম "পথ"। এতে কেবল "প্রায়শ্চিত্ত" নাটকের ধনঞ্জয় বৈরাগী আছে, আর কেউ নেই, সে গল্পের কিছু এতে নেই, সুরমাকে এতে পাবে না।২

যদিও এই নাটকের নাম 'পথ' রাখা হয় নাই, তবু নামটার বিশেষ সার্থকতা আছে। নাটকের ঘটনাক্ষেত্র ভৈরব মন্দিরে যাইবার পথ। রাজা পথের মধ্যে শিবিরে বিশ্রাম করিতেছেন। রাজা হইতে দীনতম ব্যক্তিটী পর্যন্ত সকলেই ভৈরব মন্দিরের পথযাত্রী। সব ঘটনাই এই পথের উপর

১ তদেব, পৃঃ ১৯৮-১৯৯।

২ ভানুসিংহের পত্রাবলী, পৃঃ ১১৬, ১৩২৮, ৪ঠা মাঘ।

শান্তিনিকেতনে এই নাটক প্রথম পাঠের সময়ে কবি একবার বলিয়াছিলেন—নাটকটার নাম "পথ" দিলে ভাল হয়। কিন্তু তার বেশী অগ্রসর হন নাই। 'মুক্তধারা' নামেই ইহা প্রকাশিত হয়। লেখক সেই পাঠসভার উপস্থিত ছিল।

ঘটিয়াছে। শিবতরাই ও উত্তরকূটের হাজার হাজার লোক পথে বাহির হইয়া পড়িয়াছে।

নাটকের নায়ক যুবরাজ অভিজিৎ জন্মযাত্রী। পথের ধারেই তাহার জন্ম, আবার পথের ধারেই তাহার মৃত্যু। মুক্তধারার তীরে সে জন্মিয়াছে, আবার মুক্তধারার বন্ধন ভাঙিতে গিয়া তাহার তীরেই তাহার মৃত্যু। বাঁধন-ভাঙা মুক্তধারার স্রোত তাহার দেহ ভাসাইয়া লইয়া চলিয়া গেল। মুক্তধারার মধ্যেও যে গতি, পথের মধ্যেও তো সেই গতিই। পথ কাটাই যুবরাজের কাজ। নন্দিসংকটের রুদ্ধ পথ সে কাটিয়া দিয়াছে; আবার যেসব পথ এখনো কাটা হয় নাই পর্বতশৃঙ্গের দিকে তাকাইয়া ভবিষ্যতের সেই সব অকৃত পথকে সে দেখিতে পায়।

অবিরাম গতিতেই জীবনের সার্থকতা—গতিই জীবনের স্বরূপ। সেই গতি যেখানে কোন কারণে ব্যাহত, জীবনরূপ সেখানে বিকৃত। এই বিকৃতির হাত হইতে মানুষকে রক্ষা করাই অভিজিতের ব্রত। মুক্তধারার বদ্ধজল বদ্ধজীবন-স্রোতের প্রতীক; নন্দিসংকটের রুদ্ধ পথ রুদ্ধজীবনের প্রতীক; গৌরীশৃঙ্গের অকৃত পথ অনাগত জীবনের প্রতীক; জীবনস্রোতে আর একবার স্বভাবের গতি ফিরাইয়া দিবার জন্য অভিজিৎ জীবনত্যাগ করিয়াছে। এই বদ্ধ জীবনের পারিপার্শ্বিকে তাহার জীবনও যেন রুদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল। মুক্তধারার মুক্তস্রোতে সে মৃত্যুর মধ্য দিয়া জীবনের গতিকে ফিরিয়া পাইল।

নাটকের ভিতরকার এই গতিরূপটী নাটকের গঠন প্রণালীতে চমৎকার ধরা পড়িয়াছে। নাটকের আরম্ভ হইতে সমাপ্তি পর্যন্ত ঘটনার মধ্যে যে দ্রুতি ও গতি আছে, জনস্রোতের যে অবিরাম চলা আছে, ঘটনা ও মানুষ সকলেই ভৈরব মন্দিরের দিকে যে দুর্নিবার আকর্ষণে ছুটিতে বাধ্য হইয়াছে, পথাশ্রয়ী নাটকের ভিতরে এই গতি আশ্চর্যরূপে দৃশ্যমান। আর নাটকের সমাপ্তির চরম মুহূর্তে মুক্তধারায় মুক্তিকল্লোলে গতির জয়োল্লাস যেন ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে। ভিতরের ও বাহিরের ঐক্যে নাটকের তত্ত্ব ও টেকনিক একাঙ্গ হইয়া গিয়াছে।

এবারে ,নাটকের যন্ত্র সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইতে পারে। অনেকের ধারণা হইতে পারে রবীন্দ্রনাথ যন্ত্রমাত্রেরই বিরোধী। বস্তুতঃ তাহা নয়। যন্ত্রের মধ্যে প্রচণ্ড শক্তির প্রকাশ, তাহাকে কবি কখনো অস্বীকার করেন নাই, কারণ সে শক্তি যে মানুষের শক্তিরই অংশ।

ধনঞ্জয়। যে শক্তি দুরন্ত তাকে বেঁধে ফেলা [এ ক্ষেত্রে মুক্তধারা] কি কম কথা ? তা সে অন্তরেই হোক আর বাহিরেই হোক।

যন্ত্রের প্রতি ইহাই কবির যথার্থ মনোভাব। যন্ত্রের মধ্যে মানব শক্তিরই প্রক্ষেপ ; যন্ত্র মনুষ্যত্বের সীমাকে অনেকখানি বাড়াইয়া দিয়াছে ; বিরাট যন্ত্র যেন মানুষেরই প্রচণ্ড ব্যক্তিত্ব। কিন্তু ব্যক্তিত্বকেও তো অবাধ রাশ দেওয়া চলে না ; নিজের সুবিধা ও অপরের স্বাধীনতার মর্যাদা রক্ষা করিয়া ব্যক্তিত্বকে চালনা করিতে হয়। প্রবল শক্তি-সম্পন্ন লোকেরও প্রবল শক্তিকে যথেচ্ছ ব্যবহার করিবার নৈতিক অধিকার নাই। নীতির ক্ষেত্রে এ সত্য তো আমরা স্বীকার করি। তাহা যদি হয়, তবে যন্ত্রের ক্ষেত্রেই বা তাহা স্বীকৃত না হইবে কেন ? কারণ যন্ত্র তো মানবসম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন নয়, সে যে মানুষেরই শক্তির প্রকাশ মাত্র। মানুষের শক্তি সীমা ছাড়াইলে শাসন করি, যন্ত্রের শক্তি সীমা ছাড়াইলে কেন অশাসিত থাকিবে ? মানুষের শক্তি ও যন্ত্রের শক্তিকে আজ পর্যন্ত আমরা ভিন্ন জাতের মনে করিতে অভ্যস্ত, তাই বিচারে এত গোলযোগ উপস্থিত হয়। যে দিন এই দুই শক্তিকে একই শক্তির প্রকাশভেদ ও অংশবিশেষ বলিয়া দেখিতে পারিব, সেদিন অনেক গোলযোগ আপনি পরিষ্কার হইয়া যাইবে। মানুষের শক্তির মত যন্ত্রও নৈতিক শক্তি। যতক্ষণ যন্ত্র প্রাণের সহায় নৈতিকতঃ ততক্ষণ তাহার টিকিবার অধিকার আছে। যতক্ষণ সে প্রাণের অনুকূল, সৌন্দর্যের অনুকূল, কল্যাণের অনুকূল, আনন্দের অনুকূল, ততক্ষণ তাহাকে বর্জন করা মনুষ্যত্বকেই হীনবল করা। কিন্তু যখন সে মানুষের প্রতিকূল

হইয়া ওঠে, 'সুপারম্যানের' পরিবর্তে 'সাব্‌ম্যান' গঠনের পথ প্রস্তুত করে, 'ডিভিশন অব লেবারের' স্থলে 'সাব ডিভিশন অব লেবারের' ক্ষেত্র রচনা করে, তখন মুক্তধারায় বাঁধ পড়ে; তখন কবির পক্ষে অভিজিতকে আহ্বান করা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না।

অভিজিৎ প্রাণের দ্বারা যন্ত্রকে ভাঙিয়াছে, ইহাতে প্রাণের শ্রেষ্ঠতারই প্রমাণ। যন্ত্রকে বৃহত্তর যন্ত্রের দ্বারা ভাঙিলে প্রকারান্তরে যন্ত্রেরই জয় ঘটিল; কিম্বা মানুষের অধিকতর পরাজয় ঘটিল। দুর্বল যন্ত্রের দাসত্বের পরিবর্তে সে প্রবলতর যন্ত্রের দাসত্ব স্বীকার করিল। আবার তাহার চেয়েও প্রবলতর যন্ত্র আবিষ্কারে মানুষের রোখ চাপিয়া যায়—এমনিভাবে তাহার স্বাধীনতা অমোঘতর শৃঙ্খলে বাঁধা পড়িতে থাকে মাত্র। কিন্তু প্রাণকে যন্ত্রের বিরুদ্ধে ব্যবহার করিলে সে ভয় থাকে না—প্রাণের প্রবলতা মানুষের পক্ষে শুভ ছাড়া, অশুভ নয়।

তোমার চিঠিতে machine সম্বন্ধে যে আলোচনার কথা লিখেছ, সেই machine এই নাটকের একটা অংশ। এই যন্ত্র প্রাণকে আঘাত করছে, অতএব প্রাণ দিয়েই সেই যন্ত্রকে অভিজিৎ ভেঙেছে, যন্ত্র দিয়ে নয়। যন্ত্র দিয়ে যারা মানুষকে আঘাত করে তাদের একটা বিষম শোচনীয়তা আছে—কেননা যে মনুষ্যত্বকে তারা মারে সেই মনুষ্যত্ব যে তাদের নিজের মধ্যেও আছে—তাদের যন্ত্রই তাদের নিজের ভিতরকার মানুষকে মারছে। (আমার নাটকের অভিজিৎ হচ্ছে সেই মারনেওয়ালার ভিতরকার পীড়িত মানুষ।) নিজের যন্ত্রের হাত থেকে নিজে মুক্ত হবার জন্যে সে প্রাণ দিয়েছে। আর ধনঞ্জয় হচ্ছে যন্ত্রের হাতে মারখানেওয়ালার ভিতরকার মানুষ। সে বল্‌ছে—"আমি মারের উপরে; মার আমাতে এসে পৌছয় না—আমি মারকে না-লাগা দিয়ে জিত্‌বো, আমি মারকে না-মারা দিয়ে ঠেকাব।" যাকে আঘাত করা হচ্ছে সে সেই আঘাতের দ্বারাই আঘাতের অতীত হয়ে উঠ্‌তে পারে, কিন্তু যে-মানুষ আঘাত করছে আত্মার ট্র্যাজেডি

তারই—মুক্তির সাধনা তাকেই করতে হবে, যন্ত্রকে প্রাণ দিয়ে ভাঙবার ভার তারই হাতে। পৃথিবীতে যন্ত্রী বলছে "মার লাগিয়ে জয়ী হ'ব।" পৃথিবীতে মন্ত্রী বল্‌ছে "হে মন, মারকে ছাড়িয়ে উঠে জয়ী হও।" আর নিজের যন্ত্রে নিজের বন্দী মানুষটি বল্‌ছে "প্রাণের দ্বারা যন্ত্রের হাত থেকে মুক্তি পেতে, মুক্তি দিতে হবে।" যন্ত্রী হচ্ছে বিভূতি, মন্ত্রী হচ্ছে ধনঞ্জয় আর মানুষ হচ্ছে অভিজিৎ।১

তিন জাতের মানুষের কথা কবি এখানে বলিয়াছেন। যন্ত্রী মানুষ বিভূতি, সে যন্ত্রের দ্বারা পৃথিবী জয় করিতে চায়; মন্ত্রী মানুষ ধনঞ্জয়, সে যন্ত্রের আঘাত অতিক্রম করিয়া পৃথিবীতে জয়ী হইতে চায়; আর অভিজিৎ বলে যে মানুষকে প্রাণের দ্বারা যন্ত্রের কবল হইতে রক্ষা করিতে হইবে।

বিভূতি ও অভিজিৎ উভয়েই উত্তরকূটের মানুষ। উত্তরকূটেই যন্ত্রের উদ্ভব! বিভূতি বলে উত্তরকূট যন্ত্রের রাজত্ব, অভিজিৎ বলে উত্তরকূট যন্ত্রোত্তর রাজত্ব। এখানকার লোকেই যন্ত্রের স্রষ্টা, আবার এখানকার লোকের হাতেই যন্ত্রের নাশ। এ কেমন করিয়া হইল? মানুষের সামাজিক বিবর্তনের পথে যন্ত্রবাদ একটা অবস্থা মাত্র, চরম অবস্থা নয়। যে বিবর্তনের ফলে মানুষ আজ যন্ত্রবাদে পৌঁছিয়াছে, সেই বিবর্তনেরই আরও খানিকটা অগ্রগতির ফলে সে একদিন যন্ত্রোত্তরবাদে পৌঁছিবে। যন্ত্রবাদ যদি আজকার অবস্থা হয়, যন্ত্রোত্তরবাদ আগামী কাল। বিভূতি আজকার মানুষ, অভিজিৎ মানুষ আগামী কালের। অভিজিতের মধ্যে সামাজিক বিবর্তনের পূর্ণতির রূপ। ইউরোপে যন্ত্রবাদের উৎপত্তি, আবার ইউরোপের মধ্যেই ইহার প্রতিবাদ আছে। যন্ত্রোত্তরবাদ ইউরোপেই প্রথম দেখা দিবে—তখন ইউরোপ নিজের যান্ত্রিক কীর্তিকে নিজেই নষ্ট করিবে।

১ রচনাবলী, ১৪শ খণ্ড, পৃঃ ৫৩২, ৫৩৩।

যুবরাজ বলেছেন কীর্তি গড়ে তোলবার গৌরব তো লাভ হয়েছেই, এখন কীর্তি নিজে ভাঙবার যে আরও বড় গৌরব তাই লাভ করো!

কিন্তু তাহা অনয়াসে ঘটিবার নয়, তাহার জন্য আত্মনাশের ও আত্মবিপ্লবের আবশ্যক। বিভূতি স্বহস্তে যন্ত্রকে নাশ করিতে পারে নাই, সে জন্য অভিজিতকে প্রাণ দিতে হইয়াছে। (যন্ত্ররাজ বিভূতি ও যন্ত্রোত্তররাজ অভিজিৎ—দুজনে মিলিয়াই উত্তরকূটের সম্পূর্ণ রূপ। তাহারা পরস্পর পরিপূরক—ইহা সর্বদা মনে রাখিতে হইবে।)

প্রচণ্ড শক্তির আধার বলিয়া যন্ত্রকে কবি স্বীকার করেন, মানুষের ব্যক্তিত্বেরই যেন তাহা প্রক্ষেপ। কিন্তু যন্ত্র যখন প্রাণের স্থান অধিকার করিয়া বাসয়া মানুষে মানুষে সম্বন্ধ বিষাক্ত করিয়া তোলে, মানুষের উপকরণ মাত্র না হইয়া মানুষই যন্ত্রের কাছে উপকরণ হইয়া পড়ে, তখন তাহা জীবনের মাধুর্য, সৌন্দর্য ও কল্যাণকে নাশ করে। তখনই যন্ত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিবার সময়। বিদ্রোহী তখন অনায়াসে প্রাণ দেয়, জীবন তাহার কাছে নগণ্য বলিয়া নয়, জীবন এমন অমূল্য, এমন সুন্দর যে তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য তাহার প্রাণ দান খুব দুর্লভ মূল্য নয়। অভিজিৎ কঠোরের সাধনায় নিরত বলিয়া আদৌ নীরস নয়, জীবনের সৌন্দর্য, কোমলতা, মাধুর্যের প্রতি সে একান্ত সচেতন—এত বেশি সচেতন যে এ সবের মূল্য হিসাবে সে আপনার জীবন দান করিতে উদ্যত।

সঞ্জয়। কিন্তু যুবরাজ, এই যে সন্ধ্যে হ'য়ে এসেছে, রাজবাড়ীতে ওই যে বন্দীরা দিনাবসানের গান ধরলে এরও কি কোন ডাক নেই? যা কঠিন তার গৌরব থাকতে পারে, কিন্তু যা মধুর তারও মূল্য আছে?

অভিজিৎ। ভাই, তারই মূল্য দেবার জন্য কঠিনের সাধনা।

সঞ্জয়। সকালে যে আসনে তুমি পূজায় বসো, মনে আছে তো সেদিন তার সামনে একটি শ্বেত পদ্ম দেখে তুমি অবাক হ'য়েছিলে! জানবার

আগেই কোন্ ভোরে ওই পদ্মটি লুকিয়ে কে তুলে এনেছে, জানতে দেয়নি সে কে, কিন্তু এইটুকুর মধ্যে কত সুধাই আছে সে কথা কি আজ মনে করার নেই? ভীরু যে আপনাকে গোপন করেছে, কিন্তু আপনার পূজা গোপন করতে পারেনি, তার মুখ তোমার মনে পড়ছে না?

অভিজিৎ। পড়ছে বইকি। সেইজন্যই তো সইতে পারছিনে ওই বীভৎসটাকে যা এই ধরণীর সঙ্গীত রোধ ক'রে দিয়ে আকাশে লোহার দাঁত মেলে অটহাস্য করছে। স্বর্গকে ভালো লেগেছে বলেই দৈত্যের সঙ্গে লড়াই করতে যেতে দ্বিধা করিনি।

সঞ্জয়। গোধূলির আলোটি ওই নীল পাহাড়ের উপরে মূর্চ্ছিত হ'য়ে রয়েছে এর মধ্যে দিয়ে একটা কান্নার মূর্তি তোমার হৃদয়ে এসে পৌঁছচ্ছে না?

অভিজিৎ। হাঁ, পৌঁছচ্ছে। আমারও বুক কান্নায় ভরে রয়েছে। আমি কঠোরতার অভিমান রাখিনে। চেয়ে দেখো, ওই পাখী দেবদারু গাছের চূড়ার ডালটির উপর একলা বসে আছে; ওকি নীড়ে যাবে, না, অন্ধকারের ভিতর দিয়ে দূর প্রবাসের অরণ্যে যাত্রা করবে জানিনে; কিন্তু ওযে এই সূর্যাস্তের আকাশের দিকে চুপ ক'রে চেয়ে আছে সেই চেয়ে থাকার সুরটি আমার হৃদয়ে এসে বাজছে, সুন্দর এই ছবিটি। যা কিছু আমার জীবনকে মধুময় করেছে সে সমস্তকেই আজ আমি নমস্কার করি।[১]

বিভূতি অভিজিতে মিলিয়াই যেমন উত্তরকূটের পূর্ণ পরিচয়, তেমনি কবি-মানস ও বিদ্রোহীব্যবহার মিলিয়াই অভিজিতের সম্পূর্ণ মূর্তি। যে মানুষ আগাগোড়াই কঠোর সে যদি যন্ত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে—তাহা যেন যন্ত্রের বিরুদ্ধে যন্ত্রেরই বিরোধ; তাহাতে মানবিক ট্র্যাজেডি নাই; অভিজিতের আত্মদান ট্র্যাজিক, কারণ, তাহা যন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রাণের বিদ্রোহ।

ধনঞ্জয় মারখানেওয়ালার ভিতরকার মানুষ। সে বলে, আমি মারের দ্বারা মারকে জয়ের চেষ্টা করিনা, আমি মারকে ছাড়াইয়া উঠিয়া মারকে

---

১ তদেব, পৃঃ ২০২-২০৩।

জয় করি। সে শিবতরাইয়ের নেতা। শিবতরাইয়ের অন্য সবাই কিন্তু ধনঞ্জয়ের শিক্ষা আয়ত্ত করিতে পারে নাই, তাহারা মারের দ্বারা মারকে জয় করিতে পারিলেই যেন বাঁচে। বিভূতি ও অভিজিৎ মিলাইয়া যেমন উত্তরকূট, তেমনি ধনঞ্জয় ও শিবতরাইয়ের অপর সকলে মিলিয়া শিবতরাই—অর্থাৎ মারখানেওয়ালার পূর্ণরূপ। তাহার মধ্যে যে অংশটা মানুষ, শিখা-স্বরূপ, সে বলে মারকে না-মারের দ্বারা জয় করিতে হইবে; আর যে-অংশ জন্তু, মাংসপিণ্ডমাত্র, সে মার খাইয়া হয় কাঁদে, নয় উল্টা-মার দেয়। উত্তরকূট যেমন অভিজিতের শিক্ষা লাভ করিতে পারে নাই, শিবতরাইও তেমনি ধনঞ্জয়ের শিক্ষা লাভে অসমর্থ। বাংলা চলিত প্রবাদে আছে যে ধনঞ্জয় মার খাইয়া শিক্ষা পাইয়াছিল, কিন্তু এ ধনঞ্জয় এমন যে মার খাইলেও তাহার শিক্ষা হয় না। এই প্রবাদ বাক্যটি স্মরণ করিয়াই কি কবি এই পাত্রটির নাম ধনঞ্জয় রাখিয়াছেন ?

রণজিতের সঙ্গে অভিজিতের প্রেমের সম্পর্ক। সে অভিজিতকে বুঝিতে পারে নাই বলিয়া তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছে, তাহাকে কারারুদ্ধ করিয়াছে। সম্পর্ক প্রেমের বলিয়াই অভিজিতের মৃত্যু তাহার পক্ষে ট্র্যাজিক হইয়াছে।

ডাকঘরেও প্রেম ও আচরণের এই দ্বৈত ভাব লক্ষিত হয়। মাধব দত্ত অমলকে ভালবাসে কিন্তু তাহাকে বোঝে না, ফলে ট্র্যাজেডির সৃষ্টি হইয়াছে। প্রেমের যথার্থ পূর্ণতার জন্য হৃদয় ও মস্তিষ্কের সম্মিলন প্রয়োজন। বুদ্ধি সম্পর্কহীন প্রেমানুভূতি মানুষকে মিলিত না করিয়া অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিচ্ছিন্ন করিয়া দেয়। রণজিৎ ও অভিজিৎ, মাধবদত্ত ও অমলের সম্পর্কের মধ্যে হৃদয় ও মস্তিষ্কের দ্বিধা হইতে এই কথাটি সুস্পষ্ট হইয়া ওঠে।

রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ নাটকেই একাধিক জনতা আছে। কিন্তু মুক্তধারার জনতা অনেক—ইহার প্রায় অর্দ্ধাংশই জনতার কথোপকথন। নাটকটি পথের কাহিনী, স্বভাবতই ইহার যোগ্য পাত্র-পাত্রী পথিক, মুক্তধারার জনতা পথিক জনতা। নাটকের চরম সঙ্কটের মুহূর্তে শিবতরাই ও উত্তরকূটের হাজার

হাজার লোক পথে বাহির হইয়া পড়িয়াছে। এই পথিক জনতার অধিকাংশই নামপরিচয় ও ব্যক্তিত্বহীন। পথিকের আবার পরিচয় কি?

জনতার আবার ব্যক্তিত্ব কি? মানুষ যখন এক তখন তাহার ব্যক্তিত্ব থাকে, কিন্তু যখন সে জনতার মধ্যে আত্মনিমজ্জন করিয়া দশের এক হইয়া যায় তখন তাহার ব্যক্তিত্ব ঘুচিয়া যায়; সমষ্টির পরিচয়েই তখন তাহার একমাত্র পরিচয়। কাজেই মুক্তধারার জনতার ব্যক্তিপরিচয় নাই, কিন্তু চমৎকার সমষ্টি-পরিচয় আছে।

উত্তরকূটের ও শিবতরাইয়ের লোকের জাতীয় পরিচয় তাহাদের কথাবার্তা হইতে বুঝিতে পারা যায়, ভুল করিবার কোন আশঙ্কা নাই।

উত্তরকূটের লোকের চরিত্রের প্রধান লক্ষণ অবজ্ঞা ও স্পর্ধা। শিবতরাই ও অন্যান্য দেশের লোককে তাহারা নিজেদের চেয়ে হীন মনে করে, তাহাদের প্রতি অনুকম্পামিশ্রিত হীনতার ভাব পোষণ করে। পৃথিবী যে তাহাদের ভোগত্র, উত্তরভৈরব যে বিশেষ করিয়া তাহাদেরই দেবতা—এ বিষয়ে তাহারা নিঃসন্দেহ। যন্ত্র ও প্রহারের শক্তি ছাড়া অন্য শক্তিতে তাহাদের আস্থা নাই।

আবার শিবতরাইয়ের লোক উত্তরকূটের ঐশ্বর্যে ও শক্তিতে ঈর্ষিত। উত্তরকূটকে মুখে তাহারা যতই উপেক্ষা করুক মনে মনে তাহাকে বড় মনে করে, তাহারা ধনঞ্জয়ের চেলা হইয়াও ধনঞ্জয়ের শিক্ষাকে গ্রহণ করিতে পারে নাই, কারণ ধনঞ্জয়ের ক্ষমা ও সহিষ্ণুতা দুর্বল ও হীনচৈতন্য ব্যক্তির দ্বারা লাভ করিবার নয়। ফলে ধনঞ্জয়ের মন্ত্র তাহাদের জীবনে সফল হয় নাই—মুখে মাত্র আবর্তিত হইতেছে; মনে মনে তাহারা লাঠি চালায়, মুখে কেবল ক্ষমার কথা। হয়তো উত্তরকূটের মারমুখো পাহাড়ীরাই প্রয়োজন কালে ধনঞ্জয়ের শিক্ষাকে যথার্থ ভাবে লাভ করিতে পারিবে।

উত্তরকূটের লোক আপনার দেশকে সন্দেহ করিয়া থাকে, কিন্তু সন্দেহটা এমনি বাতিক যে তাহার সীমানানিশ্চয় সম্ভব নয়। শিবতরাইকে সন্দেহ করিতে করিতে অবশেষে তাহারা বিভূতি, অভিজিৎ, রণজিৎ, মন্ত্রী সকলকেই সন্দেহ করিতে আরম্ভ করিয়াছে, সন্দেহের পরিধি যত বাড়িয়াছে আত্মীয়ের

পরিধি তত সঙ্কীর্ণ হইয়াছে—শেষ পর্যন্ত সে পরিধি সঙ্কীর্ণতম হইয়া নিজেতে মাত্র আসিয়া ঠেকিয়াছে—ব্যক্তিত্ববাদের ইহা অনিবার্য ট্র্যাজেডি।

উত্তরকূটের নাগরিকরা মোহনগড়ের রাজা বিশ্বজিৎকে সন্দেহ করিতে সুরু করিয়াছে। তাহাদের বিশ্বাস তিনি উত্তরকূটের প্রতিকূল, ইহার দণ্ড কি?

২। এর উচিত বিধান হচ্ছে—বুঝলে, দ'দা—

১। হাঁ, হাঁ, ওদের সেই সোনার খনিটা—

কুন্দন। আর জানিস তো ভাই, ওর গোষ্ঠে কিছু না হবে তো পঁচিশ হাজার গোরু আছে।

১। তার সব কটি গুণে নিয়ে তবে—কী অন্যায়! অসহ্য অন্যায—

৩। আর ওদের সেই জাফরাণের ক্ষেত, তার থেকে অন্ততঃ পক্ষে বৎসরে—১

এই সব উক্তির ব্যাখ্যার প্রযোজন হইলে আধুনিক ইউরোপীয় রাষ্ট্রেতিহাস হইতে প্রচুর নজির পাওয়া যাইবে।

নাটকের মধ্যে একটি গুরুমশাই আছেন, তাঁহাকে যেমনটি বলিয়া দেওয়া হইয়াছে ঠিক সেই ছাঁচে উত্তরকূটের ভাবী নাগরিক গঠন করিয়া তুলিতেছেন। জনতায় যাহাদের পরিচয় পাইলাম, গুরু মহাশয়ের গোকুলে তাহারা বাড়িয়া উঠিতেছে। Totalitarian রাষ্ট্রের হাতে পড়িলে শিক্ষা, দীক্ষা, সংস্কৃতি সব কেমন করিয়া রাষ্ট্রনীতির অনুকূল হইয়া গড়িয়া ওঠে, গুরু মহাশয় ও বালকগণ তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। গুরু মহাশয় চমৎকার একটি type; তাহার দোসর আধুনিক ইউরোপের কোন কোন রাষ্ট্রে সংখ্যায় প্রচুর।

---

১ তদেব, পৃঃ ২২৮

রক্তকরবী

রক্তকরবী নাটকের মর্মার্থ কি? স্পষ্টত ইহা দুই ভিন্ন শ্রেণীর সভ্যতার মধ্যে দ্বন্দ্বের ইতিহাস। কর্ষণজীবী ও আকর্ষণজীবী সভ্যতা বলিয়া রবীন্দ্রনাথ ইহাদের নামকরণ করিয়াছেন। আমরা বলিতে পারি কৃষিনির্ভর সভ্যতার সহিত যন্ত্রনির্ভর সভ্যতার দ্বন্দ্ব। এ দ্বন্দ্ব একটি আধুনিক সমস্যা। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ইহাকে নিছক আধুনিক সমস্যা বলিয়া স্বীকার করিতে রাজি নহেন। রবীন্দ্রনাথ বলিবেন, "আধুনিক সমস্যা ব'লে কোনো পদার্থ নেই। মানুষের সব গুরুতর সমস্যাই চিরকালের।" এ চিরকালীন সমস্যা যে কত বেশী পুরাতন তাহারই সন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া কবি রামায়ণের কাল পর্যন্ত গিয়াছেন। তাঁহার বিশ্বাস, রামায়ণে কথিত রাম-রাবণের দ্বন্দ্বে এই চিরকালীন সমস্যার একটি তৎকালীন রূপ পাওয়া যায়। প্রচলিতসংস্করণ রক্তকরবীর প্রস্তাবনাতে তিনি এই সমস্যাটির সম্যক্ আলোচনা করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, রক্তকরবী নাটকটির সহিত রামায়ণের মূলগত ঐক্যের কথাও বলিয়াছেন। তাঁহার মতে রামায়ণের সমস্যাই রক্তকরবীর সমস্যা। নাটকটির শিল্পসত্তা সম্বন্ধে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবার আগে তাহার তত্ত্বসত্তা সম্বন্ধে ধারণা স্পষ্ট করিয়া লওয়া আবশ্যক—তাই সমস্যাটি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ যেখানে যত আলোচনা করিয়াছেন তাহার কিছু কিছু উদ্ধার করিয়া দিতেছি। উদ্ধৃতি দীর্ঘ হইবে—কিন্তু সেই দীর্ঘতাই প্রমাণ করিবে, সমস্যাটি কত দীর্ঘকাল ধরিয়া রবীন্দ্রনাথের মনকে আলোড়িত করিয়া আসিতেছে।

প্রথমে রক্তকরবীর প্রস্তাবনা হইতে প্রয়োজনীয় অংশ গ্রহণ করা যাইতে পারে।

রামায়ণের গল্পের ধারার সঙ্গে এর যে একটা মিল দেখছি, তার কারণ এ নয় যে, রামায়ণ থেকে গল্পটি আহরণ-করা। আসল কারণ, কবিগুরুই আমার গল্পটিকে ধ্যানযোগে আগে থাকতে হরণ করেছেন। যদি বলো প্রমাণ কী, প্রমাণ এই যে, স্বর্ণলঙ্কা তাঁর কালে এমন উচ্চচূড়া নিয়ে প্রকাশমান ছিল, কেউ তা মানবে না। এটা-যে বর্তমান কালেরই, হাজার জায়গায় তার হাজার প্রমাণ প্রত্যক্ষ হয়ে আছে।

ধ্যানের সিঁধ কেটে মহাকবি ভাবীকালের সামগ্রীতে কি রকম কৌশলে হস্তক্ষেপ করতেন তার আর-একটি প্রমাণ দেব।

কর্ষণজীবী এবং আকর্ষণজীবী ,এই দুই জাতীয় সভ্যতার মধ্যে একটা বিষম দ্বন্দ্ব আছে, এ সম্বন্ধে বন্ধুমহলে আমি প্রায়ই আলাপ করে থাকি। কৃষিকাজ থেকে হরণের কাজে মানুষকে টেনে নিয়ে কলিযুগ কৃষিপল্লীকে কেবলি উজাড় করে দিচ্ছে। তা ছাড়া শোষণজীবী সভ্যতার ক্ষুধাতৃষ্ণা দ্বেষহিংসা বিলাসবিভ্রম সুশিক্ষিত রাক্ষসেরই মতো। আমার মুখের এই বচনটি কবি তাঁর রূপকের ঝুলিতে, লুকিয়ে আত্মসাৎ করেছেন, সেটা প্রণিধান করলেই বোঝা যায়। নবদূর্বাদলশ্যাম রামচন্দ্রের বক্ষসংলগ্ন সীতাকে স্বর্ণপুরীর অধীশ্বর দশানন হরণ করে নিয়েছিল, সেটা সেকালের কথা, না একালের? সেটা কি ত্রেতাযুগের ঋষির কথা, না আমার মতো কলিযুগের কবির কথা? তখনো কি সোনার খনির মালিকরা নবদূর্বাদলবিলাসী কৃষকদের ঝুঁটি ধরে টান দিয়েছিল?

আরও একটা কথা মনে রাখতে হবে। কৃষি যে দানবীয় লোভের টানেই আত্মবিস্মৃত হয়েছে, ত্রেতাযুগে তারি বৃত্তান্তটি গা-ঢাকা দিয়ে বলবার জন্যেই সোনার মায়ামৃগের বর্ণনা আছে। আজকের দিনে রাক্ষসের মায়ামৃগের লোভেই তো আজকের দিনের সীতা তার হাতে ধরা পড়ছে; নইলে গ্রামের পঞ্চবটচ্ছায়াশীতল কুটির ছেড়ে চাষীরা টিটাগড়ের চটকলে মরতে আসবে কেন। বাল্মীকির পক্ষে এ সমস্তই পরবর্তী কালের, অর্থাৎ পরস্ব।···রত্নাকর গোড়ায় ছিলেন দস্যু, তার পরে দস্যুবৃত্তি ছেড়ে ভক্ত হলেন রামের। অর্থাৎ

ধর্ষণবিদ্যার প্রভাব এড়িয়ে কর্ষণবিদ্যায় যখন দীক্ষা নিলেন তখনি সুন্দরের আশীর্বাদে তাঁর বীণা বাজল। এই তত্ত্বটা তখনকার দিনেও লোকের মনে জেগেছে। এককালে যিনি দস্যু ছিলেন তিনিই যখন কবি হলেন, তখনি আরণ্যকদের হাতে স্বর্ণলঙ্কার পরাভবের বাণী তাঁর কণ্ঠে এমন জোরের সঙ্গে বেজেছিল। হঠাৎ মনে হতে পারে, রামায়ণটা রূপক কথা, বিশেষত যখন দেখি রাম রাবণ দুই নামের দুই বিপরীত অর্থ। রাম হল আরাম, শান্তি; রাবণ হল চীৎকার, অশান্তি। একটিতে নবাঙ্কুরের মাধুর্য, পল্লবের মর্মর; আর-একটিতে শান-বাঁধানো রাস্তার উপর দিয়ে দৈত্যরথের বীভৎস শৃঙ্গধ্বনি।১

উদ্ধৃত অংশ হইতে জানিতে পারিলাম যে, রামায়ণে ও রক্তকরবীতে তত্ত্বগত ঐক্য আছে; উভয় কাব্যেরই তত্ত্বগত রূপ হইতেছে, দুই ভিন্ন শ্রেণীর সভ্যতার দ্বন্দ্ব; রত্নাকরের দস্যুবৃত্তি ত্যাগের মধ্যেও রবীন্দ্রনাথ একটা ইঙ্গিত দেখিয়াছেন; এমনকি রাম ও রাবণ নাম দুটিও তাঁহার নিকটে দুই ভিন্ন শ্রেণীর সভ্যতার রসে রঞ্জিত হইয়া প্রতিভাত হইয়াছে।

রামায়ণের তত্ত্ববিশ্লেষণের জের রবীন্দ্রনাথের অন্য রচনাতেও আছে, এবং আরও স্পষ্ট আকারে আছে। 'সীতা' শব্দটিতে তিনি একটি বিশেষ রূপক দেখিতে পাইয়াছেন। শুধু তাহাই নয়—রাম কর্তৃক হরধনুভঙ্গ, সীতার বিবাহ, অহল্যার শাপমুক্তি—সমস্তই একটি বৃহৎ রূপকের অংশ বলিয়া রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন,

রাম যখন বনের মধ্যে গিয়া কোনো কোনো প্রবল দুর্ধর্ষ শৈববীরকে নিহত করিলেন তখনই তিনি হরধনুভঙ্গের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন এবং তখনই তিনি সীতাকে অর্থাৎ হলচালনরেখাকে বহন করিয়া লইবার অধিকারী হইতে পারিলেন।...বিশ্বামিত্রের সঙ্গে রামচন্দ্র যখন বাহির

১ রক্তকরবী, রবীন্দ্ররচনাবলী ১৫শ খণ্ড, পৃ ৫৪৫-৫৪৬

হইলেন তখন তরুণ বয়সেই তিনি .তাঁহার জীবনের তিনটি বড়ো বড়ো পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। প্রথম, তিনি শৈবরাক্ষসদিগকে পরাস্ত করিয়া হরধনু ভঙ্গ করিয়াছিলেন; দ্বিতীয়, যে-ভূমি হলচালনের অযোগ্যরূপে অহল্যা হইয়া পাষাণ হইয়া পড়িয়া ছিল, ও সেই কারণে দক্ষিণাপথের প্রথম অগ্রগামীদের মধ্যে অন্যতম ঋষি গৌতম যে-ভূমিকে একদা গ্রহণ করিয়াও অবশেষে অভিশপ্ত বলিয়া পরিত্যাগ করিয়া যাওয়াতে যাহা দীর্ঘকাল ব্যর্থ পড়িয়া ছিল, রামচন্দ্র সেই কঠিন পাথরকেও সজীব করিয়া তুলিয়া আপন কৃষিনৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছিলেন; তৃতীয়, ক্ষত্রিয়দলের বিরুদ্ধে ব্রাহ্মণদের যে বিদ্বেষ প্রবল হইয়া উঠিতেছিল তাহাকেও এই ক্ষত্রঋষি বিশ্বামিত্রের শিষ্য আপন ভুজবলে পরাস্ত করিয়াছিলেন।[১]

উপরের অংশ হইতে সীতা নামের ব্যাখ্যা জানা গেল। সীতা কি, না মূর্তিমতী কৃষিবিদ্যা। তাহা হইলে নবদূর্বাদলশ্যাম রামচন্দ্র কর্তৃক সীতাবিবাহের অর্থ দাঁড়ায়—আর্যসমাজ কর্তৃক কৃষিবিদ্যাকে স্বীকার। আর রাবণ কর্তৃক সীতাহরণ এবং রাম কর্তৃক রাবণকে পরাজিত করিয়া সীতার উদ্ধারের মর্ম এই যে, আকর্ষণজীবী সভ্যতা কৃষিবিদ্যাকে ধ্বংস করিতে উদ্যত হইলে কর্ষণজীবী সভ্যতায় ও আকর্ষণজীবী সভ্যতায় একটা প্রবল লড়াই বাধিয়া ওঠে। সেই যুদ্ধে রাবণই কেবল পরাজিত হইল না, সামগ্রিকভাবে আকর্ষণজীবী সভ্যতার উপরে কর্ষণজীবী সভ্যতার আত্মপ্রতিষ্ঠা ঘটিল। 'জাভাযাত্রীর পত্রে' রবীন্দ্রনাথ এ বিষয়ে যে আলোচনা করিয়াছেন তাহাও পূর্বোদ্ধৃত অংশের এবং রক্তকরবী-তত্ত্বের পোষক।[২] কিন্তু সে সব উদ্ধারের আর আবশ্যক আছে

১ ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা, পরিচয়, রবীন্দ্ররচনাবলী ১৮শ খণ্ড, পৃ ৪৩২-৪৩৩। পরিচয়-গ্রন্থের প্রকাশকাল ১৯১৬ সাল। প্রবন্ধটির রচনাকাল আরও পূর্ববর্তী। ইহাতে বুঝিতে পারা যাইবে, রক্তকরবীতে যে তত্ত্ব প্রকাশিত কত দীর্ঘকাল ধরিয়া রবীন্দ্রনাথের মনে তাহা বিরাজ করিতেছিল।

২ জাভাযাত্রীর পত্র, ৭, পৃ ৪৭১-৪৭৫, রবীন্দ্ররচনাবলী ১৯শ খণ্ড

মনে করি না, যেহেতু এ পর্যন্ত যাহা বলা হইল তাহাতেই সমস্যার রূপটি বিশদ হইবার কথা।

। রামায়ণের সহিত রক্তকরবীর তত্ত্বগত ঐক্য প্রদর্শন করিয়াই রবীন্দ্রনাথ ক্ষান্ত হন নাই, নাটকটিকে যতদূর সম্ভব রামায়ণের প্যাটার্নে বা ছাঁচে ঢালাই করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। সীতাহরণ এবং তাহার ফলে লঙ্কাধ্বংস রামায়ণের মূল বিষয়; নাটকটিরও মূল বিষয় অনুরূপ, নন্দিনীকে যক্ষপুরীতে আনয়ন এবং যক্ষপুরীধ্বংস। লঙ্কাপুরীর রাবণ ও যক্ষপুরীর রাজার মধ্যেও সাদৃশ্য বর্তমান। রাক্ষসগণ আকর্ষণজীবী, তাহারা কর্ষণজীবিতার বিরোধী। যক্ষপুরীর খোদাইতন্ত্রও রূপান্তরে কি তাহাই নয়? এসব বিষয়ের বিচারে তুলনাকে বহুদূর পর্যন্ত টানিয়া লওয়া উচিত নয়, আভাস-ইঙ্গিতের চেয়ে অধিক প্রত্যাশা করা উচিত হইবে না। কবিও আভাস-ইঙ্গিতেই কাজ সারিয়াছেন, তবু বুঝিতে পারা যায়, রক্তকরবীকে ঢালাই করিবার সময়ে রামায়ণের ছাঁচটা তাঁহার মনে ছিল।

আমার পালায় একটি রাজা আছে। আধুনিক যুগে তার একটার বেশি মুণ্ড ও দুটোর বেশি হাত দিতে সাহস হল না। আদিকবির মতো ভরসা থাকলে দিতেম, বৈজ্ঞানিক শক্তিতে মানুষের হাত পা মুণ্ড অদৃশ্যভাবে বেড়ে গেছে। আমার পালার রাজা যে সেই শক্তিবাহুল্যের যোগেই গ্রহণ করেন, গ্রাস করেন, নাটকে এমন আভাস আছে। ত্রেতাযুগের বহুসংগ্রহী বহুগ্রাসী রাবণ বিদ্যুৎ-বজ্রধারী দেবতাদের আপন প্রাসাদদ্বারে শৃঙ্খলিত করে তাদের দ্বারা কাজ আদায় করত। তার প্রতাপ চিরদিনই অক্ষুন্ন থাকতে পারত। কিন্তু তার দেবদ্রোহী সমৃদ্ধির মাঝখানে হঠাৎ একটি মানবকন্যা এসে দাঁড়ালেন, অমনি ধর্ম জেগে উঠলেন। মূঢ় নিরস্ত্র বানরকে দিয়ে তিনি রাক্ষসকে পরাস্ত করলেন। আমার নাটকে ঠিক এমনটি ঘটেনি কিন্তু এর মধ্যেও মানবকন্যার আবির্ভাব আছে। তাছাড়া, কলিযুগের রাক্ষসের সঙ্গে কলিযুগের বানরের যুদ্ধ ঘটবে, এমনও একটা সূচনা আছে।

আদিকবির সাত কাণ্ডে স্থানাভাব ছিল না, এই কারণে লঙ্কাপুরীতে তিনি রাবণ ও বিভীষণকে স্বতন্ত্র স্থান দিয়েছিলেন। কিন্তু আভাস দিয়েছিলেন যে, তারা একই, তারা সহোদর ভাই। একই নীড়ে পাপ ও সেই পাপের মৃত্যুবাণ লালিত হয়েছে। আমার স্বল্পায়তন নাটকে রাবণের বর্তমান প্রতিনিধিটি এক দেহেই রাবণ ও বিভীষণ; সে আপনাকেই আপনি পরাস্ত করে।...

স্বর্ণলঙ্কার মতোই আমার পালার ঘটনাস্থানের একটি ডাক নাম আছে। তাকে কবি যক্ষপুরী বলে জানে।[১]

উদ্ধৃত অংশের সাক্ষ্যে যুক্তির বলে রামায়ণের ছাঁচের সহিত রক্তকরবীর ছাঁচের ঐক্য প্রমাণ করা যায় কি না সন্দেহ—তবে অনুভূতির বলে নিশ্চয় যায়। শিল্পবিচারে অনুভূতির সাক্ষ্যকেই বিশ্বাস করিতে হইবে।

যদিচ অনুভূতিই আমাদের প্রধান সাক্ষী এবং সে বেচারা ইঙ্গিতের বেশী দান করিতে সমর্থ নয়, তবু তাহার ইঙ্গিতময় সাক্ষ্যের অনুকূলে কতকগুলি তথ্যের উল্লেখ করিতে পারি, যাহাতে রক্তকরবী যে রামায়ণ-কাব্যের ছাঁচে ঢালাই-করা তাহা প্রমাণিত হইবে বলিয়া আমার বিশ্বাস।

রামায়ণ-কাব্যে রাম ও রাবণের দ্বন্দ্ব, তাহাদের দ্বন্দ্বের হেতু সীতাহরণ। এই ঘটনাটি রক্তকরবীতে ভাবরূপে দেখা দিয়াছে। রক্তকরবীর দ্বন্দ্ব কর্ষণজীবিতা ও আকর্ষণজীবিতার মধ্যে, মাঝখানে রহিয়াছে নন্দিনী। রবীন্দ্রনাথ সীতাকে মৌলিক অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন, সীতা অর্থাৎ হলচালন-রেখা। সোজা কথায় এই যে, সীতা কৃষিবিদ্যা, আর তাহাকে লইয়াই দ্বন্দ্ব দুই ভিন্ন গোত্রের সভ্যতায়। রক্তকরবীতেও দ্বন্দ্ব বাঁধিয়াছে দুই ভিন্নধর্মী সভ্যতায়, তাহাদের দ্বন্দ্বের কারণ নন্দিনী। তাহা হইলে এই নন্দিনী কে? নাটকখানি বুঝিবার পক্ষে নন্দিনীর মর্মগত পরিচয় জানা বিশেষ আবশ্যক, এবং তাহা বিশেষভাবে আলোচনা করিবার আশাতেই

১ রক্তকরবী, রবীন্দ্ররচনাবলী, ১৫শ খণ্ড, পৃ ৫২৭

এখন ক্ষান্ত হইলাম। আবার রামায়ণ ও রক্তকরবী দুই ক্ষেত্রেই দেখি আসল দ্বন্দ্বটা মানুষের সহিত যন্ত্রের দ্বন্দ্ব। রাক্ষস-সভ্যতা রবীন্দ্রনাথের মতে যান্ত্রিক সভ্যতা। রামায়ণ ও রক্তকরবীর শিবির সন্নিবেশের একপক্ষে প্রাণের মাধুর্য, অপরপক্ষে আত্মঘাতী ঐশ্বর্য; একপক্ষে আনন্দ, রাম ও রঞ্জন; রাম যে আনন্দ দান করে, রঞ্জন যে মনকে রাঙাইয়া তোলে; অপর-পক্ষে রাবণ ও যক্ষপুরীর অধীশ্বর। দুইখানি কাব্যেই দেখা যায়, প্রেমের সঙ্গে লুব্ধ প্রচেষ্টার সংঘাত; রাম সীতাকে প্রেমের দ্বারা আপন করিয়াছেন, রাবণের লুব্ধ প্রচেষ্টা তাহাকে হরণ করিয়াছে; রঞ্জন ও নন্দিনীর মধ্যেকার অদৃশ্য প্রেমসূত্রকে লুব্ধ মুগ্ধ ঈর্ষাপরায়ণ যন্ত্ররাজ বারংবার আঘাত করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিতে চাহিয়াছে। এসব তথ্য যেমন আকস্মিক নয়, তেমনি ইঙ্গিতময়ের অধিকও নয়, তবে কাব্যদুইখানি এক ছাঁচে ঢালাই বলিয়া অনুভূতির সাক্ষ্যে বিশ্বাস হইলে পূর্বোক্ত তথ্যগুলি সেই বিশ্বাসের বনিয়াদ দৃঢ়তর করিয়া দিবে বলিয়া মনে করা অন্যায় হইবে না।

২

নন্দিনী কে, আর রক্তকরবী বলিতে কবি কি বুঝিতেছেন? এ দুটি বিষয় পরিষ্কার হইলেই নাটকখানির মর্মগ্রহণ সহজ হইবে, কারণ নন্দিনী ও রক্তকরবীর গুচ্ছের মধ্যে একটা মর্মগত যোগ আছে। নন্দিনী যাহার মানবরূপ, রক্তকরবীপুষ্প তাহারই প্রতীকরূপ; রূপে ভিন্ন, স্বরূপে এক। কবি মানবকন্যা নন্দিনীর রূপে যে অর্থ প্রকাশ করিতে চাহিয়াছেন তাহাকেই আরও নৈর্ব্যক্তিক করিয়া, আরও পারিপার্শ্বিকশূন্য বিশুদ্ধ করিয়া, অর্থাৎ প্রতীকে পরিণত করিয়া, রক্তকরবীপুষ্পগুচ্ছরূপে প্রকাশ করিয়াছেন। আগে নন্দিনীর স্বরূপ ব্যাখ্যা কবির ভাষাতে শোনা যাক—

রক্তকরবীর সমস্ত পালাটি 'নন্দিনী' বলে একটি মানবীর ছবি।

চারিদিকের পীড়নের ভিতর দিয়ে তার আত্মপ্রকাশ। ফোয়ারা যেমন সংকীর্ণতার পীড়নে হাসিতে অশ্রুতে কলধ্বনিতে উর্ধ্বে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে, তেমনি। সেই ছবির দিকেই যদি সম্পূর্ণ করে তাকিয়ে দেখেন তাহলে হয়তো কিছু রস পেতে পারেন। নয়তো রক্তকরবীর পাপড়ির আড়ালে অর্থ খুঁজতে গিয়ে যদি অনর্থ ঘটে তাহলে তার দায় কবির নয়। নাটকের মধ্যেই কবি আভাষ দিয়েছে যে, মাটি খুঁড়ে যে পাতালে খনিজ ধন খোঁজা হয় নন্দিনী সেখানকার নয়, মাটির উপরিতলে যেখানে প্রাণের, যেখানে রূপের নৃত্য, যেখানে প্রেমের লীলা, নন্দিনী সেই সহজ সুখের, সেই সহজ সৌন্দর্যের।১

কবির সতর্কবাণী সত্ত্বেও নন্দিনীর স্বরূপ সন্ধান না করিয়া উপায় নাই এবং রক্তকরবীর পাপড়ির আড়ালে না হোক পাপড়ির সহিত মিলাইয়া লইয়াই নন্দিনীর স্বরূপ সন্ধান করিতে হইবে। নন্দিনী যদি অপর্ণা বা ইলা হইত তবে তাহার স্বরূপ সন্ধান করিবার কথা কাহারো মনে উঠিত না, তাহার রূপেই সকলে সন্তুষ্ট থাকিত। কিন্তু নন্দিনী যে-যক্ষপুরীতে আসিয়া পৌঁছিয়াছে সেখানে সকলেই কিছু-না-কিছু সন্ধান করিয়া মরিতেছে। সেখানকার অধ্যাপক ও পুরাণবাগীশ শব্দের অর্থ খুঁজিতেছে, সেখানকার খোদাইকরের দল মাটির তলায় সোনা খুঁজিয়া মরিতেছে, জালের আড়ালের রাজা নিজের অজ্ঞাতসারে নিজেকে সন্ধান করিতেছে, স্বয়ং নন্দিনী রঞ্জনকে খুঁজিতে আসিয়াছে—এমন আবহাওয়ায় হতভাগ্য সমালোচক যদি নন্দিনীর স্বরূপসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়, তাহাকে দোষ দেওয়া যায় না। তবে তাহার ভয়ের কারণ নাই, যেহেতু কবি স্বয়ং অন্যত্র নন্দিনীর স্বরূপ ব্যাখ্যা করিয়া পথপ্রদর্শন করিয়াছেন—

নারীর ভিতর দিয়ে বিচিত্র রসময় প্রাণের প্রবর্তনা যদি পুরুষের উদ্যমের মধ্যে সঞ্চারিত হবার বাধা পায়, তাহলেই তার সৃষ্টিতে যন্ত্রের প্রাধান্য ঘটে। তখন মানুষ আপনার সৃষ্ট যন্ত্রের আঘাতে কেবলই পীড়া দেয়, পীড়িত হয়।

১ গ্রন্থপরিচয়, রবীন্দ্ররচনাবলী, ১৫শ খণ্ড, পৃ ৫৪২

এই ভাবটা আমার রক্তকরবী-নাটকের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে। যক্ষপুরে পুরুষের প্রবল শক্তি মাটির তলা থেকে সোনার সম্পদ ছিন্ন করে আনছে। নিষ্ঠুর সংগ্রহের লুব্ধ চেষ্টার তাড়নায় প্রাণের মাধুর্য সেখান থেকে নির্বাসিত। সেখানে জটিলতার জালে আপনাকে আপনি জড়িত করে মানুষ বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন। তাই সে ভুলেছে, সোনার চেয়ে আনন্দের দাম বেশি; ভুলেছে, প্রতাপের মধ্যে পূর্ণতা নেই, প্রেমের মধ্যেই পূর্ণতা। সেখানে মানুষকে দাস করে রাখবার প্রকাণ্ড আয়োজনে মানুষ নিজেকেই নিজে বন্দী করেছে। এমন সময়ে সেখানে নারী এল, নন্দিনী এল; প্রাণের বেগ এসে পড়ল যন্ত্রের উপর, প্রেমের আবেগ আঘাত করতে লাগল লুব্ধ দুশ্চেষ্টার বন্ধনজালকে। তখন সেই নারীশক্তির নিগূঢ় প্রবর্তনায় কী করে পুরুষ নিজের রচিত কারাগারকে ভেঙ্গে ফেলে প্রাণের প্রবাহকে বাধামুক্ত করবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হল, এই নাটকে তা বর্ণিত আছে।১ ।

।স্বভাবতই সংসারের একটা দিক যান্ত্রিক, সামাজিক কাঠামো, অর্থনীতিক কাঠামো, রাষ্ট্রিক কাঠামো, সবই অল্পবিস্তর যান্ত্রিক, তাহাকে বাদ দিলে মানুষের চলে না, যেমন কঙ্কালের নীরস অথচ দৃঢ় কাঠামোটাকে বাদ দিলে মানবদেহের চলেনা। কিন্তু কঙ্কালের কাঠামোটাই সব নয়, তার উপরে রক্তমাংস আছে, এবং সবচেয়ে বেশি করিয়া আছে দেহের লাবণ্য ও মুখশ্রী। ঐখানেই মানুষের পরিচয়, কঙ্কালে কঙ্কালে ভেদ নাই। কবি বলিতে চান, যন্ত্র এবং প্রাণ, দার্ঢ্য ও প্রেম, কর্তব্য ও আনন্দ মিলাইয়াই জীবনের পূর্ণতা। কিন্তু কোনো কারণে কোনো সমাজে যদি যন্ত্রের দিকটাই প্রবল হইয়া ওঠে, তখন সে সমাজ মরিতে বসে। তখন সেই সমাজের মধ্যে হয় নন্দিনীর আবির্ভাব ঘটে, নয় সেই সমাজ ধ্বংস হয়। যক্ষপুরী সেইরকম একটি সমাজ। যন্ত্র সেখানে সর্বশক্তিমান হইয়া মানুষকে পীড়িত ও মনুষ্যত্বচ্যুত করিতেছে। যক্ষপুরীর

১ যাত্রী, পৃ ৩৮৪-৩৮৫, রবীন্দ্ররচনাবলী ১৯শ খণ্ড

সৌভাগ্য যে, মহতী বিনষ্টির আগেই সেখানে নন্দিনীর আবির্ভাব ঘটিয়াছে। নন্দিনী কিনা আনন্দদায়িনী।

গীতায় কথিত হইয়াছে যে, অধর্মের অভ্যুত্থান হইলে ভগবান অবতীর্ণ হন। তিনি মুক্তিদাতারূপে আসেন। নন্দিনী মুক্তিদাত্রীরূপে আসিয়াছে। যক্ষপুরীর সামাজে প্রাণেব অভাব ঘটিয়াছে, ধর্মের অভাবও বলা যাইতে পারে, কেননা, অধর্ম প্রাণহরণ দিয়া শুরু করে, প্রেমহরণ ও সৌন্দর্যদৃষ্টিহরণ করিয়া তাহার কাজের সমাপ্তি ঘটে।

পুরুষ সন্ধানস্বভাবী, সন্ধানের প্রেরণায় সে কেবলি অগ্রসর হইয়া চলিতেছে। কি বহির্বিশ্বে, কি অন্তর্লোকে, কোথাও তাহার সন্ধানের শেষ নাই। কেহ খুঁজিতেছে মাটির তলাকার সোনা, কেহ খুঁজিতেছে মনের তলাকার গূঢ়সত্তা; তাহার এই অনন্ত সন্ধানদৌড়ের আর শেষ নাই, এমন সময়ে সমাপ্তির অবগুণ্ঠনবতী নারী সেখানে আসিয়া উপস্থিত হয়। কর্তব্যের খাতিরে পুরুষ কেবলি যন্ত্র গড়িয়া চলিয়াছে, যন্ত্রকে দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর করিতেছে। এমন সময়ে নারী সেখানে আনে প্রেম। পুরুষ টানিতেছে বাহিরের দিকে, নারী টানিতেছে ভিতরের দিকে—দুই টানাটানিতে সমন্বয় ঘটিলে পূর্ণতার শতদল বিকশিত হইয়া ওঠে, সেই শতদলের উপরেই তো বিষ্ণুসনাথা লক্ষ্মীর আসন। পুরুষী শক্তি ও নারীশক্তির যথার্থ সমন্বয়ে সংসারের পূর্ণতা। কিন্তু বাস্তব সংসারে এমন পূর্ণতা কখনো কদাচিৎ ঘটিয়াছে। যক্ষপুরীতে তো ঘটেই নাই—পুরুষী শক্তি সেখানে প্রবল হইয়া উঠিয়া দুর্ভেদ্য যন্ত্রে আপনাকে দুর্জয় করিবার চেষ্টায় নিযুক্ত। তাই সেখানে নারীশক্তিরূপিণী, প্রাণের প্রতীক, প্রেমের প্রতীক, আনন্দের প্রতীক রূপে নন্দিনী আবির্ভূত। এই নাটকের মধ্যে নন্দিনী কোথা হইতে আসিল কবি বলেন নাই, ইচ্ছা করিয়াই বলেন নাই, প্রয়োজন নাই বলিয়াই বলেন নাই। বিশ্ববিধানের ইঙ্গিতে যে আসিয়াছে, সে সংবাদ বিশেষ করিয়া দিবার সার্থকতা কি?

নন্দিনীর স্বরূপ হয়তো কতকটা পরিষ্কার হইল। এবারে রক্তকরবী পুষ্প বলিতে কবি কি বোঝেন দেখা যাক আগেই বলিয়াছি যে, নন্দিনী ও

রক্তকরবী অভিন্ন। দুয়ের স্বরূপ এক, কিংবা বলা চলে যে নন্দিনীর প্রতীক রক্তকরবীর পুষ্পগুচ্ছ।

এবিষয়ে একখানি পত্রের অংশবিশেষ উদ্ধার করা যাইতেছে—

\ মৃত্যুর অল্প কিছুদিন পূর্বে একদিন কথাপ্রসঙ্গে কবি বলিয়াছিলেন—দেখুন, প্রাণের জন্য ভয় নাই। উপনিষদ বলেন, প্রাণই সত্য, তার মৃত্যু নেই, ভয় ছিল জড়ের জন্য। বিজ্ঞান বলছেন, প্রকৃতির হাতে রচিত যে বস্তু তারও মৃত্যু নেই। মরে যতসব মানুষের রচা কৃত্রিম অসত্য বস্তু। রক্তকরবীতে আমি সে কথা বলেছি। হাজার বাঁধনে বেঁধেও, শত চাপা দিয়েও প্রাণকে কে কবে মারতে পেরেছে? আমার ঘরের কাছে একটি লোহালক্কড়-জাতীয় আবর্জনার স্তূপ ছিল। তার নীচে একটা ছোট্ট করবীগাছ চাপা পড়েছিল। ওটা চাপা দেবার সময়ে দেখতে পাই নি, পরে লোহাগুলি সরিয়ে আর চারাটুকুর খোঁজ পাওয়া গেল না। কিছুকাল পরে হঠাৎ একদিন দেখি ঐ লোহার জালজঞ্জাল ভেদ ক'রে একটি সুকুমার করবীশাখা উঠেছে একটি লাল ফুল বুকে করে। নিষ্ঠুর আঘাতে যেন তার বুকের রক্ত দেখিয়ে সে মধুর হেসে প্রীতির সম্ভাষণ জানাতে এলো। সে বললে, ভাই মরি নি তো, আমাকে মারতে পারলে কই? তখন আমার মনের মধ্যে এই বিষয়ের প্রকাশ বেদনা দিল। নাটকটাকে তাই 'যক্ষপুরী' 'নন্দিনী' প্রভৃতি বলে আমার মন তৃপ্ত হয়নি, তাই নাম দিলাম 'রক্তকরবী'।[১]

পত্রখানির মর্ম অবগত হইবার পরে রক্তকরবীর স্বরূপ সম্বন্ধে আর সন্দেহ থাকা উচিত নয়। "চারিদিকের পীড়নের ভিতর দিয়ে তার [নন্দিনীর] আত্মপ্রকাশ। ফোয়ারা যেমন সংকীর্ণতার পীড়নে হাসিতে অশ্রুতে কলধ্বনিতে ঊর্ধ্বে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে, তেমনি।" রক্তকরবীর চারাটিও তো লোহার স্তূপের জালজঞ্জালে চাপা পড়ে নাই। নাটকে আছে যে, যক্ষপুরীর একান্তে

১ বর্তমান লেখকের নিকটে লিখিত পণ্ডিত শ্রীক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রীর পত্র

অনাদরে অবহেলায় আবর্জনাস্তূপের নিকটে একটিমাত্র রক্তকরবীর গাছ আছে। যক্ষপুরীর যে ব্যবস্থা তাহাতে রক্তকরবীর গাছ অধিক থাকিবার কথা নয়। সে ফুলের সন্ধানও আবার রাখে কিশোর নামে একটি বালক। ভালোবাসার দৃষ্টিতে সে নন্দিনীকে দেখিয়াছে, তাই তাহার দৃষ্টিতে বুঝি রক্তকরবীর গাছটি আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। পত্রোল্লিখিত রক্তকরবীর চারাটি 'একটি ফুল ফুটাইয়া বলিয়া গেল যে, তাহাকে মারিয়া ফেলা সম্ভব হয় নাই। নাটকের শেষেও দেখি, যক্ষপুরীর কঠিন পাথরের উপরে বুকের রক্তের দাগে এক গুচ্ছ রক্তকরবীর ফুল ফুটাইয়া দিয়া রঞ্জন বিদায় লইয়াছে। সে যেন পত্রখণ্ডে লিখিত রক্তকরবীর চারাটির মতোই বলিয়াছে—'মরিনি তো, আমাকে মারতে পারলে কই'। প্রাণের প্রতি, প্রেমের প্রতি, আনন্দের প্রতি অর্থাৎ নন্দিনীর প্রতি রঞ্জন তো অবিশ্বাস পোষণ করে নাই। তবে আর মরিল কই? ঐসবের প্রতি অবিশ্বাসেই তো মৃত্যু। নাটকের চূড়ান্তে নন্দিনী ও রক্তকরবী এক হইয়া গিয়াছে, গিরিশিখরের চূড়ান্তে অস্তমান সূর্য ও জ্বলন্ত মেঘ যেমন করিয়া এক হইয়া যায়।

দুই-ই যদি এক, তবে পৃথক সত্তা বর্ণনার উদ্দেশ্য কি? নন্দিনী মানবকন্যা, মানবগুণ বা পারিপার্শ্বিক বাদ দিয়া তাহার মধ্যকার বিশুদ্ধ প্রাণরূপ দেখানো সম্ভব নয়। প্রাণের ও প্রেমের, আনন্দের ও সৌন্দর্যের রূপটিকে বিশুদ্ধভাবে দেখাইবার উদ্দেশ্যেই রক্তকরবীর অবতারণা করিতে হইয়াছে এবং তাহার উপরে প্রতীকের আরোপ করিতে হইয়াছে। কোনো বস্তুর বিশুদ্ধ রূপটি একমাত্র প্রতীকের দ্বারাই প্রকাশ সম্ভব।

৩

নন্দিনী-চরিত্র নাটকখানির প্রাণ। তাহার প্রাণবেগে নাটকের ঘটনা চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। যে যক্ষপুরী এতকাল স্তিমিতবেগে আপনার অভ্যস্ত পথে চলিতেছিল নন্দিনীর প্রাণপ্রবাহ আসিয়া পড়িয়া তাহাকে চঞ্চল করিয়া

তুলিয়া বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে বিভিন্ন প্রকার প্রতিক্রিয়া জাগাইয়া দিয়াছে। যক্ষপুরীর জীবনে নন্দিনী বেমানান, এখানে সে খাপ খায় নাই বলিয়া কেহ-বা তাহাকে আত্মসাৎ করিতে চাহিতেছে, আবার কেহ-বা তাহাকে একটা দুর্যোগ মনে করিয়া যক্ষপুরী হইতে বাহির করিয়া দিবার চেষ্টা করিতেছে। যক্ষপুরীর জড়-সংস্থাতে নন্দিনীরূপ প্রাণকণা এক বিপর্যয় ঘটাইবার মুখে—এমন অবস্থায় নাটকের সূত্রপাত।

জেলেদের জালে দৈবাৎ মাঝে-মাঝে অখাদ্য জাতের জলচর জীব আটকা পড়ে। তাদের দ্বারা পেট-ভরা বা ট্যাঁক-ভরায় কাজ তো হয়ই না, মাঝের থেকে তারা জাল ছিঁড়ে দিয়ে যায়। এই নাট্যের ঘটনাজালের মধ্যে নন্দিনী-নামক একটি কন্যা তেমনিভাবে এসে পড়েছে। মকররাজ যে বেড়ার আড়ালে থাকেন, সেইটেকে এই মেয়ে টিকতে দেয় না বুঝি।[১]

নাটকখানির অন্যান্য পাত্রপাত্রীকে বুঝিতে হইলে নন্দিনীর সঙ্গে তুলনা করিয়া, নন্দিনীর আবির্ভাবের পটভূমিকায় প্রক্ষেপ করিয়া তাহাদের বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ, নন্দিনীর আগমনে বিভিন্ন চরিত্রে যে অভাবিত প্রতিক্রিয়া জন্মিয়াছে তাহাকে লক্ষ্য করিতে পারিলেই তাহাদের মনের গতিবিধি বুঝিতে পারা যাইবে।

রাজা অধ্যাপক পুরাণবাগীশ কিশোর গোঁসাই ফাগুলাল চন্দ্রা বিশু ও সর্দার প্রভৃতি নাটকখানির প্রধান পাত্রপাত্রী। অবশ্য রঞ্জনও আছে, কিন্তু তাহাকে স্বতন্ত্র বিচার করিতে হইবে।

নন্দিনীর প্রতি রাজার মনে দুটি বিরুদ্ধ ভাব—একটা আকর্ষণের, একটা বিকর্ষণের ; একটা নন্দিনীর দিকে তাহাকে টানিতেছে, আর-একটা নন্দিনীকে তাড়াইয়া দিতে পারিলে সে বাঁচে। রাজা যেখানে যক্ষপুরীর অধীশ্বর, অর্থাৎ

১ নাট্যপরিচয়, রক্তকরবী, পৃঃ ৩৪২, রবীন্দ্ররচনাবলী ১৫শ খণ্ড

যক্ষপুরীর যন্ত্রসমূহের মধ্যে বৃহত্তম যন্ত্র, সেখানে নন্দিনীর প্রতি তাহাঁর বিকর্ষণ। রাজা অজ্ঞাতসারে বুঝিয়াছে যে, এই মেয়েটি তাহার যন্ত্রধর্মকে বিকল করিয়া দিবার জন্যই আসিয়াছে। কিন্তু রাজা যেখানে মানুষ, যক্ষপুরীর জটিল জালের আড়ালে থাকিয়া যেখানে তাহার মানব-হৃদয় অপর হৃদয়ের স্পর্শের জন্য ব্যাকুল, সেখানে নন্দিনীর প্রতি তাহার আকর্ষণ। যন্ত্রস্বভাব ও মানবস্বভাবের দ্বৈত উপকরণে যক্ষপুরীর রাজা গঠিত। তাহার দ্বৈত স্বভাবের পরিচয়দান-উপলক্ষে কবি বলিতেছেন—

"আমার পালায় একটি রাজা আছে। আধুনিক যুগে তার একটার বেশি মুণ্ড ও দুটোর বেশি হাত দিতে সাহস হল না। আদিকবির মতো ভরসা থাকলে দিতেম। বৈজ্ঞানিক শক্তিতে মানুষের হাত পা মুণ্ড অদৃশ্যভাবে বেড়ে গেছে। আমার পালার রাজা যে সেই শক্তিবাহুল্যের যোগেই গ্রহণ করেন, গ্রাস করেন নাটকে এমন আভাস আছে। ত্রেতাযুগের বহুসংগ্রহী বহুগ্রাসী রাবণ বিদ্যুৎবজ্রধারী দেবতাদের আপন প্রাসাদদ্বারে শৃঙ্খলিত করে তাদের দ্বারা কাজ আদায় করত। তার প্রতাপ চিরদিনই অক্ষুণ্ণ থাকতে পারত। কিন্তু তার দেবদ্রোহী সমৃদ্ধির মাঝখানে হঠাৎ একটি মানবকন্যা এসে দাঁড়ালেন, অমনি ধর্ম জেগে উঠলেন। মূঢ় নিরস্ত্র বানরকে দিয়ে তিনি রাক্ষসকে পরাস্ত করলেন। আমার নাটকে ঠিক এমনটি ঘটে নি কিন্তু এর মধ্যেও মানবকন্যার আবির্ভাব আছে। তাছাড়া, কলিযুগের রাক্ষসের সঙ্গে কলিযুগের বানরের যুদ্ধ ঘটবে, এমনও এক সূচনা আছে।

আদিকবির সাত কাণ্ডে স্থানাভাব ছিল না,এই কারণে লঙ্কাপুরীতে তিনি রাবণ ও বিভীষণকে স্বতন্ত্র স্থান দিয়েছিলেন। কিন্তু আভাস দিয়েছিলেন যে তারা একই, তারা সহোদর ভাই। একই নীড়ে পাপ ও সেই পাপের মৃত্যুবাণ লালিত হয়েছে। আমার স্বল্পায়তন নাটকে রাবণের বর্তমান প্রতিনিধিটি এক দেহেই রাবণ ও বিভীষণ ; সে আপনাকেই আপনি পরাস্ত করে।"১

১ গ্রন্থপরিচয়, পৃঃ ৫৪৪, রবীন্দ্ররচনাবলী, ১৫শ খণ্ড

উপরের বর্ণনা হইতে মকররাজের যে পরিচয় পাইলাম তাহাতে জানা গেল যে, রাজা অমিতশক্তি। তাহার সহজাত বুদ্ধির সঙ্গে বৈজ্ঞানিক শক্তি যুক্ত হইয়া তাহাকে প্রবল ক্ষমতাশালী করিয়া তুলিয়াছে। আর জানিলাম যে, ধর্মবুদ্ধি ও পাপবুদ্ধি, বিভীষণ ও রাবণ, তাহার এক দেহেই বিরাজ করিতেছে। ইহা ছাড়া আরও একটি বিষয় জানিতে পারিলাম, তাহার বিপুল সমৃদ্ধির মাঝখানে একটি মানবকন্যার আবির্ভাব হইয়াছে।

এই মানবকন্যাটির স্পর্শের প্রতিক্রিয়ায় রাজার মধ্যেকার সহজাত মানব-বুদ্ধি ও চেষ্টায়ত্ত বৈজ্ঞানিক শক্তি, তাহার মধ্যেকার রাবণ ও বিভীষণ আন্দোলিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। এবং অবশেষে বৈজ্ঞানিক শক্তির উপরে মানববুদ্ধির, রাবণের উপরে বিভীষণের প্রতিষ্ঠা ঘটিয়াছে, রামায়ণের মতো ঘটনা-প্রবাহে ঘটে নাই, অর্বাচীন কালের শিল্পরীতি অনুসরণ করিয়া ভাবনাপ্রবাহে ঘটিয়াছে।

বিজ্ঞান মানুষকে শক্তি দিয়াছে, বিজ্ঞানের প্রভাবে মানুষ আজ দশানন ও সহস্রাক্ষ। কিন্তু বিপদ এই যে, মানুষ এই শক্তিকে নিজের কল্যাণকর্মে নিয়োগ করিতে জানে না। বালকের হাতে অস্ত্র পড়িলে তাহা দিয়া সে যেমন যথেচ্ছ আঘাত করিয়া একপ্রকার গৌরব অনুভব করে, অবশেষে তাহার ক্লান্ত হাত হইতে অস্ত্র খসিয়া পড়ে, মানুষের আজ তেমনি দশা। মানুষ আজ ক্লান্ত। এই ক্লান্তির অবসান হইতে পারিত, বৈজ্ঞানিক শক্তির চরিতার্থতা হইতে পারিত—যদি সে আপনার প্রাণধর্মের সহিত যন্ত্রধর্মকে কোনোরকমে মিলাইয়া লইতে পারিত। কিন্তু তাহা তো আজও হইয়া উঠিল না, বরঞ্চ দেখিতেছি যে, যন্ত্রের চাপে প্রাণ আজ পীড়িত। সেই পীড়া মানবসমাজ আজ হাড়ে হাড়ে অনুভব করিতেছে। মকররাজও সেই পীড়ায় পীড়িত, ক্লান্ত। তাই নন্দিনীর প্রতি তাহার এমন আকর্ষণ, তাই তাহার প্রতি একরকম সূক্ষ্ম প্রণয়ের ভাব সে অনুভব করে, তাই রঞ্জনের প্রতি তাহার ঈর্ষার অন্ত নাই। মুক্ত বিশুদ্ধ প্রাণরূপের প্রতি যন্ত্রপীড়িতের যে মনোভাব, নন্দিনীর প্রতি মকররাজ তাহাই অনুভব করিতেছে।

এ যেমন গেল তাহার একই দেহে প্রাণময় ও যন্ত্রময় সত্তার অস্তিত্ব, আবার দেখি সে একই দেহে রাবণ ও বিভীষণ। পাপের লালনের জন্য সে দায়ী বটে, কিন্তু তাহার প্রতি একটা প্রতিবাদও আছে তাহার মনে। নন্দিনী আসিবার আগেও ছিল, সুপ্ত ছিল; নন্দিনী আসিয়া সেই সুপ্ত প্রতিবাদকে জাগাইয়া দিয়াছে। যক্ষপুরীর জীবনের যে জটিল জালকে সে সৃষ্টি করিয়াছে, অবশেষে নিজের রচা যে জটিল জালখানার আড়ালে সে অন্তরাযিত, একদিন নন্দিনীর প্রেরণায় ও প্ররোচনায় তাহাকেই দীর্ণ করিয়া সে মুক্ত হইয়াছে, আপনার রচিত প্রাণহীন নিয়মতন্ত্রের বিরুদ্ধে সে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছে।

এ মুক্তি মানবের মুক্তি, জড়বাদের যন্ত্রবাদের অতিকায়িক নিষ্পেষ হইতে প্রাণের মুক্তি। রবীন্দ্রনাথ বলিতে চান, মানুষ যতই যন্ত্রাচ্ছন্ন হইয়া, জড়াচ্ছন্ন হইয়া পড়ুক না কেন, তাহার মৌলিক প্রাণধর্ম একেবারে বিনষ্ট হয় না। গুহার ভিতরে জল জমিতে জমিতে এক সময়ে যেমন পাথর ভেদ করিয়া তাহা উচ্ছ্বসিত হইয়া ওঠে, জড়ে ও যন্ত্রে চাপা-পড়া প্রাণও তেমনি মুক্তির মুহূর্ত খুঁজিতেছে—একদিন না একদিন স্বসমুখ বেগে উৎসারিত হইয়া উঠিবেই। কিন্তু তাহার জন্য চাই প্রাণের প্ররোচনা। নন্দিনী সেই প্ররোচনা বহিয়া যক্ষপুরীতে অবতীর্ণ।

উপরের উধৃত অংশে রবীন্দ্রনাথ পাপ ও পাপের মৃত্যুবাণের উল্লেখ করিয়াছেন। পাপ বলিতে তিনি কি বুঝিয়াছেন? জড়ের কাছে আত্মসমর্পণ-কেই তিনি পাপ বলিতেছেন। নন্দিনীর প্রাণবেগ যক্ষপুরীর জড়ধর্মের ভিত্তিকে শিথিল করিয়া দিয়া প্রাণের মুক্তির পন্থা সুগম করিয়া দিয়াছে।

এখানে রঞ্জনের ব্যাখ্যা সারিয়া লওয়া যাইতে পারে। রঞ্জন ও রাজা একই ধাতুতে গড়া—ইহা দ্বারা কবি বুঝাইতে চান যে, উভয়ের মধ্যে ধাতুগত সাদৃশ্য আছে। নন্দিনী রঞ্জনকে ভালোবাসে, আবার রাজার প্রতিও একটা আকর্ষণ অনুভব করে; যদিচ তাহাকে ভালোবাসা বলা চলে না। দু'য়ের প্রভেদের কারণ, রঞ্জন হইতেছে মানুষের বিশুদ্ধ রূপ, জড় ও যন্ত্রের ঊর্ধ্বে সে প্রতিষ্ঠিত। আর রাজা যন্ত্র-চাপা-পড়া মানুষ—তাহার মধ্যে মানুষের

বিশুদ্ধ রূপটা দেখিতে পাই না, জালের ফাঁকে ফাঁকে কিয়দংশমাত্র দেখি। তাই তাহার প্রতি নন্দিনীর আকর্ষণটা প্রেমে গিয়া পৌঁছাইতে পারে নাই, রঞ্জনের মধ্যে যে নির্মুক্ত মানবরূপ প্রত্যক্ষ তাহারই প্রতি নন্দিনীর প্রেমের আকর্ষণ। কবি বলিতে চান, প্রাণের স্বাভাবিক আকর্ষণ, গভীরতম আকর্ষণ মানুষের প্রতি; যন্ত্রের প্রতি তাহার মোহের ভাব থাকিতে পারে, শক্তির প্রতি তাহার বিস্ময়ের ভাব থাকিতে পারে, কিন্তু ভালোবাসিতে সে মানুষকেই বাসিবে। তাহার হাতের রক্তকরবীর রাখী মানুষের হাতের জন্যই নির্দিষ্ট হইয়া আছে।

সমাজ ও সংস্থার পক্ষে নিয়মতন্ত্র অপরিহার্য, কিন্তু সেই নিয়মতন্ত্র প্রাণের বিকাশের সহায়ক না হইয়া তাহার বিকাশের পক্ষে অন্তরায় হইয়া উঠিলে বিড়ম্বনায় পরিণত হয়। তখন তাহাকে ভাঙিবার প্রয়োজন হয়। যক্ষপুরীর নিয়মতন্ত্র অদৃশ্য প্রাচীরের দুর্ভেদ্যতা লাভ করিয়া যন্ত্রে পরিণত। তখন তাহাকে ভাঙিবার জন্য প্রাণের দ্বারা আঘাত করিতে হয়। তাহাকে ভাঙিবার অন্য উপায় নাই। ইহা রবীন্দ্রনাথের একটি সাধারণ ধারণা। তাঁহার অন্যান্য নাটকেও ইহার প্রয়োগ দেখিতে পাই। মুক্তধারা-নাটকে অভিজিৎ আপনার প্রাণ দিয়া মুক্তধারার বাঁধটাকে আঘাত করিয়াছে। অচলায়তন-নাটকের অন্তর্গত পঞ্চক আপনার দুর্বাধ প্রাণশক্তির প্রয়োগ করিয়াছে অচলায়তনের প্রাচীর ভাঙিবার উদ্দেশ্যে। অচলায়তনের আচার্য ও রক্তকরবীর রাজা—দুইয়েরই এক অবস্থা। তাহাদের খানিকটা নিয়মতন্ত্রের দ্বারা গ্রস্ত হইলেও তাহার বিরুদ্ধে একটা প্রতিবাদ তাহাদের মধ্যে আছে। শেষ পর্যন্ত যন্ত্রের বিরুদ্ধে এই প্রতিবাদেরই জয়লাভ ঘটিয়াছে। কিন্তু রক্তকরবী-নাটকের সকল পাত্র-পাত্রী এমন সৌভাগ্যবান্ নয়, তাহাদের অধিকাংশই নিয়মতন্ত্রের দ্বারা সর্বতোভাবে গ্রস্ত। সর্দার প্রভৃতির কথাই আগে ধরা যাক। সর্দার, মেজো সর্দার, ছোটো সর্দার প্রভৃতি কেবল নিয়মতন্ত্রের অঙ্গীভূত নয়, তাহারা এই নিয়মতন্ত্রকে অটুট রাখিবার কাজে নিযুক্ত। নিয়মতন্ত্র তাহাদের মনুষ্যত্ব নাশ করিয়াছে, আবার তাহারা নিয়মতন্ত্রকে রক্ষা করিতেছে—এইভাবে একটি বিষচক্রের সৃষ্টি করিয়াছে।

গোঁসাই ও চিকিৎসকও নিয়মতন্ত্রের ধারক ও বাহক। গোঁসাইয়ের কাজ ধর্মোপদেশ-দান। কিন্তু তাহার এমনি দুর্ভাগ্য যে ধর্মোপদেশকে সে নিয়মতন্ত্রের অনুগত করিয়াই দান করে। উপদেশের কৃতিত্ব সম্বন্ধে সে সর্দারকে জানায়—

বাবা, দন্ত্য-ন-পাড়া যদিও এখনো নড়নড় করছে, মূর্ধন্য-ণরা ইদানীং অনেকটা বেশ মধুর রসে মজেছে। মন্ত্র নেবার মতো কান তৈরি হল বলে। তবু আরো ক'টা মাস পাড়ায় ফৌজ রাখা ভালো। কেননা, নাহংকারাৎ পরো রিপুঃ। ফৌজের চাপে অহংকারটার দমন হয়, তার পরে আমাদের পালা :

এখানে 'ধর্মেই ধর্মের শেষ' নয়, ধর্ম এখানে সম্পদের হেতু, ধর্ম ও ফৌজ যমজ প্রহরী-যুগলের মতো এখানে নিয়মতন্ত্রের রক্ষক। ধর্ম যখন নিজ লক্ষ্য বিস্মৃত হয় তখন তাহার মতো বালাই আর নাই।

যক্ষপুরীর চিকিৎসক প্রাণ বাঁচাইবার জন্য মানুষকে চিকিৎসা করে না। মানুষকে যন্ত্রের পায়ে বলি দিবার উদ্দেশ্যেই সে মানুষকে রক্ষা করে।

অধ্যাপক বুদ্ধিজীবী বক্তি। কিন্তু যক্ষপুরীর এমনি আবহাওয়া যে তাহার বুদ্ধিটা নিয়মতন্ত্রের অনুগত হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু সর্দার প্রভৃতির মতো সে সম্পূর্ণ গ্রস্ত হয় নাই। কেননা, নন্দিনীকে দেখিয়া তাহার মনে ক্ষণে ক্ষণে উদ্‌ভ্রান্তি জন্মায়। নন্দিনীকে দেখিয়া সে বলে—

ক্ষণে ক্ষণে অমন চমক লাগিয়ে চলে যাও কেন। যখন মনটাকে নাড়া দিয়েই যাও, তখন না হয় সাড়া দিয়েই বা গেলে। একটু দাঁড়াও, দুটো কথা বলি।

সে বলে—

আমরা নিরেট নিরবকাশ-গর্তের পতঙ্গ, ঘন কাজের মধ্যে সেঁধিয়ে আছি ; তুমি ফাঁকা সময়ের আকাশে সন্ধ্যাতারাটি, তোমাকে দেখে আমাদের ডানা চঞ্চল হয়ে ওঠে। এস আমার ঘরে, তোমাকে নিয়ে একটু সময় নষ্ট করতে দাও।

যক্ষপুরীর সময় কাজের চাপে ভরাট, কোথাও ফাঁক নাই। নষ্ট করিবার মতো সময় যাহার আছে, বুঝিতে হইবে সর্বতোভাবে নিয়মতন্ত্রের অনুগত হইয়া সে পড়ে নাই।

বস্তুবাগীশ ও অধ্যাপকের তুলনায় পুরাণবাগীশ লোকটা এখানে নবাগন্তুক। সে এখানকার হালচাল ভালো বুঝিতে পারে না। অধ্যাপক তাহাকে বুঝাইয়া বলে—

পৃথিবীর প্রাণভরা খুশিখানা নিজের সর্বাঙ্গে টেনে নিয়েছে ওই আমাদের নন্দিনী। এই যক্ষপুরে সর্দার আছে, মোড়ল আছে, খোদাইকর আছে, আমার মতো পণ্ডিত আছে, কোতোয়াল আছে, জল্লাদ আছে, মুর্দফরাশ আছে, সব বেশ মিশ খেয়ে গেছে। কিন্তু ও একেবারে বেখাপ। চারদিকের হাটের চেঁচামেচি, ও হল সুরবাঁধা তম্বুরা।

অধ্যাপকের বিশ্বাস এই যে, কিছুকাল এখানে থাকিলেই পুরাণবাগীশ যক্ষপুরীর জনতার মধ্যে বেশ খাপ খাইয়া যাইবে।

ফাগুলাল ও চন্দ্রা স্বামীস্ত্রী। যক্ষপুরের জীবনে অভ্যস্ত হইলেও দেশের টানটা এখনো তাহাদের আছে। নবান্নের সময়ে দেশে ফিরিবার জন্য সর্দারের কাছে তাহারা ছুটি চাহিয়াছে। নন্দিনী যাহাদের মনে উদ্‌ভ্রান্তি জাগাইয়াছে ফাগুলাল তাহাদের অন্যতম। শেষ পর্যন্ত সে নন্দিনীর নেতৃত্বে চালিত বিদ্রোহীদলে যোগদান করিয়াছে। নন্দিনীর প্রতি তাহার আকর্ষণকে চন্দ্রা ঈর্ষার চক্ষে দেখে। ইহাতে বুঝিতে পারা যায়, সে এখনো নারীস্বভাবভ্রষ্ট

হয় নাই। যক্ষপুরের নরনারী সোনার রসে এমনি মশগুল যে, সামাজিক মানবের সাধারণ দোষটুকু হইতেও তাহারা বঞ্চিত।

কিশোর নবাগন্তুক খোদাইকর। যক্ষপুরী এখনো তাহাকে গ্রাস করে নাই, তাই সে নন্দিনীর প্রতি প্রীতির টান অনুভব করে। সেই প্রীতির টানে দুষ্প্রাপ্য রক্তকরবী ফুল জোগায় সে নন্দিনীকে, গান জোগায় যেমন বিশুপাগল।

বিশু পাগল। এক সময়ে সে নিয়মতন্ত্রের অধীন ছিল। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে অদৃষ্ট তাহাকে মুক্তি দিয়াছে। যক্ষপুরীতে এখন সে বেমানান, সেখানকার লোকে বলে পাগল, বাহিরের লোকে বলিবে মুক্তপুরুষ। এইরকম এক-একটা মুক্তপুরুষ বা পাগল বা ঠাকুরদাদা বা বাউল রবীন্দ্রনাথের অনেক নাটকেই আছে। বিশুকে সেই পর্যায়ের অন্তর্গত করিয়া বিচার করা উচিত। মুক্তধারা-নাটকে অভিজিতের সঙ্গে ধনঞ্জয় বৈরাগীর যে সম্বন্ধ, আলোচ্য নাটকে নন্দিনীর সঙ্গে সেই সম্বন্ধ বিশুপাগলের। দু'জনেই মুক্তপুরুষ, মুক্তিমন্ত্র দান করিয়া বেড়ানোই তাহাদের কাজ। তাহাদের মুক্তিমন্ত্রে উজ্জীবিত হইয়া অভিজিৎ ও নন্দিনী ছুটিয়াছে, যন্ত্রকে প্রাণের দ্বারা আঘাত করিয়া ভাঙিয়া ফেলিবার উদ্দেশ্যে।

৪

নাটকখানি যে কর্ষণজীবী ও আকর্ষণজীবী সভ্যতার মধ্যে দ্বন্দ্বমূলক তাহা বুঝাইবার জন্য কবি আবহসংগীতরূপে ফসলকাটার গানটিকে ব্যবহার করিয়াছেন। কিন্তু যক্ষপুরীর কানে সে গান প্রবেশ করে না, যাহারা সর্বতোভাবে যক্ষপুরীর ব্যবস্থার অঙ্গীভূত হইয়া গিয়াছে তাহাদের কানে অন্তত প্রবেশ করে না। নাটকটির ঘটনার কাল পৌষ, ফসলকাটার সময়; নবান্নের পর্ব আসন্ন। শীতকাল যেমন ফসলকাটার সময়, তেমনি আবার খোদাইকার্যের পক্ষেও প্রশস্ত—কালের ধর্মের মধ্যেই দ্বন্দ্বের কারণ নিহিত, কবি তাহার সদ্ব্যবহার করিয়াছেন।

একদিকে যক্ষপুরীর খোদাইকরের দল পৃথিবীর অন্ত্র ভেদ করিয়া সোনার তাল তুলিয়া আনিতেছে আর অন্যদিকে দূরে মাঠের মধ্যে ধ্বনিত হইতেছে—'পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে, আয় রে চলে'—কিন্তু পৌষের ডাক যক্ষপুরীর কাহার কানে ঢুকিতেছে ?

রাজার কানে ঢোকে না; নন্দিনী তাহার মনোযোগ আকর্ষণ করিলে সে শুনিতে পায় বটে, কিন্তু মাঠে গিয়া সে কি করিবে ভাবিয়া পায় না। আর শুনিতে পায় বিশু ফাগুলাল ও চন্দ্রা। কিন্তু ইহারা কেহই তো সর্বতো-ভাবে যক্ষপুরীর অন্তর্গত নয়। সর্দার ও খোদাইকরের দল শুনিতে পায় না, কিংবা শুনিতে পাইলেও পৌষের ডাককে একটা আপদ মনে করে, মনে করে যে যক্ষপুরীর ব্যবস্থাকে পণ্ড করিয়া দেওয়াই তাহার উদ্দেশ্য। ইহাতে বুঝিতে পারা যায়, পৌষের আসর হইতে, চাষের ক্ষেত হইতে, কৃষিতন্ত্র হইতে তাহারা দেহে ও মনে কতদূরে আসিয়া পড়িয়াছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার শেষবয়সের অনেকগুলি নাটকে আবহসংগীতের ইঙ্গিতের দ্বারা ভাবপ্রকাশের চেষ্টা করিয়াছেন। ফাল্গুনীর গীতিভূমিকা এবং মুক্তধারার ভৈরবপন্থী গান ইহার উত্তম দৃষ্টান্তস্থল। রক্তকরবী-নাটকের ফসলকাটার গান সেই পর্যায়ভুক্ত।

৫

রক্তকরবী-নাটকখানিকে বিশেষভাবে যন্ত্রবাদসমস্যার নাটক বলিয়া মনে করিবার কারণ নাই। \ বড়ো জোর যন্ত্রবাদকে একটা উপলক্ষ মনে করা চলিতে পারে। যন্ত্রবাদ বা Industrialism নাটকখানির ঘটনাংশ, কিন্তু ইহার ভাবনাংশ কি ? যন্ত্রবাদের প্রতিষ্ঠার ফলে নিয়মতন্ত্রের আতিশয্যে মানুষের হৃদয় কিরূপ অসাড় হইয়া পড়ে, অসাড় হৃদয় কিরূপে শুভাশুভবোধকে লঙ্ঘন করিতে থাকে, শুভাশুভবোধ লোপ পাইলে শক্তিমানের নিকটে দুর্বল কিরূপে প্রয়োজনসাধনের উপকরণে পরিণত হয়—তাহারই চিত্ররূপপ্রদর্শন এই নাটকের মুখ্য লক্ষ্য। যন্ত্রবাদসমস্যা উপলক্ষমাত্র। আরও সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে

যে, জড়ধর্মের সঙ্গে প্রাণধর্মের দ্বন্দ্ব প্রদর্শনই কবির উদ্দেশ্য। নন্দিনী প্রাণের প্রতীক, যক্ষপুরীর সামগ্রিক জীবন মানবস্বভাব বর্জন করিয়া জড়ের প্রতীকে পরিণত হইয়াছে। ইহার অনুরূপ রবীন্দ্রনাট্যপ্রবাহে আরও আছে। জ্ঞান-কৈবল্যের আতিশয্যে মানুষ কিরূপ মূঢ় হইয়া পড়ে অচলায়তন-নাটকে তাহাই প্রদর্শিত হইয়াছে। ক্ষমতাপিপাসায় মানুষের শুভবুদ্ধি কিরূপ বিকল হইয়া পড়ে তাহাই প্রদর্শিত মুক্তধারা-নাটকে; আর যন্ত্রবাদের অতিবাদিতায় মানুষ কিরূপ প্রাণহীন হয়, নির্জীব সোনার তাল তুলিতে তুলিতে মানুষ কিরূপ জড়পিণ্ডে পরিণত হয়, তাহারই প্রকাশ রক্তকরবীতে। তাই যন্ত্রবাদকে লক্ষ্য না মনে করিয়া উপলক্ষ মনে করাই উচিত, মানুষের মনের উপরে যন্ত্রবাদের আতিশয্যজাত প্রতিক্রিয়াটাই নাটকের লক্ষ্য। নাটক তিনটির মধ্যে আরও এক প্রকার যোগ বর্তমান। জ্ঞানকৈবল্যে মানুষের চিত্ত কিরূপ অসাড় হয় তাহার দৃষ্টান্ত অচলায়তন, ক্ষমতালোভে মানুষের হৃদয় কিরূপ জড়ধর্মী হইয়া পড়ে তাহার দৃষ্টান্ত মুক্তধারা, আর যন্ত্রবাদের ফলে মানুষের কর্মশক্তি কিরূপ বিকল হইয়া পড়ে তাহার দৃষ্টান্ত রক্তকরবী। রক্তকরবী-নাটকের কর্মপ্রবাহ বেগবান হওয়া সত্ত্বেও কর্মপ্রবাহের কেন্দ্রস্বরূপ রাজা স্বয়ং আপন সৃষ্ট জালের অন্তরালে আবদ্ধ। যে যন্ত্র মানুষের কর্মশক্তি বাড়াইয়া দেয় বলিয়া লোকের বিশ্বাস, কবি বলিতে চান, সেই যন্ত্রই শেষ পর্যন্ত মানুষের কর্মশক্তি হরণ করিয়া তাহাকে বন্দী করিয়া ফেলে। জালান্তরিত রাজা তাহারই দৃষ্টান্ত। জাল হইতে বাহির হইবার পরেই সে পুনরায় আপন কর্মশক্তি ফিরিয়া পাইয়াছে। অচলায়তনের প্রাচীর, মুক্তধারার বাঁধ, আর রক্তকরবীর জাল—তিনটিই প্রতীক; যথাক্রমে মানুষের বুদ্ধির জড়তার, ভালোবাসার নিরুদ্ধ স্রোতের এবং কর্মশক্তির বিকলতার প্রতীক। শেষ পর্যন্ত অচলায়তনের প্রাচীর ভাঙিয়া বুদ্ধি জড়তামুক্ত হইয়াছে, মুক্তধারাতে বাঁধ ভাঙিয়া অভিজিতের মৃত্যু ঘটায় আবদ্ধ স্রোতস্বিনী এবং রাজার হৃদয়ের ভালোবাসা পুনঃপ্রাবহিত হইয়াছে—আর রাজা আপন জাল ছিন্ন করিয়া ফেলিয়া তবেই আপন কর্মশক্তিকে ফিরিয়া পাইয়াছে।

৬

নাটকখানির পাত্রপাত্রী কেহই ব্যক্তিবিশেষ নয়—সকলেই শ্রেণীবিশেষ, কেহই ব্যক্তিরূপ নয়—সকলেই শ্রেণীরূপের প্রতিনিধি। প্রতিনিধি মানেই একপ্রকার প্রতীক। এমন হওয়াই স্বাভাবিক। কেননা, যন্ত্রবাদের ফলে মানুষের বৈশিষ্ট্য ক্রমেই লোপ পাইতেছে। কোনো বড়ো কলকারখানার সহরে গেলে দেখিতে পাওয়া যাইবে সহরটা একটা বিশাল দাবার ছক, তাহার বাড়িঘর পথঘাট সমস্তই নির্দিষ্ট ছাঁচে ঢালা। মানুষগুলো অবধি ছাঁচে ঢালা। কারখানায় প্রবেশ করিবামাত্র তাহারা সংখ্যায় পরিণত হয়। মনুষ্যত্বের অর্থ যদি মানুষের বিশিষ্ট স্বভাব বা গুণ হয় তবে বলিতে হইবে যন্ত্রবাদের প্রসারের ফলে মনুষ্যত্বের নিশ্চয়ই লোপ হইতেছে, আর তাহার স্থলে সংখ্যারূপের উদ্ভব হইতেছে। সংখ্যারূপ শ্রেণীরূপের চেয়ে আরও নির্গুণ, আরও ফিকা। এই ভাবটি প্রকাশের উদ্দেশ্যেই কবি যক্ষপুরীর পাড়াগুলিকে দন্ত্য-ন-পাড়া, মূর্ধন্য-পাড়া প্রভৃতি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, মানুষের ব্যক্তিগত নামের বদলে সংখ্যার ব্যবহার করিয়াছেন। যাহাদের ক্ষেত্রে সংখ্যা ব্যবহৃত হয় নাই তাহারাও নামের দ্বারা পরিচিত নয়, ব্যবসায়ের দ্বারা পরিচিত, যেমন অধ্যাপক, গোঁসাই, চিকিৎসক ইত্যাদি। বিশু যখন খোদাইকর ছিল তখন ছিল ৬৯-ঙ, তার পরে ব্যবসা পরিত্যাগ করিলে সে আপন নামের দ্বারা পরিচিত, তবু সে ব্যক্তিবিশেষ নয়; সে বিশুপাগল অর্থাৎ যে-কোনো পাগল। ফাগুলাল চন্দ্রা কিশোর স্বনামের দ্বারা পরিচিত—তাহারা এখনো সর্বতোভাবে যক্ষপুরীর অন্তর্গত হয় নাই, হইলে বিগতনাম হইয়া সংখ্যায় পরিণত হইবে, সন্দেহ নাই। আনন্দমঠে যেমন সবাই সন্ন্যাসী এবং সবাই একই ছাঁচের সন্ন্যাসী—অর্থাৎ কাহারো বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব নাই, যক্ষপুরীতেও অনেকটা সেইরকম আর কি। Regimented হইলে পর মানুষের বুদ্ধি ব্যক্তিত্ব কর্মধারা সব একই ছাঁচে ঢালাই হইয়া যায়। প্রতাপ ও ঐশ্বর্যের আতিশয্য সত্ত্বেও স্বয়ং মকররাজ নিজেই ছাঁচে-ঢালাই। কেবল

নন্দিনীতে বিশিষ্ট গুণ বা ব্যক্তিত্বের কিছু লক্ষণ আছে। কবি তাহাকে একেবারে সংখ্যায় পরিণত না করিলেও বিশিষ্ট গুণ ও ব্যক্তিত্ব যতদূর সম্ভব বর্জন করিয়া তাহাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, কারণ সে প্রাণের প্রতীক। কিন্তু মানুষ করিয়া গড়িতে গেলে কিছুপরিমাণ ব্যক্তিত্ব না দিয়া উপায় থাকে না, তাই নন্দিনীর গুণকে আরও নির্যাসিত করিয়া লইয়া রক্তকরবী প্রতীকের অবতারণা করিয়াছেন। প্রাণময় মানুষের নির্যাস নন্দিনী, নন্দিনীর নির্যাস রক্তকরবী; রক্তকরবী বিশুদ্ধ প্রতীক। এই নাটকের অপর প্রতীক লোহার জাল। লোহার জাল ও রক্তকরবীর মধ্যে দ্বন্দ্ব ঘটিয়া শেষ পর্যন্ত লোহার জাল ছিন্নভিন্ন হইয়া গিয়াছে। এবারে পূর্বে-উধৃত পত্রখানি স্মরণ করা যাক। লোহালক্কড়ের জঞ্জালের স্তূপে চাপা-পড়া রক্তকরবীর চারাটি মরে নাই, সুযোগ পাইবামাত্র ছোট্ট একটি লাল ফুল ফুটাইয়া সে বলিয়াছিল, জড় লোহার স্তূপ চাপা দিয়াও আমাকে মারিতে পারিলে কই; বলিয়াছিল, লোহার চাপে আমার বক্ষ বিদীর্ণ হইয়া রক্ত ঝরিতেছে বটে, তবু মরি নাই। আর যে কথাটি সে সঙ্কোচে বলিতে পারে নাই তাহা হইতেছে, প্রাণের কাছে ঐ জড় লোহার স্তূপেরই পরাজয় ঘটিল। সে অশ্রুত কণ্ঠে নন্দিনীর জয় ধ্বনিত করিয়াছিল। রক্তকরবী-নাটকখানিতেও শেষ মুহূর্তে নন্দিনীর জয় ধ্বনিত হইয়াছে।

রথের রশি

রথের রশি অনতিদীর্ঘ একটি তত্ত্বনাট্য। নাটকীয় লক্ষণ ইহাতে সামান্যই আছে; পাত্র-পাত্রীদের চরিত্রে ব্যক্তিত্ব আরোপের চেষ্টা হয় নাই কিম্বা নাটকীয় পরিণামকেও স্পষ্ট করিয়া তোলা হয় নাই। সূক্ষ্ম একটি কাহিনীর সূত্রকে অবলম্বন করিয়া নাটকের মূলগত ভাবটিকে কবিগুরু বিশ্লেষণ করিয়া গিয়াছেন। সেই মূলগত ভাবের গুরুত্বেই নাটকটির গৌরব। সেই ভাবটির ব্যাখ্যা করিবার আগে কাহিনীটির পরিচয় দেওয়া যাইতে পারে।

রাজ্যে সেদিন রথযাত্রার উৎসব। সকাল হইতে লোক জমিতে শুরু করিয়াছে, দূর-দূরান্তর হইতে তাহারা সমাগত, রথযাত্রা দেখিয়া জীবন ধন্য করিবে। কিন্তু রথ নড়িতেছে না। রথের দড়ি-টানা যাহাদের কাজ, তাহারা অনেক টানাটানি করিয়াও রথ নড়াইতে পারে নাই। দেশের অমঙ্গল আশঙ্কায় সকলেই উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছে।

পুরোহিত যথাভ্যস্ত মন্ত্র পড়িয়াছে, রথ নড়ে নাই। ক্ষত্রিয়েরা আসিয়া রশি টানিয়াছে, রথ নড়ে নাই। অবশেষে ধনিকদের ডাক পড়িল, তাহাদেরও চেষ্টার ত্রুটি হইল না, কিন্তু রথ তেমনি অচল রহিল। রাজ্যে আশঙ্কার চাপা আর্তনাদ উঠিল। সন্ন্যাসী ঠাকুর সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়া গেল, মহা দুঃসময় আসন্ন।

এমন সময়ে শ্রমিকেরা আসিয়া উপস্থিত হইল, রথ টানিবার আদেশ নাকি তাহারা পাইয়াছে। পুরোহিত, সৈনিক ও ধনিকগণের নিষেধ সত্ত্বেও তাহারা রথের রশি ধরিয়া টানিতে আরম্ভ করিল, আর সকলকে বিস্মিত করিয়া রথ নড়িয়া উঠিল। কিন্তু আর এক বিপদ্ উপস্থিত। রথ অভ্যস্ত

রাজপথে না চলিয়া জনপদের দিকে ছুটিল। পুরোহিত ভাবিল, তাহাদের মন্দিরের দিকে চলিয়াছে, সৈনিক ভাবিল, তাহাদের অস্ত্রাগারের দিকে ছুটিয়াছে, ধনিক ভাবিল, তাহাদের ধনভাণ্ডারের দিকে ছুটিয়াছে, সকলেই ভাবিল, তাহাদের সব চাপা পড়িল। তাহারা নিজ নিজ আবাসের মুখে ছুটিল। মেলার বিস্মিত নরনারী শুধাইল, একি রকম? এই প্রশ্নের উত্তর দিবার জন্য কবি আসিয়া উপস্থিত হইল।

২য় সৈনিক

একি উল্টো-পাল্টা ব্যাপার, কবি। পুরুতের হাতে চললো না রথ, রাজার হাতে না, মানে বুঝলে কিছু?

কবি

ওদের মাথা ছিল অত্যন্ত উঁচু, মহাকালের রথের দিকেই ছিল ওদের দৃষ্টি, নীচের দিকে নামলো না চোখ, রথের দড়িটাকেই করলে তুচ্ছ।

পুরোহিত

তোমার শূদ্রগুলোই কি এত বুদ্ধিমান, ওরাই কি দড়ির নিয়ম মেনে চলতে পারবে।

কবি

পারবে না হয়তো। একদিন ওরা ভাববে রথী কেউ ·ই, রথের সর্বময় কর্তা ওরাই। দেখো, কাল থেকেই শুরু করবে চেঁচাতে, জয় আমাদের হাল লাঙল চরকা তাঁতের। তখন এরাই হবেন বলরামের চেলা, হলধরের মাতলামিতে জগৎটা উঠবে টলমলিয়ে।

পুরোহিত

তখন যদি রথ একবার অচল হয়, বোধ করি, তোমার মতো কবির ডাক পড়বে, তিনি ফুঁ দিয়ে ঘোরাবেন চাকা।

কবি

নিতান্ত ঠাট্টা নয় পুরুত ঠাকুর।

পুরোহিত

রথ তারা চালাবে কিসের জোরে। বুঝিয়ে বলো।

কবি

গায়ের জোরে নয়, ছন্দের জোরে।

উদ্বিগ্ন মেয়েরা কবিকে জানাইল তাহারা যে এত পূজা-অর্চনা করিল, নৈবেদ্য উপহার দিল, তাহার কি ফল এই? ভক্তিতে রথ চলিল না—চলিল ম্লেচ্ছদের টানে!

কবি

পূজো পড়েছে ধুলোয়, ভক্তি করেছে মাটি।
রথের দড়ি কি পড়ে থাকে বাইরে।
সে থাকে মানুষে মানুষে বাঁধা,
দেহে-দেহে, প্রাণে-প্রাণে।
সেইখানে জমেছে অপরাধ, বাঁধন হয়েছে দুর্বল!

কবি বলিতে চান যে, শিথিল-গ্রন্থি রাশিতে যে টান পড়িয়াছে, সে টান রথ পর্যন্ত পৌঁছায় নাই কাজেই রথ ছিল অচল।

সংক্ষেপে ইহাই নাটকের কাহিনী।

এই নাটকটি সম্বন্ধে একটি লক্ষ্য করিবার মতো বিষয় আছে। ইহার পূর্বতন রূপের নাম ছিল রথযাত্রা, পরিবর্তিত রূপের নাম রথের রশি।[১]

নাটকটির পূর্বতন রূপ 'রথযাত্রা'য় কবির দৃষ্টি ছিল রথের উপরে, বর্তমান

১ "১৩৩০ সালের অগ্রহায়ণ সংখ্যা প্রবাসীতে (পৃঃ ২১৬—২২৫) রথযাত্রা নামে রবীন্দ্রনাথের একটি নাটিকা প্রকাশিত হয়। রথের রশি তাহারই পরিবর্তিত ও আগাগোড়া পুনর্লিখিত রূপ।" গ্রন্থ পরিচয়, পৃঃ ৫০০, র-র, ২২শ খণ্ড।

রূপে তাঁহার দৃষ্টি নিবদ্ধ রথের রশিটার উপরে। রথের রশি বলিতে কবি কি বুঝিতেছেন? নাটকের কবি রথের রশির ব্যাখ্যা করিয়াছে, সে বলিয়াছে।

মানুষের সঙ্গে মানুষকে বাঁধে যে বাঁধন, তাকে ওরা মানে নি। রাগী বাঁধন আজ উন্মত্ত হয়ে ল্যাজ আছড়াচ্ছে, দেবে ওদের হাড় গুঁড়িয়ে,

আবার—

> রথেব দড়ি কি পড়ে থাকে বাইরে।
> সে থাকে মানুষে মানুষে বাঁধা,
> দেহে-দেহে, প্রাণে-প্রাণে।
> সেইখানে জমেছে অপরাধ, বাঁধন হয়েছে দুর্বল!

মানুষে মানুষে, মানুষের সমাজে সমাজে যে স্বাভাবিক ও সামগ্রিক সম্বন্ধ, তাহাই রথের রশি। সেই রশিতে টান পড়িলে ইতিহাসের রথ নড়িয়া ওঠে, যে-রথের রথী হইতেছেন মানব-ভাগ্যবিধাতা। কিন্তু কোনও কারণে যদি রথের রশির গ্রন্থি শিথিল হয়, বাঁধন আল্গা হইয়া আসে, তখন দড়িতে টান পড়িলেও সে-টান রথ পর্যন্ত পৌছায় না, রথ অচল হইয়া থাকে। নাটকে রথ না চলিবার ইহাই কারণ।

নাটকে কবিগুরু দেখাইয়াছেন যে, রথের রশি দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে। মানুষ পরস্পরের প্রতি অবহেলার দ্বারা ইতিহাসের রথযাত্রার দড়িকে শিথিল করিয়া ফেলিয়াছে। পুরোহিত অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, সৈনিক অর্থাৎ ক্ষত্রিয়, আর ধনিক অর্থাৎ বৈশ্য, তিন শ্রেণীরই সমান অবজ্ঞা শ্রমিক অর্থাৎ শূদ্রদের প্রতি। শুধু তাহাই নয়, ঐ তিনের মধ্যেও আছে পরস্পরের প্রতি অবজ্ঞা ও ঘৃণার ভাব। আর মেলায় যেসব নরনারী সমবেত, নিজেদের অজ্ঞাতসারে রশিটার প্রতি অর্থাৎ মানবিক সম্বন্ধের প্রতি তাহারা ঘৃণার ভাব পোষণ করিতেছে। দড়িটার প্রতি তাহাদের ভক্তির অন্ত নাই, কিন্তু দড়িটা যাহার প্রতীক, সেই

মানবিক সম্বন্ধের প্রতি তাহাদের অপরিসীম অবজ্ঞা। যাহাদের টানে রথ চলিল, মেয়েদের ভাষায় তাহারা 'মেলেচ্ছ'।

কবিগুরু বলিতে চান যে, অবজ্ঞা, বিদ্বেষ ও হিংসা ঢুকিয়া পড়িয়া মানবিক সম্বন্ধকে আজ শিথিলগ্রন্থি করিয়া দিয়াছে, আর সেই জন্যই দড়িতে টান পড়িলেও সে-টানে রথ চলিতেছে না।

ইতিহাসের রথ একদিন ব্রাহ্মণের টানে চলিয়াছে, তারপরে ক্ষত্রিয়ের টানে ও বৈশ্যের টানে চলিয়াছে, এবারে শূদ্রের টানের প্রয়োজন। কারণ, তাহারাই সবচেয়ে অবজ্ঞাত। হইলও তাই, শূদ্রের টানে রথ চলিল। কবি বলিতেছেন—

ওদের দিকেই ঠাকুর পাশ ফিরলেন,
নইলে ছন্দ মেলে না।
একদিকটা উঁচু হয়েছিল অতিশয় বেশি,
ঠাকুর নীচে দাঁড়ালেন ছোটর দিকে,
সেইখান থেকে মারলেন টান,
বড়োটাকে দিলেন কাৎ ক'রে।
সমান ক'রে নিলেন তাঁর আসন।

আজ শূদ্রের টানে, ক্ষুদ্রের টানে, অবজ্ঞাতের টানে ইতিহাসের রথ নড়িয়া উঠিয়াছে, মানব-ভাগ্যবিধাতা ছোট-বড়র মধ্যে হেরফের ঘুচাইয়া লইতে উদ্যত হইয়াছেন, ইতিহাসের আজ এক সন্ধিক্ষণ।

২

এইখানে কবির সতর্কবাণী উচ্চারিত হইয়াছে। ছোটরা একদিন নিজেদের সর্বশ্রেষ্ঠ, সর্বোচ্চ ভাবিতে শুরু করিবে, তাহারাই এক গোষ্ঠী রচনা করিয়া অপর সকলকে ছোট ভাবিবে, অন্ত্যজ ভাবিতে আরম্ভ করিবে, ভাবিতে

আরম্ভ করিবে তাহারা রথের বাহন মাত্র নয়, তাহারাই রথী, তাহারাই সর্বময় কর্তা, তখন আবার রথের রশির বাঁধন আল্গা হইয়া পড়িবে, রথ পুনরায় অচল হইবে। সেদিন ডাক পড়িবে কবির। কবি রথ চালাইবে গায়ের জোরে নয়, ছন্দের জোরে।

কবি

আমরা মানি ছন্দ, জানি এক ঝোঁক হলেই তাল কাটে।
মরে মানুষ সেই অসুন্দরের হাতে
চালচলন যার একপাশে বাঁকা ;
কুম্ভকর্ণের মতো গড়ন যার বেমানান,
যার ভোজন কুৎসিৎ,
যার ওজন অপরিমিত।
আমরা মানি সুন্দরকে। তোমরা মানো কঠোরকে,
অস্ত্রের কঠোরকে, শাস্ত্রের কঠোরকে।
বাইরে ঠেলা-মারার উপর বিশ্বাস,
অন্তরের তাল-মানের উপর নয়।

আবার—

আমি তাল রেখে গান গাবো।

সৈনিক

কী হবে তার ফল ?

কবি

যারা টানছে রথ, তারা পা ফেলবে তালে তালে।
পা যখন হয় বেতালা,

তখন ক্ষুদে ক্ষুদে খাল খন্দগুলো
মারমূর্তি ধরে।
মাতালের কাছে রাজপথও হয়ে ওঠে বন্ধুর।

ছন্দভ্রষ্ট মানব-সমাজের মধ্যে ছন্দের পুনঃপ্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে যুগে যুগে কবির ডাক পড়ে। মানুষে মানুষে বিদ্বেষ, সমাজে সমাজে অবহেলা, দেশে দেশে হিংসা—সেই তো ছন্দপতন। সমগ্রকে না হইলে ছন্দ রক্ষা হয় না। কিন্তু আজ সমগ্রের যথাযথ সমাবেশ কোথায়? কে কাহার আগে যাইবে, কে কাহার চেয়ে শ্রেষ্ঠ, তাহারই তো প্রতিযোগিতা! ইহা আর কিছুই নয়, মানব সমাজের ছন্দভ্রংশের লক্ষণ। তাই কবির ডাক পড়িয়াছে ছন্দরক্ষার উদ্দেশ্যে।

কবি বলিয়াছেন যে, আমরা মানি সুন্দরকে। সুন্দর মানেই অঙ্গপ্রত্যঙ্গের যথাযথ সমাবেশ। ছন্দও তাই, শব্দের যথাযথ সমাবেশ। কিন্তু সেই যথাযথ সমাবেশ আজ কোথায়? সুন্দরের আদর্শ মনে সজাগ থাকিলেই কর্মপ্রবাহে ছন্দ দেখা দেয়। কিন্তু যেখানে সমাজে সমাজে মানুষে মানুষে বিদ্বেষ ও অবহেলা, যেখানে যথাযথ সমাবেশের অভাব, সেখানে ছন্দ কোথায়? এক তালে রশিতে টান না পড়িলে রথ চলিবে কেন? মানব-সম্বন্ধের তাল কাটিয়া গিয়াছে, রথ তাই চলিতেছে না। আজ শূদ্রের টানে রথ চলিল বটে, কিন্তু তারপরে একদিন—

আসবে উল্টোরথের পালা।
তখন আবার নতুন যুগের উঁচুতে নীচুতে হবে বোঝাপড়া।

কারণ কালক্রমে অমিতবীর্য শূদ্রদেরও মনে এই ধারণা জন্মিবে যে, তাহারাই শ্রেষ্ঠ, জগতে একমাত্র তাহারাই আছে। সর্বভোগ্য বসুন্ধরার পরিবর্তে শূদ্রভোগ্য বসুন্ধরা এই ধারণাই তাহাদের চালিত করিতে থাকিবে। তখন আসিবে উল্টোরথের পালা।

মানুষের সমাজকে বারে বারে তাল কাটিবার দুর্গতি হইতে রক্ষা করিবার একমাত্র উপায়—

এই বেলা থেকে বাঁধনটাতে দাও মন,
রথের দড়িটাকে নাও বুকে তুলে
ধূলায় ফেলো না।

মানব-সম্বন্ধ মানবের যদি অন্তরের বস্তু হইয়া ওঠে, তবেই মানব-সমাজ ছন্দভ্রষ্টতার অপরাধ হইতে মুক্তি পাইবে। এখানে সেই মানব-সম্বন্ধেরই প্রতীক রথের রশি। ইতিহাসের রথখানার চেয়ে যে-রশির টানে রথ চলে, সেই রশির উপরে কবি অধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন—আর সেইজন্যই পূর্বতন 'রথযাত্রা' নাটক পরতনরূপে 'রথের রশি' নাটকে পরিণত হইয়াছে।

তাসের দেশ

তাসের দেশ কিম্ভূত রসাশ্রিত তত্ত্বনাট্য। এই নাটকের মানুষ পাত্র-পাত্রীগণ ছাড়া আর সকলেই তাস-জাতীয় জীব। মানবসংসার হইতে বহু দূরে অবস্থিত একটি দ্বীপে তাহাদের বাস, সে-দ্বীপে তাসের দেশ। তাস-জাতীয় জীবগণের চেহারা, আচার ব্যবহার ও মনোবৃত্তি মানুষের সঙ্গে মেলে না, তাহাদের দেখিয়া কিম্ভূত মনে হয়, তাহাদের জীবনযাত্রা দেখিয়া নাটকের মানব পাত্রদের মনে কিম্ভূত রসের উদয় হইয়াছে, তাই নাটকটিকে কিম্ভূত রসাশ্রিত বলা হইল।

প্রথম দৃশ্যে দেখিতে পাই যে, রাজপুত্র রাজপুরীর অভ্যস্ত জীবনযাত্রায় নিতান্ত অস্বস্তি বোধ করিতেছে, পূর্ণ জীবনের সন্ধানে সে নিরুদ্দেশের মুখে বাহির হইয়া পড়িতে চায়। সদাগরের পুত্রকে সঙ্গে লইয়া সে নৌকা ভাসাইয়া দিল-এবং ভরাডুবি হইয়া তাসের দেশের তীরে আসিয়া উঠিল।

এতদিন তাস ও তাসীগণ তাহাদের অভ্যস্ত জীবনের মধ্যে বাঁধা নিয়মে তালে তালে পা ফেলিয়া বেশ আরামেই ছিল। মানুষের জীবনের স্পর্শে এই প্রথম তাহাদের অভ্যাসের তাল কাটিয়া গেল, তাহারা দেখিল, তাহাদের জীবন-যাত্রা ছাড়াও অন্যরূপ জীবনযাত্রা সম্ভব; শুধু তাই নয়, এতদিন পরে তাহাদের নিজের চোখে তাহাদের জীবনকে নিতান্ত কিম্ভূত বলিয়া ঠেকিল। স্বাভাবিক জীবনের ধাক্কায় তাহাদের জীবনচক্রে অরাজকতা দেখা দিল, অভ্যস্ত বুলির বদলে তাহাদের মুখে গান ধ্বনিত হইল, বাঁধা ছকে চংক্রমণের পরিবর্তে তাহাদের হৃদয়ে প্রেমের অভ্যুদয় ঘটিল। সজীব বিশ্বাসের বেগে তাসের দেশের তাসের কেল্লা ধ্বসিয়া পড়িল—ইহাই নাটকখানির কাহিনী ও ভাবগত উপজীব্য।

যে-যৌবনের চঞ্চলতায় রাজপুত্র ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছে,

সেই চঞ্চলতাই জীবন্মৃতের মনে জীবনের সাড়া আনিয়া দিয়াছে, যাহারা ছিল জীবন্মৃত, তাহারা জীবিত হইয়া উঠিল, যাহারা ছিল তাস, তাহারা হইয়া উঠিল মানুষ। তাসের চেয়ে তাসীগণই আগে জীবনের ডাকে সাড়া দিয়াছে, পুরুষ পিছাইয়া ছিল, মেয়েদের দৃষ্টান্ত তাহাদের সঙ্কোচের গ্রন্থি শিথিল করিয়া দিয়াছে।

নাটকের উপসংহারের কিয়দংশ উধৃত করা যাইতে পারে—

রাজা

জানো, চাঞ্চল্য তাসের দেশে সবচেয়ে বড়ো অপরাধ।

রাণী

জানি, আর এও জানি, অপরাধটিই সবচেয়ে বড়ো সম্ভোগের জিনিষ।······বলো তোমরা, ইচ্ছের জয়।

সকলে

জয় ইচ্ছের জয়!

রাজা

রাণীবিবি তোমার বনবাস।

রাণী

বাঁচি তাহলে।

রাজা

নির্বাসন। ওকী চললে যে। কোথায় চললে?

রাণী

নির্বাসনে!

রাজা

আমাকে ফেলে রেখে যাবে?

রাণী

ফেলে রেখে যাবো কেন?

রাজা

তবে ?

রাণী

সঙ্গে নিয়ে যাবো।

রাজা

কোথায় ?

রাণী

নির্বাসনে।

সকলে

কোথায় গেল সেই মানুষরা।

রাজপুত্র

এই যে আছি আমরা।

রাণী

মানুষ হতে পারবো আমরা ?

রাজপুত্র

পারবে, নিশ্চয় পারবে।

রাজা

ওগো বিদেশী, আমিও কি পারবো ?

রাজপুত্র

সন্দেহ করি। কিন্তু রাণী আছেন তোমার সহায়। জয় রাণীর।

এই নাটকের তত্ত্ব রবীন্দ্র-সাহিত্যে নূতন নয়, নানা রচনায়, নানা ভাবে ইহা প্রকাশিত হইয়াছে, যৌবনের স্পর্শে জীবন্মৃতের চঞ্চলতা, জীবনের স্পর্শে জড়ের সংস্কারমুক্তির বার্তা ফাল্গুনী নাটকে বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে, বর্তমান ক্ষেত্রে তাহার বিস্তারিত আলোচনা বাহুল্য। নাটকটিতে দুইটি বিষয় লক্ষণীয়, কিম্ভূত রসের অবতারণা এবং রূপকথার কাঠামো। এই দুইটি লক্ষণই ইহার বৈশিষ্ট্য।

কবির দীক্ষা

কবির দীক্ষা নাট্যাকারে রচিত। এই রচনাটিকে নাটক বলা যায় কি না সে প্রশ্ন উঠিতে পারে। ইহাতে নাটকীয় কোন লক্ষণ দিবার চেষ্টা করা হয় নাই। ইহা দুই ব্যক্তির মধ্যে কথোপকথন মাত্র, আর কোন নাটকীয় লক্ষণ নাই। ব্যক্তি দুইজনকেও বিশিষ্ট করিয়া তুলিবার চেষ্টা হয় নাই। পাত্র দুইজনের মধ্যে একজন কবি অপরজন জিজ্ঞাসু ব্যক্তি।

এই ব্যক্তিটি একসময়ে কবির দলে ভর্তি হইয়া কবির কাছে দীক্ষা লইয়াছিল, কিন্তু পরে বিজ্ঞজনের তাড়ায় কবিকে পরিত্যাগ করিয়া তত্ত্বানন্দ স্বামীর কাছে দীক্ষা লইয়াছেন। তত্ত্বানন্দ স্বামী 'শিবমন্ত্র দেন তিনি প্রলয় সাধনায়।'

কবি বলিলেন যে—'শিবমন্ত্র দিই আমিও'।

এবারে কবি ও জিজ্ঞাসুর মধ্যে এ বিষয়ে যে কথোপকথন হইয়াছে তাহার কিয়দংশ শোনা যাইতে পারে। জিজ্ঞাসু বলিতেছে—

অবাক করলে,
তুমি তো জানি কবি,
কবে হলে শৈব।

কালিদাস ছিলেন শৈব
সেই পথের পথিক কবিরা।

কেন বলো বেঠিক কথা।
তোমরা তো মেতে আছ নাচে গানে

জগৎ-জোড়া নাচ গানেরই পালা।

আমাদের প্রভুর।

কী বলেন তত্ত্বানন্দ স্বামী।

ত্যাগের দীক্ষা নিয়েছি তাঁর কাছে।

যদি পরামর্শ দেন সবই ফুঁকে দিতে
তবে কী করবে ত্যাগ?
উপুর করবে শূন্য ঘড়াটাকে?

তুমি কাকে বলো ত্যাগ, কবি?

ত্যাগের রূপ দেখো ঐ ঝরণায়,
নিয়ত গ্রহণ করে তাই নিয়তই করে দান।
নিজকে যে শুকিয়েছে যদি সেই হ'ল ত্যাগী,
তবে সব আগে শিব ত্যাগ করুন
অন্নপূর্ণাকে।

উধৃত অংশ হইতে কবির ও তত্ত্বানন্দ স্বামীর মধ্যে পার্থক্যটা বুঝিতে পারা যাইবে। তত্ত্বানন্দ স্বামী সরাসরি ত্যাগের মন্ত্র দেন; জীবনকে গ্রহণের মন্ত্র তাঁহার কাছে পাওয়া যায় না। কবি দেন জীবনকে গ্রহণের মন্ত্র। কিন্তু কবি বলিবেন যে, ভোগের জন্য মাত্র গ্রহণ নয়; ত্যাগের আনন্দ লাভের জন্যই গ্রহণ। সঞ্চয়ের জন্যই সঞ্চয় নয়, ত্যাগের আনন্দ লাভের জন্যই সঞ্চয়। কবির কাছে বস্তুকে আত্মসাৎ ভোগ নয়, ত্যাগের আনন্দ লাভটাই যথার্থ ভোগ। সেই ভোগ যদি করিতে হয় তবে আগে সঞ্চয় করিতে অর্থাৎ জীবনকে গ্রহণ করিতে হইবে।

শিবের দুইটি মূর্তি আছে, একটি ত্যাগী, আর একটি অন্নপূর্ণেশ্বররূপে প্রার্থী। অন্নপূর্ণার নিকটে শিব প্রার্থনা করিতেছেন। সে অন্নপূর্ণা প্রত্যেক মানুষ; মানুষের কাছে শিব প্রার্থী। মানুষ রিক্ত হইলে দান করিবে কি? শিবের ভিক্ষা দানের জন্য মানুষকে প্রস্তুত হইতে হইবে।[১]

কবি ব্যাখ্যা করিয়া বলিতেছেন যে, আমরা অর্থাৎ ভারতীয়রা শিবের শ্মশানেশ্বর মূর্তিতেই মুগ্ধ হইয়া জীবনকে গ্রহণ করিতে ভুলিয়াছি। সেইজন্য যখন তিনি প্রার্থনার হস্ত বাড়াইয়া দেন, তাঁহাকে দান করিতে পারি না, তাই আমাদের অভাব আর ঘুচিতে চায় না। আর যে সঞ্চয় করিয়াছে সে ত্যাগ করিতে শেখে নাই বলিয়া তাহার ঐশ্বর্য ভারস্বরূপ হইয়া উঠিয়া তাহাকে অতলে তলাইয়া দেয়। সে ব্যক্তি ত্যাগ করিতে জানে না বলিয়া ভোগ করিতেও অসমর্থ হয়।

জিজ্ঞাসু শুধায়—'তবে কি য়ুরোপখণ্ডকে বলবো শিবের চেলা।'

কবি বলেন যে, সে কথা মিথ্যা নয়। য়ুরোপ মহাভিক্ষুর দাবী মানিয়াছে বলিয়াই 'ধনে-প্রাণে জ্ঞানে-মানে' এমন সম্পদ্‌শালী। কিন্তু ঐ সঙ্গে সতর্ক-বাণীও উচ্চারণ করিয়াছেন। য়ুরোপ গ্রহণ করিতে সমর্থ হইয়াছে বটে কিন্তু সঞ্চয়ের প্রকৃত উদ্দেশ্যটা যদি বিস্মৃত হয়, যদি ত্যাগ করিতে ভোলে, তবে তাহারাও মরিবে, আর তাহারই পূর্বাভাসস্বরূপ য়ুরোপখণ্ডে আজ এত অশান্তি।

কবির মতে ভারতবর্ষ শিবের রিক্ত মূর্তিটার মাত্র উপাসক; সে জীবনকে গ্রহণ করিতে শেখে নাই, কাজেই ত্যাগ করিবে কি? শিবের অভাব ঘুচাইতে অসমর্থ বলিয়াই তাহার নিজের অভাব ঘুচিতেছে না। আর য়ুরোপখণ্ড শিবের অন্নপূর্ণেশ্বর মূর্তিটার মাত্র উপাসক, জীবনকে সে গ্রহণ করিতে শিখিয়াছে বটে, কিন্তু যেহেতু শিবের ভিক্ষুক মূর্তি দেখে নাই, সঞ্চয়ের আসল উদ্দেশ্য সে বিস্মৃত হইয়াছে। য়ুরোপের ধন লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া তাহার ভারস্বরূপ, তাহার অশান্তির কারণ হইয়া উঠিয়াছে।

১ কবির দীক্ষার পূর্ব পাঠ ১৩৩৫ সালের বৈশাখ সংখ্যা মাসিক বসুমতী পত্রিকায় (পৃঃ ২-৪) শিবের ভিক্ষা নামে প্রথম মুদ্রিত হইয়াছিল।

২ পত্রিকা-পৃঃ ৫০৯, র-র, ২২শ খণ্ড।

য়ুরোপ ও ভারতবর্ষের হেরফের ঘুচাইবার উদ্দেশ্যে কবি ত্যাগের দ্বারা ভোগের দীক্ষা দান করিয়া বেড়াইতেছেন। ইহাই রচনাটির মূল ভাব।

এই মূল ভাবটি রবীন্দ্রনাথের রচনায় আদৌ নূতন নয়। তাঁহার পিতৃদেব উপনিষদের 'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ' মন্ত্রকে সাধনার বীজরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। কবির দীক্ষা রচনাটি সেই মন্ত্রেরই বিস্তার। কবির পূর্বতন অনেক রচনাতেই এই মন্ত্রের টীকা ও ব্যাখ্যা পাওয়া যাইবে।

অর্থাৎ ত্যাগের ও ভোগের সামঞ্জস্যেই পূর্ণ শক্তি। ত্যাগী শিব যখন একাকী সমাধিমগ্ন তখনও স্বর্গরাজ্য অসহায়, আবার সতী যখন তাঁর পিতৃ ভবনে ঐশ্বর্যে একাকিনী আবদ্ধ তখনও দৈত্যের উপদ্রব প্রবল। প্রবৃত্তি প্রবল হয়ে উঠলেই ত্যাগের ও ভোগের সামঞ্জস্য ভেঙে যায়।······এই জন্যেই ত্যাগের প্রয়োজন। এই ত্যাগ নিজেকে রিক্ত করবার জন্যে নয়, নিজেকে পূর্ণ করবার জন্যেই। ত্যাগ মানে আংশিককে ত্যাগ সমগ্রের জন্য, ক্ষণিককে ত্যাগ শিবের জন্য, অহংকারকে ত্যাগ প্রেমের জন্য, সুখকে ত্যাগ আনন্দের জন্য। এই জন্যই উপনিষদে বলা হইয়াছে, 'ত্যক্তেন ভঞ্জীথাঃ' ত্যাগের দ্বারা ভোগ করবে, আসক্তির দ্বারা নয়।[১]

কবির দীক্ষা রচনা হিসাবে সামান্য হইলেও রবীন্দ্রনাথের একটি মূল ভাবের আধাররূপে অসামান্য। ত্যাগ ও ভোগের মধ্যে যথার্থ সামঞ্জস্য বিধানের বাণী রবীন্দ্রনাথ সারাজীবন প্রচার করিয়াছেন। য়ুরোপের সঙ্গে ভারতবর্ষের এ বিষয়ে কোথায় প্রভেদ তাহাও দেখাইয়াছেন, আবার য়ুরোপ ও ভারতবর্ষ কিভাবে তাহাদের ত্রুটি সংশোধন করিয়া পরস্পরকে স্বীকারের দ্বারা পূর্ণতররূপে প্রকাশ হইতে পারে তাহারও ইঙ্গিত তিনি বহু রচনায় দিয়াছেন। কবির দীক্ষা সেইরূপ একটি ইঙ্গিত।

১ তপোবন, শান্তিনিকেতন, র-র, পৃঃ ৪৬৬, ১৪শ খণ্ড

তত্ত্বনাট্যের রূপান্তর ও নামান্তর

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার অনেক নাটককে পরবর্তীকালে রূপান্তর ও নামান্তর দিয়াছেন, তাহা ছাড়া নূতন সংস্করণের সময়েও অনেক নাটককে প্রভূত পরিমাণে সংস্কৃত করিয়াছেন। কোন কোন নাটকের রূপান্তর এত অধিক হইয়াছে যে, দু'খানিকে স্বতন্ত্র নাটক বলিয়াই গ্রহণ করা উচিত, যেমন রাজা ও রাণী এবং তপতী। কিন্তু এরূপ আমূল পবিবর্তনের বিষয় ছাড়িয়া দিলেও রূপান্তর ও নামান্তরভেদে অনেকগুলি নাটকের দুটি করিয়া রূপ প্রচলিত আছে। বর্তমানে আমরা তত্ত্বনাট্য পর্যায়ের রূপান্তর ও নামান্তরেরই আলোচনা করিব। এখানে আমাদের আলোচ্য বিষয় এই সব রূপান্তর ও নামান্তরের উদ্দেশ্য কি এবং তাহাতে রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার কি পরিচয় পাওয়া যায়।

সাহিত্যের সব শাখার মধ্যে নাটক সবচেয়ে বেশি বাস্তব-ঘেঁষা। বাস্তবের সঙ্গে সম্পর্ক হারাইলে তাহার এক মুহূর্তও চলে না। নাটক শ্রব্য কাব্য। দর্শক ও অভিনেতা, প্রযোজক ও লেখক -এতগুলির সুষ্ঠু সমন্বয় ঘটিলে তবে নাটকের রসোদ্বোধন ঘটে। নাট্যকারকে এই সব বাস্তব অবস্থার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া রচনা করিতে হয়। তারপরে যে উপলক্ষ্যে অভিনয় তাহার দাবীও আছে। সময়ের পরিবর্তনে রচনার পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়ে। তাছাড়া যোগ্যতর অভিনেতা দেখা দিলে তাহার শক্তির দাবীও মানিয়া লইতে হয়। এদিক দিয়া বিচার করিলে নাটককে যৌথ শিল্প বলা উচিত, যূথের যথাযথ সমাবেশেই নাটকের রসোৎকর্ষ।

এবারে বুঝিতে পারা যাইবে যে, নাটক লিখিয়া সমাপ্ত করিবার পরেও লেখক কেন তাহার পরিবর্তন করিতে বাধ্য হন। এমন পরিবর্তন

সব সময়ের সব দেশের নাটকেই ঘটিয়াছে। রবীন্দ্র-নাট্যের বহুল রূপান্তর ও নামান্তরের ইহা একটি প্রধান কারণ। কিন্তু একমাত্র কারণ নয়।

নাটকীয় প্রতিভা রবীন্দ্রনাথের বিশেষ শক্তি নহে। তাঁহার প্রতিভার অক্ষয় তূণীরে বহু অস্ত্র আছে, নাটকীয় প্রতিভা তাহাদের অন্যতম, কিন্তু সে অস্ত্র মুখ্যস্থানীয় নয়। বহু নাটক তিনি রচনা করিয়াছেন, সংখ্যার বিচারে তাঁহার সমগ্র রচনার মধ্যে কাব্যের পরেই নাটকের স্থান, এসবই সত্য। কিন্তু একথাও সত্য যে, রবীন্দ্রনাট্যে রবীন্দ্র-প্রতিভার মুখ্য প্রকাশ নয়। যে রচনায় প্রতিভার মুখ্য প্রকাশ, তাহাই নিখুঁৎ হইবার সম্ভাবনা; আর যে রচনায় প্রতিভার গৌণ শক্তির প্রকাশ, তাহাতে খুঁৎ থাকিয়া যাইবার আশঙ্কা। এই কারণেই রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ নাটকে অসম্পূর্ণতা রহিয়া গিয়াছে। আর সেই অসম্পূর্ণতার বোধই কবি-গুরুর মনে এক প্রকার অস্বস্তি জাগাইয়া রাখিয়াছে। আর এই অস্বস্তিবোধের ফলেই ঘুরিয়া ফিরিয়া তিনি নাটকগুলিকে ঢালিয়া সাজাইতে চেষ্টা করিয়াছেন মনে করিলে অন্যায় হইবে না। আমাদের এই সিদ্ধান্তের একটি পরোক্ষ প্রমাণ আছে। এক শ্রেণীর নাটককে আমরা কাব্যনাট্য বলিয়াছি, কর্ণ-কুন্তী সংবাদ, বিদায়অভিশাপ, নরকবাস, গান্ধারীর আবেদন প্রভৃতি এই শ্রেণীর অন্তর্গত। এই শ্রেণীর রচনায় নাটকের চেয়ে কাব্যের দাবী বেশি; ইহাদের অঙ্গে নাটকের লক্ষণের চেয়ে কাব্যের লক্ষণ অধিকতর প্রকট। আর যেহেতু রবীন্দ্রপ্রতিভার মুখ্য বিকাশ কাব্যে, গৌণ বিকাশ নাটকে, অধিকতর কাব্যলক্ষণাক্রান্ত এই সব নাটক সম্পূর্ণতর আকার লাভ করিয়াছে, ইহাদের অঙ্গে খুঁৎ নাই বলিলেও চলে। রবীন্দ্রনাথ পরবর্তীকালে অধিকাংশ নাটকের উপরে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, কিন্তু কাব্যনাট্য-গুলিকে আর স্পর্শ করেন নাই। অসম্পূর্ণতাজাত যে অস্বস্তিবোধ অন্য নাটকগুলি সম্বন্ধে ছিল, কাব্য-নাট্যগুলি সম্বন্ধে তাহা অনুভব করিবার কারণ তাঁহার মনে ছিল না।

অসম্পূর্ণ শিল্পসৃষ্টি সম্বন্ধে উচ্চাঙ্গের শিল্পীর মনে যে অস্বস্তি অনুভূত হইয়া

থাকে—তাহাই রবীন্দ্রনাথকে তাঁহার অধিকাংশ নাট্য রচনার উপরে বারংবার হস্তক্ষেপ করিতে বাধ্য করিয়াছে। এ বিষয়ে তুলনাস্থানীয় রবীন্দ্রনাথের দোসর গ্যয়টে। নাটকীয় প্রতিভা গ্যয়টের শ্রেষ্ঠ সম্পদ নয়, অথচ বহুতর নাটক তিনি রচনা করিয়াছেন এবং রবীন্দ্রনাথের মতোই একই কারণে তিনি বারংবার তাহাদের সংস্কার সাধন করিয়াছেন। এই সব সংস্কারের ফলে রূপান্তর ও নামান্তরগুলি সম্পূর্ণতর আকার লাভ করিয়াছে কিনা, সেটা বিচারের বিষয়। রবীন্দ্রনাথের বেলায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই করে নাই, রূপান্তর ও নামান্তরগুলি মৌলিক রচনার চেয়ে মোটের উপরে উন্নততর, সম্পূর্ণতর রচনা নয়। কিন্তু এই সব অসম্পূর্ণতার মধ্যেও কবির মনের ও প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যাইবে। সেই পরিচয় দানই এই আলোচনার উদ্দেশ্য।

ঋণশোধ

শারদোৎসব নাটকের নামান্তর ঋণশোধ। ঋণশোধের সহিত শারদোৎসবের প্রধান পার্থক্য ঋণশোধের ভূমিকা ও শেখর চরিত্রের সন্নিবেশ।১ ইহা ১৯২১ সালের কথা।

১৯২২ সালে কলিকাতায় ঋণশোধের অভিনয়ের সময়ে পূর্বোক্ত ভূমিকা পরিত্যক্ত এবং একটি নূতন ভূমিকা সংযোজিত হয়।২

এ-দুটি পরিবর্তন ছাড়া আরও পরিবর্তনের চিহ্ন ঋণশো.. বর্তমান।

১৯২১ সালে ঋণশোধ নাটক অভিনয় উপলক্ষ্যে কতকটা অংশ সংযোজিত হয়।৩

---

১ গ্রন্থ পরিচয়, র-র, ১৩শ খণ্ড, পৃঃ ৫৩৮—৪১

২ গ্রন্থ পরিচয়, র-র, ৭ম খণ্ড, পৃঃ ৫৪৭—৫১

৩ গ্রন্থ পরিচয়, র-র, ১৩শ খণ্ড পৃঃ ৫৩৮—৪১। ঐ পরিবর্তন, মুদ্রিত ঋণশোধ নাটকে নাই। অভিনয়ের ষ্টেজকপিতে বর্তমান। ঐ ষ্টেজকপি নাটকের শ্রুতিকার বর্তমান লেখকের নিকটে রক্ষিত।

১৯২১ সালের ভূমিকায় শারদোৎসবের সন্ন্যাসীকে সম্রাট বিজয়াদিত্যরূপে দেখানো হইয়াছে। তিনি শারদোৎসবে বাহির হইয়া পিঞ্জরীর বীণকার স্থরসেনের বীণা শুনিতে যাইবেন বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।

১৯২২ সালের ভূমিকায় নায়ক রাজা, মন্ত্রী, তাঁহাদের কোন বিশেষ পরিচয় দেওয়া হয় নাই। উভয়ের কথোপকথনে শারদোৎসবের অন্তর্নিহিত মর্ম ব্যাখ্যা করা হইাছে, কোন ঘটনার উল্লেখ নাই।

ঋণশোধ নাটককে শারদোৎসবের উচ্চতর সংস্করণ বলিয়া মনে হয় না। ভূমিকাগুলির একমাত্র উদ্দেশ্য নাটকের মর্ম ব্যাখ্যা। 'শারদোৎসব' নামে যাহা সাধারণভাবে উক্ত হইয়াছিল, 'ঋণশোধ' নামে তাহা স্পষ্টতর করিবার চেষ্টা হইয়াছে। রূপান্তর ও নামান্তরগুলির একটি প্রধান উদ্দেশ্য কবির আত্ম-ব্যাখ্যার ইচ্ছা। ব্যাখ্যার আতিশয্যের দ্বারা শিল্পবস্তু কদাচিৎ উন্নততররূপ লাভ করিয়া থাকে। এসব ক্ষেত্রে তাহার ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে মনে হয় না।

অরূপরতন

'রাজা' নাটকের নামান্তর অরূপ রতন। কিন্তু 'রাজা' নাটকের রূপান্তরও বর্তমান। 'রাজা' নাটকের প্রথম সংস্করণ ও রচনাবলী-সংস্করণে কিছু ভেদ আছে। প্রথম সংস্করণের চেয়ে রচনাবলী-সংস্করণ আকারে কিছু বড়। রচনাবলী সংস্করণের প্রথম দৃশ্যে অন্ধকার কক্ষ, স্থদর্শনা ও স্থরঙ্গমা কথোপকথনে নিযুক্ত। প্রথম সংস্কণের প্রথম দৃশ্যে পাই পথ এবং বিদেশী নাগরিকগণকে। অন্ধকার কক্ষকে দ্বিতীয় দৃশ্যরূপে দেখানো হইয়াছে। এদিক দিয়া বিচার করিলে প্রথম সংস্করণকে উন্নততর রূপ বলা চলে। বিদেশী নাগরিকগণের আলোচনায় যে কৌতূহল উদ্রিক্ত হয়, নাটকের গতির পক্ষে তাহা বিশেষ সাহায্য করে, সেই গতির বেগে অন্ধকার কক্ষের রহস্য গভীরতর হইয়া ওঠে। ইহা ছাড়া আর কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন দুই সংস্করণে নাই, রসেরও তারতম্য ঘটিয়াছে মনে হয় না।[১]

১ গ্রন্থ পরিচয়, র-র, ১০ম খণ্ড, পৃঃ ৬৪৮—৪৯

অরূপরতনের দুইটি সংস্করণ বর্তমান, একটি ১৩২৬ সালের, অপরটি ১৩৪২ সালের, দুটিই মূল নাটকের চেয়ে আকারে অনেক ছোট।

১৩২৬ সালের সংস্করণে অদৃশ্য রাজার উত্তর-প্রত্যুত্তরবর্জিত হইয়াছে। ১৩৪২ সালের সংস্করণে পুনরায় অদৃশ্য রাজার কথোপকথন প্রবিষ্ট হইয়াছে। এদিক দিয়া বিচার করিলে ১৩২৬ সালের সংস্করণকে উচ্চতর শিল্পসৃষ্টি মনে করা উচিত। কেননা, রাজা যদি দৃষ্টিগোচর না হন, তবে তাঁহার শ্রুতি গোচর হওয়াও উচিত নয়। চক্ষু যেমন ইন্দ্রিয় কর্ণও তেমনি আর একটি ইন্দ্রিয়। যিনি অতীন্দ্রিয় তিনি সব ইন্দ্রিয়ের পক্ষেই সমান অগোচর। ১৩২৬ সালের সংস্করণে রাজাকে ইন্দ্রিয়গোচর না করিয়াও তাঁহার প্রভাবকে সর্বব্যাপী করিয়া তোলা হইয়াছে। সেই প্রভাবের ফলেই নাট্য-ব্যাপার ঘটিতেছে বলিয়া দেখানো হইয়াছে। এই বিষয়ে উক্ত সংস্করণ 'রাজা' ও 'অরূপরতনে'র সমস্ত রূপান্তর ও নামান্তরের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু শুধু ঐটুকু দিয়া নাটকের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় না। এই সংস্করণে মূল পাত্র-পাত্রীকে গৌণ স্থান দিয়া বিভিন্ন শ্রেণীর জনতার কৌতুককর দৃশ্যগুলিকে মুখ্য করিয়া তোলা হইয়াছে এবং তার ফলে নাটকখানি লঘু হইয়া পড়িয়া রসহানি ঘটিয়াছে।

১৩৪২ সালের সংস্করণে অদৃশ্য রাজার কথোপকথন পুনরায় শ্রুত হইয়াছে। অন্য বিষয়ে ইহা প্রায় ১৩২৬ সালের সংস্করণের অনুরূপ।

সমগ্র রূপের বিচার করিলে বর্তমান লেখকের মতে রচনাবলী সংস্করণই শ্রেষ্ঠ, যদিচ অদৃশ্য রাজার কথাবার্তা একটি খুঁৎ বলিয়াই মনে হয়। ওটাকে একটা 'কনভেনশন' বা সংস্কাররূপে ধরিয়া লইতে আপত্তি আছে, যেহেতু ১৩২৬ সালের সংস্করণ প্রমাণ করিয়াছে যে, রাজাকে সর্বতোভাবে বাদ দিয়াও তাঁহার প্রভাবকে নাটকের মধ্যে সক্রিয় করিয়া তোলা সম্ভব।

গুরু

"সহজে অভিনয়যোগ্য করিবার অভিপ্রায়ে অচলায়তন নাটকটি 'গুরু'

নামে এবং "কিঞ্চিৎ রূপান্তরিত এবং লঘুতর আকারে প্রকাশিত করা হইল।"

মূল নাটকের চেয়ে 'গুরু' আকৃতিতে ছোট এবং প্রকৃতিতে লঘুতর হইয়াছে। মূল নাটকে পাত্রগণের মধ্যে যে সব তত্ত্বালাপ ছিল, নামান্তরে তাহাদের অনেক অংশ বাদ পড়িয়াছে। কিন্তু যে নাটকের প্রাণই হইতেছে তত্ত্ব, তত্ত্ব বাদ পড়িলে তাহা সব সময়ে সহজ-গ্রাহ্য হয় না, সহজে অভিনয়যোগ্য হইতে পারে। এই কারণেই নামান্তর মূল নাটকের চেয়ে দীনতর হইয়া পড়িয়াছে।

মূল নাটকের 'শোণপাংশু' নামান্তরে 'যূণক'। এ-পরিবর্তন অনুমোদন যোগ্য। কারণ 'শোণপাংশু'র প্রকৃত অর্থ না জানিয়াও অনুমান করা চলে যে, শোণিত যাহাদের পাণ্ডু বা ফিকা হইয়া আসিয়াছে। কিন্তু শোণপাংশুদের প্রকৃতির দ্বারা এ অর্থ সমর্থিত হয় না। 'যূণক' বলিতে যৌবনের ভাব এবং যবন বা বিদেশীর ভাব সূচিত হয়। যূণকের মধ্যে দুটি ভাবই আছে, তারা বিদেশীও বটে আবার যৌবনের দীক্ষা প্রাপ্তও বটে!

এই নামের পরিবর্তন বাদ দিলে অপর কোন বিষয়ে গুরু নাটকে কোন নূতন বা উন্নততর গুণের সমাবেশ হইয়াছে মনে হয় না।১

রথযাত্রা

রথের রশির পূর্বতন রূপ রথযাত্রা ১৩৩০ সালের অগ্রহায়ণ মাসের প্রবাসী পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। রথের রশি তাহারই পরিবর্তিত ও পুনর্লিখিত রূপ।২

রথযাত্রা ও রথের রশির মধ্যে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন দুটি। প্রথম নামটি, দ্বিতীয়, রথযাত্রা লিখিত গদ্যে, আর রথের রশি লিখিত গদ্যছন্দে।

রথযাত্রায় কবির দৃষ্টি রথখানার উপরে, আর রথের রশিতে তাঁহার দৃষ্টি

১ গ্রন্থ পরিচয়, র-র, ১৩শ খণ্ড পৃঃ ৫৩৭

২ গ্রন্থ পরিচয়, র-র, ২২শ খণ্ড পৃঃ ৫০৯—৫১০

যে-টানের জোরে রথখানা চলে, তাহার উপরে। দুইয়ে অনেক প্রভেদ। এবিষয়ে রথের রশি অধ্যায়ে আলোচনা করা হইয়াছে।

শিবের ভিক্ষা

কবির দীক্ষার পূর্বপাঠ ১৩৩৫ সালের বৈশাখ সংখ্যা 'মাসিক বসুমতী' পত্রিকায় শিবের ভিক্ষা নামে প্রথমে মুদ্রিত হইয়াছিল।১

এখানেও পরিবর্তন নামের। নামের পরিবর্তন ভাবের পরিবর্তন সূচনা করে। পূর্বতন পাঠে শিবকে বড় করিয়া দেখানো হইয়াছে, পরবর্তী আকারে শিবভক্ত কবিই প্রধান। 'কালিদাসের মতো আমাদের কবিও শৈব।'

আর একটি পরিবর্তন গদ্য হইতে গদ্যছন্দে, পূর্বতন পাঠ গদ্যে লিখিত, পরবর্তী পাঠ লিখিত গদ্যছন্দে।

তাসের দেশ

তাসের দেশ নাটকের প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৩৪০ সালে। দ্বিতীয় সংস্করণ সংশোধিত ও পরিবর্ধিত হইয়া বাহির হয় ১৩৪৫ সালে। রচনাবলীতে দ্বিতীয় সংস্করণের পাঠই গৃহীত হইয়াছে।

"প্রথম সংস্করণের 'ভূমিকা' অংশ দ্বিতীয় সংস্করণে পরিবর্তিত ও পরিশোধিত আকারে 'প্রথম দৃশ্যে' পরিণত হইয়াছে। পত্রলেখা চরিত্র নূতন সংযোজিত হইয়াছে।"২

সংস্করণভেদে তাসের দেশে রসের ও ভাবের তারতম্য ঘটে নাই।

রূপান্তর ও নামান্তরের উদ্ধৃত দৃষ্টান্তগুলি ছাড়াও রবীন্দ্রনাথের তত্ত্বনাট্যে কোথাও কোথাও সামান্য পাঠান্তর ঘটিয়াছে, কিন্তু সেসব তেমন উল্লেখযোগ্য নহে।

১ গ্রন্থ পরিচয়, র-র, ২২শ খণ্ড, পৃঃ ৫০৯—৫

২ গ্রন্থ পরিচয়, র-র, ২৩শ খণ্ড, পৃঃ ৫৪৩—৫৪৪

উপরের আলোচনা হইতে বুঝিতে পারা যাইবে যে, নাটকগুলির রূপান্তর ও নামান্তরের নানা কারণ বিদ্যমান, তন্মধ্যে বাস্তবের দাবী একটি হইলেও তাহা মুখ্য কারণ নয়। আসল কারণ অসম্পূর্ণ শিল্পসৃষ্টিকে সম্পূর্ণ ও নিখুঁত করিবার প্রয়াস। কিন্তু ইহাতে কবি সিদ্ধকাম হইয়াছেন মনে হয় না, যেহেতু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রূপান্তর ও নামান্তর মূল রচনার চেয়ে দীনতর মূর্তিতে দেখা দিয়াছে।[১] সেই সঙ্গে আছে অতি ব্যাখ্যা ও আত্মব্যাখ্যা করিবার ইচ্ছা এবং সেই ইচ্ছা হইতেই অনেক স্থলে একই নাটকে একাধিক ভূমিকা সংযোজিত হইয়াছে।

আরও একটি বিষয় লক্ষ্য করিবার মতো। নাটকের রূপান্তর ও নামান্তরে নূতন নামকরণ করিবার সময়ে কবি দুইটি নিয়ম অনুসরণ করিয়াছেন মনে হয়।

পূর্বনাম নির্বিশেষ হইলে নূতন নামে তাহাকে বিশিষ্ট করিয়া তুলিবার সঙ্কল্প। তাই শারদোৎসব হইয়াছে ঋণশোধ; রাজা হইয়াছে অরূপরতন; শিবের ভিক্ষা হইয়াছে কবির দীক্ষা; রথযাত্রা হইয়াছে রথের রশি। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই পূর্বনাম নির্বিশেষ, প্রত্যেক ক্ষেত্রেই নামান্তর তুলনায় বিশিষ্ট। শারদোৎসব বলিতে উৎসবের বিশেষ প্রকৃতিকে বুঝায় না, ঋণশোধ নামকরণের দ্বারা উৎসবের বিশেষ প্রকৃতি নির্দিষ্ট হইয়াছে। রাজা নিতান্ত সাধারণ সংজ্ঞা, তুলনায় অরূপরতন বিশিষ্ট, রাজার প্রকৃতি ইহাতে নির্দিষ্ট।

আর একটি নিয়ম হইতেছে, পূর্বনামে যাহা ঋণাত্মক (Negative) নূতন নামে তাহাকে ধনাত্মক (Positive) করিয়া তোলা হইয়াছে। তাই অচলায়তন হইয়াছে গুরু; যক্ষপুরী হইয়াছে রক্তকরবী। অচলায়তন ও

১ রাজা ও রাণীর নামান্তররূপে তপতীকে গ্রহণ করিলে এই নিয়মের ব্যতিক্রম বলা যাইতে পারে। নাটকরূপে না হইলেও শিল্পবস্তুরূপে তপতী রাজা ও রাণীর চেয়ে শ্রেষ্ঠতর। কিন্তু তপতীকে নামান্তর না বলিয়া সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র নাটক বলিয়াই ধরা উচিত। অবশ্য তপতী তত্ত্বনাট্যশ্রেণীর অন্তর্গত নয়, যথাস্থানে এ বিষয়ে বিষদ আলোচনা করিবার ইচ্ছা থাকিল।

যক্ষপুরী দুটা নামই ঋণাত্মক, নাম দুটিতে স্থান দুটির অন্ধকার অবস্থার সূচনা করিতেছে; তুলনায় গুরু ও রক্তকরবী ধনাত্মক, নূতন নামে স্থান দুটির আশা ও মুক্তির সূচনা।

নাটকগুলির রূপান্তর ও নামান্তর হইতে কবিমনের কিছু পরিচয় পাওয়া গেল, আবার নূতন নামগুলি হইতেও কবিমনের আরও কিছু পরিচয় পাওয়া গেল।

মূল কাহিনীর রূপান্তর

রাজা নাটকের মূল কাহিনীর অনুবাদ প্রদত্ত হইল।[১]

বারাণসীরাজ সুবন্ধুর প্রধানা মহিষী আয়ুদার জ্যেষ্ঠ পুত্র কুশ সিংহাসনে আরোহন করিয়া শূরসেনের অন্তর্গত কান্যকুব্জ রাজার কন্যা সুদর্শনাকে বিবাহ করিল। সুদর্শনা পতিকে অত্যন্ত কুৎসিত দেখিয়া পতি-গৃহ পরিত্যাগ করিয়া পিতৃগৃহে ফিরিয়া গেল। কুশ কান্যকুব্জে গিয়া বিবিধ কলায় তাহার কৃতিত্ব দেখাইয়া সুদর্শনার মন প্রসন্ন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। শ্বশুরের পরামর্শে কুশ যতীশ্বর নামে একটি রত্ন নিজ মস্তকে ধারণ করিল। সঙ্গে সঙ্গে তাহার দেহ অপরূপ লাবণ্য ও সৌন্দর্যে বিভূষিত হইল, তখন পত্নী তাহাকে সাদরে গ্রহণ করিল।[২]

এই স্বল্পাক্ষর, শিল্পসৌন্দর্যহীন ও সর্বপ্রকার আধ্যাত্মিক ইঙ্গিত বর্জিত কাহিনীটির মধ্যে রাজা নাটকের বীজের সন্ধান লাভ পাঠকের পক্ষে সহজ নয়; স্পষ্টভাবে না বলিয়া দিলে নিতান্তই কঠিন। কাজেই নাট্যকারের পক্ষে এই বীজ হইতে উক্ত মহীরুহ সৃষ্টি করা যে কত শক্ত তাহা অনুমান করা যাইতে পারে। কিন্তু আবার এক হিসাবে এই কঠিন কাজটি রবীন্দ্রনাথের পক্ষে তেমন কঠিন হয় নাই; কারণ রাজা নাটকের মূল ভাবটি অনেকদিন হইতেই বাষ্পাকারে তাঁহার মনের মধ্যে ভাসিতেছিল, এখন একটি কাহিনীর

১ কুশ জাতক, No B 32, The Sanskrit Buddhist Literature of Nepal, Rajendralal Mitra.

২ এই কাহিনীটিকেই ভিত্তি করিয়া আরও পরবর্তীকালে শাপমোচন নামে নৃত্যনাট্য লিখিত হইয়াছে।

আশ্রয় পাইয়া দানা বাঁধিয়া সুসংহত, উজ্জ্বল জ্যোতিষ্করূপে আত্মপ্রকাশ করিল মাত্র। ১

মূল কাহিনীকে নাটকে রূপান্তরিত করিতে গিয়া রবীন্দ্রনাথকে দুই দিক হইতে কাজ করিতে হইয়াছে, একদিকে কাহিনীটিকে যেমন শিল্পসৌন্দর্যে ভূষিত করিতে হইয়াছে, অপরদিকে তেমনি আবার ইহাতে আধ্যাত্মিক ইঙ্গিত সঞ্চার করিয়া দিতে হইয়াছে। বরঞ্চ শাপমোচন নৃত্যনাট্যের সঙ্গে কাহিনীটির যোগ ঘনিষ্ঠতর। শ্বশুরালয়ে গিয়া পত্নীর মনোরঞ্জনের উদ্দেশ্যে কুশের কলা-বিলাসকে নৃত্যনাট্যে ফলাও করিয়া দেখানো হইয়াছে; যতীশ্বর রত্নধারণের মতো স্থূল বিষয় অবশ্যই দেখানো হয় নাই, যে-জ্যোতিতে বিগতরূপ অপরূপ হইয়া উঠিয়াছে তাহা তালভঙ্গরূপ অপরাধের প্রায়শ্চিত্তের পূর্ণতার জ্যোতি।

কিন্তু রাজা নাটকে ঘটনাস্রোত অন্যপথগামী।

কাহিনীর রাণী সুদর্শনা পতিকে কুৎসিত দেখিয়া গৃহত্যাগ করিয়াছিল; নাটকের রাণী সুদর্শনা দেখিয়াছে যে তাহার পতি কেবল কুৎসিত নয়, ভীষণ। তাহার ধারণা হইল এই জন্যই রাজা অন্ধকার ঘরের বাহিরে তাহার সঙ্গে দেখা করেন না। রাণী ক্রোধে ও আত্মধিক্কারে পতিগৃহ ত্যাগ করিল।

তারপর নানা অবস্থাবিপর্যয়ের পরে, আধ্যাত্মিক দুঃখভোগের অন্তে

১ ১৯০৬ সালে প্রকাশিত খেয়া কাব্যে শুভক্ষণ, ত্যাগ আগমন, দুঃখমূর্তি, মুক্তিপাশ, প্রভাতে, দান, বালিকাবধূ, প্রভৃতি একগুচ্ছ কবিতা আছে। রাজা নাটকের 'রাজা' ও সুদর্শনার মধ্যে যে পতি-পত্নীর সম্বন্ধ দেখানো হইয়াছে এই কবিতাগুলির তাহাও একটা বৈশিষ্ট্য। আর তিনি কেবল পতিমাত্র নন, জগৎপতি বা রাজাও বটেন। আগমন কবিতাটিতে রাজাকে "আঁধার ঘরের রাজা" বলা হইয়াছে। রাজা নাটকের মহিষী সুদর্শনা নিজে স্বামী সম্বন্ধে ঠিক ঐ অভিধাই ব্যবহার করিয়াছে। প্রভেদের মধ্যে এই, নাটকে যাহা ডালপালা মেলিয়া পূর্ণাঙ্গে বিকশিত হইয়াছে, খেয়ার লিরিক কবিতাগুলিতে তাহা আভাসে কথিত মাত্র। শুধু খেয়া কাব্যে নয়, আরও উজানে অগ্রসর হইলে নাটকে বর্ণিত ভাবটিকে ইতস্ততঃ আভাসে ইঙ্গিতে দেখিতে পাওয়া যাইবে। তবে খেয়া কাব্যে ভাবটি দানা বাঁধিয়া উঠিবার মুখে 'আঁধার ঘরের রাজার' উক্তিতে তাহা প্রমাণ হয়।

অন্ধকার ঘরের বাহিরে বিশ্বের আলোকের মধ্যে রাজা যখন দেখা দিলেন তখন রাণী বলিয়া উঠিল, 'তুমি সুন্দর নও প্রভু; তুমি অনুপম।'

মূল কাহিনীতে কেবল সুদর্শনা ও কুশকে (রাজাকে) পাই, নাটকের অন্যান্য সমস্ত পাত্র পাত্রীই রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি, তাহাদের উল্লেখ মাত্রও মূলে নাই। তাহা ছাড়া মূলের কুশ (রাজা) ও সুদর্শনার চরিত্রে আধ্যাত্মিক বিবর্তন ঘটাইয়া তাহাদিগকে অনেক উচ্চতর শ্রেণীতে তোলা হইয়াছে; মাধুর্যের খাতিরে সুদর্শনা নামটিকে কবি রক্ষা করিয়াছেন মাত্র। [১]

---

১ অন্যান্য নাটকের মূল সম্বন্ধে সংক্ষেপে দু'চারটি কথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে—

অচলায়তন নাটকে ধ্বজাগ্রকেয়ূরী, মারীচি, মহামরীচি, পর্ণশবরী উষ্ণীষ-বিজয়, শৃঙ্গভেরিঙ্গ প্রভৃতি যেসব মন্ত্রের ও ব্রতের উল্লেখ আছে সেগুলি রবীন্দ্রনাথের কল্পিত নয়. 'দি স্যান্সক্রিট বুদ্ধিষ্ট লিটারেচার অব্ নেপাল' নামে পূর্বে উল্লিখিত গ্রন্থে এইসব ধারণী মন্ত্রের উল্লেখ ও বর্ণনা আছে। অমঙ্গল নিবারণের আশায় বা অভীষ্ট ফললাভের ইচ্ছায় এইসব মন্ত্র আবৃত্তি করা হইত বা লিখিয়া কবচে ভরিয়া ধারণ করা হইত।

মুক্তধারা নাটকের মূল প্রায়শ্চিত্ত নাটকে অনুসন্ধান করা যাইতে পারে—যদিচ কেবল প্রত্যক্ষভাবে ধনঞ্জয় বৈরাগীকেই পূর্বনাটক হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে।

রথের রশি নাটকের ঘটনা, অর্থাৎ রথের দিনে রথ না চলা এবং অন্ত্যজদের টানে রথের চলা বর্তমান লেখক কর্তৃক বিবৃত একটি বাস্তব ঘটনা হইতে গৃহীত।

তাসের দেশ নাটকের মূল 'একটা আষাঢ়ে গল্প' নামে রবীন্দ্রনাথের একটি ছোট গল্প—গল্পগুচ্ছ, র-র, ১৭শ খণ্ড।

তত্ত্বনাট্যের প্রতীক

জ্ঞাতসারে ও অজ্ঞাতসারে মানুষ সর্বদাই প্রতীক ব্যবহার করিতেছে—এবং সে ব্যবহার তাহার বাস্তবজীবন ও আদর্শজীবন সমস্ত ক্ষেত্রকেই ব্যাপ্ত করিয়া বিরাজিত। আমরা দশটি টাকার বদলে একখানি দশটাকার নোট গ্রহণ করিয়া থাকি। ঐ নোটখানি দশটি টাকার প্রতীক বা সিম্বল। আবার শব্দ ব্যবহার ক্ষেত্রেও সদাসর্বদা অজ্ঞাতসারে প্রতীক ব্যবহার করিয়া চলিয়াছি। একটি 'গাছকে' বুঝাইতে ডালপালা সমন্বিত 'গাছ' আর অঙ্কিত করি না। দুটি মাত্র বর্ণ যোগে একটি শব্দ রচনা করি। ঐ শব্দটি 'গাছ' বস্তুটির একটি প্রতীক। কিন্তু এক সময়ে মানুষ যখন বর্ণ ব্যবহারের রহস্য শেখে নাই, তখন 'গাছ' বস্তুটি বুঝাইবার উদ্দেশ্যে নিশ্চয়ই সে একটি 'গাছ' অঙ্কিত করিত। মিশরের চিত্রলিপি তাহার প্রমাণ। কালক্রমে চিত্রাক্ষর বর্ণাক্ষরে পরিণত হইয়াছে। মানুষ বস্তু হইতে প্রতীকে উপনীত হইয়াছে, বস্তুতঃ শব্দমাত্রই একপ্রকার প্রতীক। আবার ধর্ম্মাচরণের ক্ষেত্রেও প্রতীকের ব্যবহার অবিরল। এক সময়ে অগ্নি বুঝাইবার উদ্দেশ্যে মানুষ নিশ্চয়ই অগ্নির শিখা আঁকিত, এখন একটি বর্ণ প্রয়োগ করিয়া থাকে—এখানে প্রতীকের ব্যবহার হইল। পরে বহ্নিকে সমস্ত দেবতার প্রতীকরূপে কল্পনা করিয়া লইয়াছে, স্থির করিয়াছে যে বহ্নিতে হবিপ্রদান করিলে দেবতাদের নিকটে সে বহন করিয়া লইয়া যায়। মানুষ যখন দেবমূর্তির পরিকল্পনা করিল তাহারও মূলে প্রতীকী মনোভাব বর্তমান। দুর্গাপ্রতিমা একটি জটিল মনোভাবের জটিল প্রতীক। বহুশক্তিসমন্বিত বিচিত্র অবস্থা দুর্গাপ্রতিমার অনেকগুলি মূর্তির মধ্যে রূপ পাইয়া একটি প্রতীকরূপে দেখা দিয়াছে। আবার কালীমূর্তিও জীবনের একটি করাল ভাবের প্রতীক।

শালগ্রাম শিলা আবার প্রতীক হিসাবে পূর্ণতর, কারণ সেখানে দেববাবের নির্গলিত মর্মকে একটি শিলাখণ্ডে প্রকাশ করা হইয়াছে। তারপর দেখিতে পাইব যে মন্ত্র আরও পূর্ণতর প্রতীক, কারণ সেখানে ভাব বস্তুসংস্পর্শ বর্জন করিয়া শব্দকে মাত্র অবলম্বন করিয়া প্রকাশ পাইয়াছে। ওঙ্কারকে পূর্ণ প্রতীক বলিতে পারি, কেননা, এখানে আর বস্তুও নয়, শব্দও নয়, কেবল ধ্বনি মাত্র সহায়, প্রতীকবাদে খুব সম্ভব ইহার বেশি আর অগ্রসর হওয়া যায় না, তাই ইহাকে:পূর্ণ প্রতীক বলিলাম।

মানুষের ব্যবহারিক জীবন ও আদর্শ জীবনের যে সব প্রতীকের উল্লেখ করিলাম তাহাদের মধ্যে একটি ক্রম বা বিবর্তন রহিয়াছে, আর সেই ক্রম বা বিবর্তন মানুষের মানসিক ক্রমোন্নতির সহিত জড়িত। আগে বস্তুর চিত্র পরে বস্তুর প্রতীক স্বরূপ শব্দ। আগে দেবমূর্তি, পরে দেবতার প্রতীক স্বরূপ শালগ্রাম ও ওঙ্কার।

এইসব উদাহরণ হইতে বুঝিতে পারা যাইবে যে, আগে বস্তুর ব্যবহার পরে বস্তুর স্থলে প্রতীকের ব্যবহার। সাহিত্য ক্ষেত্রেও প্রতীকের ব্যবহার এই সর্বজনীন ক্রমানুযায়ী। প্রচীন সাহিত্যে প্রতীক অবর্তমান বা বিরল। সাহিত্যক্ষেত্রে প্রতীক অর্বাচীন সাহিত্যের লক্ষণ। বাল্মীকির রামচন্দ্র দোষে গুণে প্রকাণ্ড একটা মানুষ। রবীন্দ্রনাথের 'ভাষা ও ছন্দ' কবিতার রামচন্দ্র, পরিপূর্ণ মানবজীবনের একটি প্রতীক। এমন কি তুলসীদাসের রাম, বাল্মীকির রামের তুলনায় অনেকটা প্রতীকী ধর্মযুক্ত। হোমারের 'ইউলিসিস' দোষে-গুণে একটি প্রকাণ্ড মানুষ কিন্তু টেনিসনের 'ইউলিসিস' মানুষের অতৃপ্ত জ্ঞানপিপাসার প্রতীক ছাড়া আর কিছুই নয়। খুব সম্ভব শেক্স-পিয়র রাজকুমার হ্যামলেটকে গড়িবার সময় কেবল রক্তমাংস সহযোগেই গড়িয়াছিলেন। আমরা সেই হ্যামলেটের মধ্যে মানুষের দুর্ভেদ্য সংশয় পিপাসার আরোপ করিয়া তাহাকে প্রতীকভাবে দেখিয়া থাকি। এইসব দৃষ্টান্ত প্রমাণ করে যে প্রাচীন সাহিত্যে প্রতীক বিরল, আরও প্রমাণ করে যে প্রাচীন সাহিত্যের মধ্যেও অর্বাচীন মন প্রতীকের সন্ধান করিয়া থাকে, যেখানে

ভিতরে প্রতীকভাব নাই, সেখানে বাহির হইতে সেই ভাব আরোপ করিয়া বসে। প্রতীকীভাব, প্রতীকের সন্ধান বা প্রতীকের আরোপ অর্বাচীন মনের একটি বিশেষ লক্ষণ। সেই অর্বাচীন মন যেখানে সাহিত্যরচনায় নিযুক্ত সাহিত্যে প্রতীক সেখানে স্বতঃই আসিয়া পড়ে।

কেন এমন হইল এই প্রশ্নের উত্তরদান সহজ নয়। জটিল অবস্থার উত্তর স্বভাবতই জটিল হইবে। প্রাচীনকালে জীবন যখন সরল ছিল, তখন জীবনসত্য জটিলতার আড়ালে প্রচ্ছন্ন হইয়া পড়ে নাই, সহজেই চোখে পড়িত, কাজেই জীবনকে প্রকাশ করিলেই জীবনের সত্য বা জীবনস্বরূপ আপনি প্রকাশিত হইত। কিন্তু কালক্রমে জীবনের জটিলতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জীবনস্বরূপ দর্শন আর সহজ নাই, বহুর আড়ালে এক, জটিলতার আড়ালে সরলতা, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিচিত্র বস্তু যবনিকার আড়ালে ইন্দ্রিয়াতীত সত্য অনেক পরিমাণে প্রচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে। অর্বাচীন মন এই দুর্ভেদ্যকে ভেদ করিতে, প্রচ্ছন্নকে প্রকট করিতে এবং জটিলতাকে সরল করিতে চায়। এই ইচ্ছা হইতেই প্রতীক ব্যবহারের উদ্যম। ইহা গেল প্রতীক ব্যবহারের সামগ্রিক বা সামাজিক করেন। আবার একটি বিশেষ কারণও আছে। কোন কোন মন একান্ত বস্তুঅসহিষ্ণু। বস্তুকে বিদীর্ণ করিয়া স্বরূপ ধরিতে তাহার আকাঙ্ক্ষা। এই সব বস্তু-অসহিষ্ণু মন বস্তুরূপকে নির্গলিত করিয়া তাহার স্বরূপে পরিণত করে—সেই স্বরূপটি রূপের প্রতীক। এই শ্রেণীর মনও অর্বাচীন কালধর্মে সৃষ্ট, কাজেই বিশেষ কারণটিও সাধারণ কারণের অন্তর্গত। প্রাচীন ও অর্বাচীন কালের সাহিত্যে যেমন তুলনা করিয়াছি, তেমনি এই দুই শ্রেণীর মনেরও তুলনা করা যাইতে পারে। কালিদাসের মনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মনের, শেক্স-পীয়রের মনের সঙ্গে মেটারলিঙ্কের মনের বা কীট্সের মনের তুলনা চলিতে পারে। প্রতিভার তারতম্য এখানে বিচার্য নয়, মনের শ্রেণীভাগটাই লক্ষ্য করিবার মতো।

কালিদাসের মেঘদূত কাব্যের পূর্বমেঘ ও উত্তরমেঘ* বিচিত্র জীবনরূপের

দুটি চিত্র।' কিন্তু রবীন্দ্রনাথ মেঘদূত কাব্য বিচারে বসিয়া পূর্বমেঘ ও উত্তরমেঘের মধ্যে জীবনস্বরূপের দুটি ভিন্ন প্রতীককে দেখিতে পাইয়াছেন। দুই মহাকবির মধ্যে এখানে প্রথম প্রভেদ কালধর্মের, দ্বিতীয় প্রভেদ বিশেষ মনোধর্মের। শেক্সপীয়রের দৃষ্টি রূপ ও স্বরূপে ভেদ করে নাই, রূপের মধ্যে স্বরূপ, বস্তুর মধ্যেই সত্যকে দেখিতে পাইয়াছে। মেটারলিঙ্ক জীবন স্বরূপকে একটি 'নীলপাখীতে' পরিণত করিতে বাধ্য হইয়াছেন। শেক্স-পীয়রের পক্ষে জীবনের আনন্দ জীবনের বৈচিত্র্যের মধ্যে, ভালো মন্দ ছোট বড় নরনারীর মধ্যে বিকীর্ণ। মেটারলিঙ্ক সেই আনন্দকে একটি নীলপাখীর মধ্যে সংহত করিয়া তবে তাহার ধারণা করিতে সক্ষম হইয়াছেন।

কালধর্মের প্রভাবে জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো সাহিত্যক্ষেত্রেও প্রতীকের ব্যবহার অনিবাযভাবেই আসিয়া পড়িয়াছে সন্দেহ নাই, প্রতীকী সাহিত্যকে অর্বাচীন সাহিত্যের একটি বিশেষ লক্ষণ বলিয়াও মনে করিতে হইবে সন্দেহ নাই; কিন্তু তাহাতেই প্রমাণ হয় না যে সাহিত্যের সত্যই উন্নতি হইয়াছে। বিবর্তন মানেই উন্নতি নয়, বড় জোর পরিবর্তন, কিন্তু সব পরিবর্তনই যে উর্ধ্বগামী এমন মনে করিবার হেতু নাই। বস্তুকে বাদ দিয়া বস্তুস্বরূপ ধরিবার বিঘ্ন অনেক। প্রথমতঃ সেই রূপকথার গল্পের কুমীরের মতো শিয়ালের পা ধরিতে বটের শিকড় ধরিতে হয়। যাহা আমি বস্তুস্বরূপ মনে করিতেছি বা আজ বস্তুস্বরূপ বলিয়া মনে হইতেছে তাহা বস্তুস্বরূপ না হইতেও পারে। তেমন ক্ষেত্রে কালের বদলে প্রতীকের গুরুত্ব হানির আশঙ্কা থাকিয়া যাইবে, আর যেখানে সমস্ত রচনাটিরই ভিত্তি প্রতীক বিশেষ সেখানে রচনাটিরও মর্যাদা হানির আশঙ্কা থাকিয়াই গেল। তাছাড়া রূপ ও স্বরূপ যে ভিন্ন, বস্তুআশ্রয়ী নয়, তাহার অন্তরালে সত্য কোথাও আছে—ইহা সামাজিক বা মানসিক স্বাস্থ্যের লক্ষণ নয়। সাহিত্যে 'escapism' কথাটা আজকাল ঘন ঘন শোনা যায় আমি তো বুঝি বস্তুকে বাদ দিয়া সত্যের যে সন্ধান ইহাই একমাত্র 'escapism' বা পলায়নপ্রবৃত্তি। তাহার কারণ আর

কিছুই নয়—এইরূপ প্রবৃত্তির ফলে মানুষের দৃষ্টি, মনোযোগ, অনুসন্ধিৎসা সমস্তই মুখ্যকে ছাড়িয়া গৌণের প্রতি ধাবিত হইবার আশঙ্কা। মানুষের কাছে মানুষই মুখ্য, মানুষ বলিতে তাহার অন্তর্নিহিত কোন নির্গুণ সত্তা বা সত্যকে বুঝিবার প্রয়োজন নাই, সুখদুঃখআশাআশঙ্কা বিরহমিলন ও জীবনমৃত্যুর নানারঙের আলখাল্লাপরিহিত যে-মানুষ তোমার আমার সম্মুখে বর্তমান তাহাকেই বুঝিতেছি। মানুষের যথার্থ প্রতীক মানুষই, রক্তকরবী, বা রথের রশি নয়, কারণ মানুষ এমন বিচিত্র, এমন স্বতোবিরুদ্ধতা-পূর্ণ জীব যে তাহার নির্গলিত মর্ম কোন একটি বস্তু দ্বারা সম্যক্‌রূপে প্রকাশ সম্ভব নয়। যে-কোন প্রতীকই গ্রহণ করি না কেন, তাহা আংশিক প্রকাশ না হইয়া উপায় নাই। কালান্তরে অন্য অংশ যখন প্রবল হইয়া ওঠে তখন প্রতীকের ও তৎসঙ্গে রচনার মূল্য কমিয়া আসে। মেটারলিঙ্কের রচনার সে মহিমা আর নাই, নীলপাখীকে আর তেমন নীল লাগে না, রক্তকরবীর রঙও ক্রমে ফিকা হইয়া আসিবে। পক্ষান্তরে নাট্য শিল্প হিসাবে রাজা ও রাণীর ত্রুটি বিচ্যুতি গুরুতর হইলেও তাহার মানবিক মূল্য কখনো হ্রাস পাইবে মনে হয় না। এমন কি রাজা ও রাণীর সংস্কৃতরূপ যে তপতীকে কবিগুরু উচ্চতর মাপের রচনা বলিয়া মনে করিতেন মানব মর্যাদার বিচারে রাজা ও রাণীর সহিত তাহা সমানাসন পাইবে বলিয়া মনে হয় না। তবে সাহিত্যে সর্বদাই সর্বপ্রকার সম্ভাবনা রহিয়াছে এবং নিঃসংশয়িত ভবিষ্যদ্বাণীর স্থান নাই। যদি কখনো প্রতীকী সাহিত্যে শেক্সপীয়রের উদ্ভব হয়, তবে এ সমস্ত মতামত অবশ্যই পরিবর্তন করিতে হইবে। কিন্তু তাহার বিশেষ সম্ভাবনা দেখি না। প্রতীকী সাহিত্যের মূলেই দুর্বলতা নিহিত। যে-সাহিত্য রূপকে বাদ দিয়া স্বরূপকে, মানবকে বাদ দিয়া তাহার জীবন রহস্যকে ধরিতে চায় তাহা কখনই সম্পূর্ণ সুস্থ নয়। জলাশয়কে বাদ দিয়া মাছের কল্পনা সম্ভব নয়। এমন কি যে-মাছ শূন্যে অবস্থিত তাহাকেও শরাসনে সন্ধান করিতে হইলে জলপাত্রে দৃষ্টিনিবদ্ধ করা অনিবার্য। ফলকথা, রূপক সাহিত্য ও প্রতীকী সাহিত্য দুয়েরই স্থান সাহিত্যের সাধারণ শ্রেণীতে

নয়, নীচেই নির্দেশ করিতে হইবে। ব্যাঙ্কে নোট জমানো চলিতে পারে। কিন্তু প্রিয়কণ্ঠে গাঁথিয়া দিবার সময়ে মোহরেরই আবশ্যক।

২

সাহিত্যে প্রতীকের তিন ভাবে ব্যবহার করা চলিতে পারে; প্রতীকাভাস, খণ্ড-প্রতীক ও পূর্ণ-প্রতীক; এই তিনের মধ্যে প্রতীকাভাসকে প্রতীক পর্যায়ে ফেলা যায় কিনা সন্দেহ, না ফেলাই উচিত, কারণ প্রতীক পর্যায়ী রচনা ছাড়াও প্রতীকাভাস থাকিতে পারে, প্রায়ই থাকে। কিন্তু তজ্জন্য রচনাটি প্রতীকধর্ম গ্রহণ করে না। কোন রচনায় আবেগের তীব্রতা যখন বৃদ্ধি পায়, তাহার ধমনীতে রক্তপ্রবাহ যখন চঞ্চলতর হইয়া ওঠে, তখন রচনাটি আপন নির্দিষ্ট অর্থকে অতিক্রম করিয়া যায়, তাহার মধ্যে একটি গভীরতর ও ব্যাপকতর সুরের মূর্ছনা বাজিয়া ওঠে—এই আকস্মিক গভীরায়মানতাকে প্রতীকাভাস বলা যাইতে পারে। একটি দৃষ্টান্ত লওয়া যাক। শেক্সপীয়রের 'কিং লিয়ার' নাটকের জনহীন গুল্মতৃণাবৃত প্রান্তরে ঝঞ্ঝাবিভ্রান্ত লিয়রের দৃশ্যটির কথাই ভাবিতেছি। এই প্রান্তর ও ঝঞ্ঝা বাস্তব সন্দেহ নাই, কিন্তু লিয়রের ব্যক্তি-বেদনা যে তীব্রতায় পৌঁছিয়াছে তাহাতে ঐ প্রান্তর ও ঝঞ্ঝা আপন বাস্তব সীমানাকে অতিক্রম করিয়া যায় নাই কি? কন্যাপরিজন পরিত্যক্ত বৃদ্ধের জীবন আর ঐ জনহীন প্রান্তর কি সমর্থক হইয়া দাঁড়ায় নাই? লিয়রের প্রচণ্ড ক্ষোভ কি ঐ ঝঞ্ঝার মধ্যে আর্তনাদ করিতেছে না? আরও বেশি। লিয়রের দুঃসহ অভিজ্ঞতার সূত্রে ক্ষণকালের জন্য ঐ নির্জন প্রান্তর ও প্রলয় ঝঞ্ঝা যেন সমগ্র মানব জীবনেরই নিরর্থকতার প্রতীক হইয়া পড়িয়াছে। অথচ 'কিং লিয়র' নাটকখানিকে কেহই প্রতীকী নাটক বলিবেন না। কিন্তু অভিজ্ঞতার দাহ ঐ দৃশ্যটিতে এমন একটি তীব্রতায় পৌঁছিয়াছে যাহাতে দৃশ্যটি আপন নির্দিষ্ট অর্থের সীমানাকে স্বতঃই অতিক্রম করিয়া গিয়াছে—তাহাতে গভীরতর সুরমূর্ছনায় অকল্পিত অর্থের আভাস লাগিয়াছে। ইহাই প্রতীকাভাস।

এই প্রতীকাভাস নাট্য, উপন্যাস, কাব্য প্রভৃতি যে-কোন শ্রেণীর রচনায় ক্ষণকালের জন্য দেখা দিতে পারে। কিন্তু তাই বলিয়া রচনাটি প্রতীকধর্মী হইয়া ওঠে না।

রবীন্দ্রনাথের সব শ্রেণীর বচনাতেই প্রতীকাভাসের দৃষ্টান্ত অবিরল, এখানে তাহাদের উল্লেখ বাহুল্যমাত্র হইবে।

খণ্ড প্রতীক ও পূর্ণ প্রতীককেই প্রকৃত-প্রতীক বলিযা গ্রহণ করা উচিত।

যে প্রতীক রচনার অংশবিশেষের সঙ্গে মাত্র জড়িত অথবা যে-প্রতীক রচনার মধ্যে এক আধ বার মাত্র ব্যবহৃত হইয়াছে, রচনার ভিত্তির সঙ্গে যাহার সম্বন্ধ কাযকারণগত নয়, তাহাকে খণ্ডপ্রতীক বলা যাইতে পারে।

প্রকৃতির প্রতিশোধ নাটকের সন্ন্যাসীর গুহা অবশ্যই একটি প্রতীক। কিন্তু ঐ গুহাটির সঙ্গে নাটকের কার্যকারণগত সম্পর্ক নাই, অর্থাৎ গুহার উল্লেখ বাদ দিলেও নাটকটি প্রায় বর্তমান রূপেই বিরাজ করিতে পারিত, এখন এই দুটি লক্ষণকে স্মরণ রাখিলে গুহাটিকে খণ্ড প্রতীক বলা ছাড়া উপায় থাকে না। আরও একটি দৃষ্টান্ত। 'রাজা' নাটকের অদৃশ্য রাজার পতাকাব যে বর্ণনা ঠাকুর্দা দিযাছেন তাহাতে বুঝিতে পারা যায় যে ঐ পতাকা কেবল একটি বস্তু বিশেষ মাত্র নয়—উহা অদৃশ্য রাজারই প্রতীক। কিন্তু ইহাও খণ্ড প্রতীক ছাড়া আর কিছুই নয়, যেহেতু ঐ বর্ণনার সঙ্গে নাটকটির ভিত্তিগত যোগ নাই, বর্ণনাটুকু বাদ দিলেও নাটকটির বর্তমান আকারের কোন ক্ষতি হয় না। আবার একটি দৃষ্টান্ত। 'ফাল্গুনী' নাটকে উল্লিখিত গুহাটিও খণ্ড প্রতীক, কিন্তু এটি আগের দুটির চেয়ে পূর্ণতর। এই গুহাটিকে নাট্যঘটনা হইতে বাদ দিযা নাটকটিকে বর্তমান অবস্থায় রাখা যায় না, কারণ নাট্যঘটনা ঐ গুহাভিমুখেই পরিচালিত। ইহাই তাহার পূর্ণতার কারণ। কিন্তু ইহা পূর্ণ প্রতীক নয়, যেহেতু নাট্যঘটনার সঙ্গে যে অঙ্গাঙ্গী বা যে দেহাত্মী যোগ থাকিলে প্রতীক ও নাটক একার্থক হইয়া দাঁড়ায় সে কার্যকারণগত যোগের এখানে অভাব।

অচলায়তন নাটকে পূর্ণতর খণ্ড প্রতীকের আর একটি দৃষ্টান্ত, কেননা ঐ প্রাচীর ভাঙা ও গড়ার উপরে নাটকটা অনেক পরিমাণে নির্ভর করিতেছে।

সেই প্রতীককেই পূর্ণপ্রতীক বা প্রকৃত প্রতীক বলিব যাহাকে বাদ দিয়া রচনার অস্তিত্ব চিন্তা করাই যায় না, যাহার উপরে রচনাটির ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত এবং যাহাকে রচনার শিরদাঁড়ার ন্যায় ব্যবহার করা হইয়াছে। এহেন প্রতীক-কেই প্রকৃত বা পূর্ণপ্রতীক বলা উচিত।

ডাকঘর নাটকের ডাকঘর, মুক্তধারা নাটকের মুক্তধারার বাঁধ, রক্ত-করবী নাটকের রক্তকরবী ও লোহার জাল এবং রথের রশি নাটিকার রথের রশি—পূর্ণ প্রতীক। ইহাদের কোনটিকেই বাদ দিয়া নাটক পরিকল্পনা করা সম্ভব নয়। এখানে দেখি প্রতীকে ও নাটকে একেবারে দেহাত্মীযোগ, সে যেন এমন ঘনিষ্ঠ যে নাটকটিই প্রতীক এবং প্রতীকটিই নাটকে পরিণত হইয়াছে। ডাকঘরকে বাদ দিয়া ডাকঘর নাটক কল্পনা করা কি সম্ভব? একথা এই মাত্র উল্লিখিত সবগুলি নাটক সম্বন্ধেই সত্য। এ গুলিকে পূর্ণ প্রতীক এবং রবীন্দ্রনাথের প্রতীক ব্যবহারের পূর্ণ দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করা উচিত।

এই গ্রন্থের অন্যত্র আমি মুক্তধারাকে রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ তত্ত্বনাট্য বলিয়া বর্ণনা করিয়াছি। ঐ উক্তিকে পূর্ণতর করিবার উদ্দেশ্যে আরও বলা উচিত যে মুক্তধারা রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ প্রতীকনাটক। এখন এই উক্তির ব্যাখ্যা করিতে বসিলেই প্রসঙ্গতঃ রবীন্দ্রনাথের প্রতীক ব্যবহার সম্বন্ধে অনেক কথাই বলা হইয়া যাইবে।

এই মাত্র বলিয়াছি যে ডাকঘর, মুক্তধারা, রক্তকরবী ও রথের রশি পূর্ণ প্রতীকের দৃষ্টান্ত। কেন?

ডাকঘর অবশ্যই পূর্ণপ্রতীক, কিন্তু ইহার ত্রুটি এই যে এক অমল ছাড়া নাট্যোল্লিখিত আর কাহারো মনের উপরে তাহার কোন প্রতিক্রিয়া নাই। ডাকঘরের প্রকৃত ব্যবহার তাহারা সকলেই জানে কাজেই অমলের নিকটে রাজার চিঠি আসিবার উপলক্ষ্যেই যে উহা স্থাপিত ইহা কেহই বিশ্বাস করেনা, বা করাও সম্ভব নয়। একমাত্র অমলের মনের উপরেই ডাকঘরের যা কিছু প্রতিক্রিয়া। আরও একটি কথা। নাট্যঘটনাকে ডাকঘরটি কোনরূপে

প্রভাবান্বিত করে নাই, অমলকে করিয়াছে বটে, কিন্তু অমলই-বা কি ভাবে ঘটনাকে প্রভাবিত করিয়াছে ? বরঞ্চ সে-ই ঘটনা স্রোতের দ্বারা প্রভাবিত। সে এতই দুর্বল, এতই অসহায় ও অক্ষম যে তাহার দ্বারা ঘটনাস্রোতকে এতটুকু বিচলিত করা সম্ভব হয় নাই। কাজেই ডাকঘরের প্রভাবের দ্বারা অমলের মনের মাধ্যমে নাটককে প্রভাবিত করিবার যে সম্ভাবনা ছিল তাহা আদৌ কার্যকরী হইতে পারে নাই। এই কারণেই পূর্ণ প্রতীকের দৃষ্টান্ত হওয়া সত্ত্বেও ডাকঘরকে প্রতীকধর্মের চরম রূপ বলিয়া গ্রহণ করা যায় না।

ইহার সঙ্গে তুলনা করা যাক, মুক্তধারার বাঁধের উদ্ধত যন্ত্রটার। নাট্যোল্লিখিত সকল পাত্রই বাঁধটাকে বিশ্বাস করে, ইহা এমন দুঃসহ সত্য যে বিশ্বাস না করিয়া উপায় নাই। আবার এই বাঁধটার প্রতিক্রিয়া সকলের মনের উপরেই বর্তমান। কেহ ইহাকে ক্ষতিকর কেহ বা উপকারী মনে করে। তার উপরে নাটকের গল্পটাই বাঁধ-বাঁধার আর বাঁধ ভাঙার, কাজেই রূপান্তরে গল্প, নাটক আর প্রতীক একাত্মক ও এক। ইহা কেবল পূর্ণ প্রতীক নয়, পূর্ণ প্রতীকেরও চূড়ান্ত রূপ। এমনটি রবীন্দ্রনাথের আর কোন প্রতীকী নাটকে দেখা যায় না, এমনটি রবীন্দ্রনাথের আর কোন তত্ত্বনাট্যে দেখা যায় না, সেই জন্যই মুক্তধারাকে রবীন্দ্রনাথের তত্ত্বনাট্য সমূহ মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছি।

রক্তকরবী নাটকের রক্তকরবীগুচ্ছও পূর্ণ প্রতীক, কিন্তু পূর্ণ প্রতীকের চরমরূপ কিনা সন্দেহ। মুক্তধারা নাটকের ঘটনার উপরে মুক্তধারার বাঁধের যে প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া রক্তকরবীতে তাহার অনুরূপ কিছুই নাই। বস্তুতঃ রক্তকরবীর যে মহিমায় নন্দিনী ও অন্য কেহ কেহ বিশ্বাসী, সে বিশ্বাস নাটকের অধিকাংশ পাত্রপাত্রীর মনেই নাই। আর নাটকের মূল ঘটনাস্রোত রক্তকরবীর-গুচ্ছ-নিরপেক্ষ, অন্য নাটকটায় ঘটনাস্রোত আর মুক্তধারার স্রোত মিলিয়া মিশিয়া একটি শিল্পস্রোতে পরিণত হইয়াছে। মুক্তধারার বাঁধটাকে বিশ্বাস করিবার জন্য নাটকের কোন পাত্র-পাত্রীর বিশ্বাসের উপর নির্ভর করা অপরিহার্য নয়। রক্তকরবী সম্বন্ধে ইহার বিপরীত। নন্দিনীর মনের বিশেষ ভাবের উপরে আস্থা থাকিলে তবেই রক্তকরবীর সৌন্দর্য ও মহিমা সম্বন্ধে

আস্থাবান হওয়া সম্ভব। এরূপক্ষেত্রে প্রতীক হিসাবে রক্তকরবীর মূল্য হ্রাস হইবারই আশঙ্কা।

তারপরে আর একটি কথা। উক্ত নাটকে আরও একটি প্রতীক আছে, রাজার লোহার-জাল দেওয়া জানালা। ইহাতে প্রতীকের দ্বিত্ব ঘটিয়াছে; রক্তকরবীর গুচ্ছ ও জালায়ন নাট্যব্যাপারে দুটিরই সমান মূল্য, দুটিই সমান মুখ্য; ইহাও একটা প্রধান ত্রুটি। কারণ কোনও নাটকে মূল প্রতীকের দ্বিত্ব ঘটা বাঞ্ছনীয় নহে, ঐরূপ ঘটিলে ঐ দুয়ের ফাঁক দিয়া অনেকখানি রস নষ্ট হইয়া যাইবার আশঙ্কা। এই প্রসঙ্গেও আবার মুক্তধারার শ্রেষ্ঠত্ব বুঝিতে পারা যাইবে। মুক্তধারা নাটকের প্রারম্ভেও দুটি প্রতীক দেখিতে পাই, একটি বাঁধের যন্ত্র, অপরটি ভৈরব মন্দিরের চূড়া। কিন্তু দুটিকে এমন ঘনিষ্ঠভাবে স্থাপন করা হইয়াছে, এমন কৌশলে ব্যবহার করা হইয়াছে, ভৈরবপন্থী ও যন্ত্রবাদিদের chorus এমন সুপিনদ্ধভাবে বিন্যস্ত হইয়াছে যে—দুটি প্রতীক আর ভিন্ন নাই, মিলিয়া মিশিয়া একটিতে পরিণত হইয়াছে। রক্তকরবী নাটকে এমন দুয়ের একীকরণ নাই, রক্তকরবীগুচ্ছ ও মকররাজের জালায়ন স্বতন্ত্র প্রতীকরূপে প্রভাব বিস্তার করিয়া নাট্যব্যাপারের মধ্যে দ্বিধা ঘটাইয়া দিয়াছে বলিয়া আমার বিশ্বাস।

এবারে বাকি রহিল রথের রশি। উক্ত নাটকের রথের রশি পূর্ণ প্রতীক সন্দেহ নাই। কারণ তাহাকে বাদ দিলে নাট্যব্যাপারটাই লোপ পায়। কিন্তু যেখানে মূলে নাটকটাই অকিঞ্চিৎকর, সেখানে তাহার প্রতীকটাকে লইয়া দীর্ঘ আলোচনা শূন্যগর্ভ হইতে বাধ্য।

রবীন্দ্রনাথের তত্ত্বনাট্যের সহিত বৈদেশিক ঐ শ্রেণীর নাট্যের কিছু কিছু তুলনামূলক আলোচনা হইয়াছে, আরও হওয়া বাঞ্ছনীয়। কিন্তু একটি কথা সর্বদা মনে রাখা আবশ্যক যে এ দু'য়ে মিল অনেক স্থানেই আকস্মিক, বড় জোর শিল্পগত; মূলগত মিল খুব বেশি নয়। রবীন্দ্রতত্ত্বনাট্যের মূল রবীন্দ্রকাব্যেই বর্তমান।[১] তবে কবিতায় যাহা বীজাকারে আছে, নাটকে তাহা বনস্পতিমূর্তি লাভ করিয়া শাখা-পল্লবে জটিল হইয়া দেখা দিয়াছে—প্রভেদের মধ্যে ইহাই।

রবীন্দ্রতত্ত্বনাট্যে দোষ

এবারে রবীন্দ্রতত্ত্বনাট্যের দোষ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যাইতে পারে।

কোন মহাকবির রচনার দোষ প্রদর্শন অতি গুরুতর সমস্যা, অতি সন্তর্পণে সে বিষয়ে উদ্যত হওয়া আবশ্যক। কেন না, সমালোচকের চোখে দোষ বলিয়া যাহা প্রতিভাত হইতেছে বস্তুতঃ তাহা দোষ না হইতেও পারে। মহাকবির প্রতিভায় যাঁহা সিদ্ধ, সাধারণ সমালোচকের দৃষ্টিতে তাহা দোষ বলিয়া প্রতিভাত হইলেই যে তাহা দোষ এমন বলা যায় না, মহাকবিগণ বৃহৎকালে সঞ্চরণ করেন, সমালোচক ক্ষুদ্র কালের মধ্যেই আবদ্ধ, ক্ষুদ্রকালে যাহা দোষ বলিয়া প্রতিপন্ন বৃহৎকাল তাহা গ্রহণ করিতে বাধ্য নয়। কিন্তু সমালোচক আর কীই বা করিতে পারে? নিজের আলোক ম্লানদীপ্তি হইলেও একমাত্র তাহাই তাহার নির্ভর, সেই আলোকের সাহায্যে বিচার করা ছাড়া তাহার গত্যন্তর নাই, তাহার সিদ্ধান্ত পরবর্তীকাল গ্রহণ না করিতে পারে ইহা জানা সত্ত্বেও তাহাকে অগ্রসর হইতে হয়—ভয়ে সে কর্তব্যপরাঙ্মুখ হইতে পারে না। সেই কর্তব্যবোধেই আমি এই আলোচনায় উদ্যত হইয়াছি।

তত্ত্বনাট্য (রূপক, সাঙ্কেতিক প্রভৃতি নাটক, বা যে কোন জাতীয় তত্ত্ব রচনা, যাহা নিছক তত্ত্ব মাত্র নয়, তত্ত্বমূলক শিল্প) একাধারে জীবনতত্ত্ব ও জীবনচিত্র হওয়া আবশ্যক। কিন্তু এই সব রচনায় তত্ত্ব ও শিল্প স্বতন্ত্র থাকিলে চলিবে না—দুই অঙ্গাঙ্গীভাবে মিশিয়া গিয়া এক ও অচ্ছেদ্য হইয়া যাওয়া আবশ্যক। তত্ত্বের ও চিত্রের মিশ্রণের উৎকর্ষের উপরেই শিল্পের চরম উৎকর্ষ নির্ভর করিতেছে। অর্থাৎ তত্ত্বের ও চিত্রের অর্দ্ধনারীশ্বরত্ব সাধনই শিল্পীর উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। এমন কি তত্ত্বের উদাহরণ স্বরূপ

চিত্র প্রদর্শিত হওয়াও যথেষ্ট নহে। চিত্রের মাধ্যমে তত্ত্ববিন্যাস বা তত্ত্ব উপলক্ষ্যে চিত্রাঙ্কনও সমীচীন পন্থা নহে। বস্ত্রের যেমন এপিঠ ওপিঠ, তত্ত্ব ও চিত্রও তেমনি হইবে। পাঠক যদি কোনটিকে স্বতন্ত্রভাবে ধারণা করিতে সমর্থ হয়—তবে বুঝিতে হইবে যে শিল্পের মর্যাদা সেখানে সম্পূর্ণ রক্ষিত হয় নাই।

একটি দৃষ্টান্ত লওয়া যাক। গ্যেটের ফাউস্ট। ফাউস্ট বিশ্ব সাহিত্যের একটি শ্রেষ্ঠ রচনা, উনবিংশ শতকের শ্রেষ্ঠ কাব্য বলিলে অত্যুক্তি হইবে না, আধুনিক জীবনের একমাত্র মহাকাব্য বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। এই কাব্যখানিতে একটি মহৎ তত্ত্ববীজ নিহিত, কিন্তু সেই তত্ত্ববীজ কাহিনীরূপে, বিচিত্র নরনারীর জীবনরূপে বনস্পতি হইয়া দেখা দিয়াছে; গাছ দেখিলে তাহার বীজের কথা আর মনে পড়েনা, ফাউস্ট বনস্পতি দেখিলেও আর তাহার বীজের কথা মনে পড়েনা—মূলে যাহা তত্ত্ব ছিল—শিল্পে তাহা চিত্ররূপ গ্রহণ করিয়াছে; ইহাই তত্ত্ব ও চিত্রের একাঙ্গীভবন ঘরের কাছের আরও দৃষ্টান্ত লওয়া যাইতে পারে, বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠ, দেবীচৌধুরাণী ও সীতারাম। এগুলি স্পষ্টতঃ তত্ত্বোপন্যাস, বঙ্কিমচন্দ্রের অন্য রচনা হইতে স্বতন্ত্র জাতের। এ তিন খানিতে গীতোক্ত মূল তত্ত্বকে শিল্পরূপ দিবার চেষ্টা হইয়াছে। অনেকে মনে করেন সেইজন্যই শিল্প হিসাবে এগুলি তেমন উৎকর্ষ লাভ করে নাই। কিন্তু বিচার অন্যদিক হইতে করিতে হইবে—তত্ত্ববীজ বহন করা সত্ত্বেও এগুলি যে বর্ত্তমান রূপ ও শিল্পমর্যাদা লাভ করিয়াছে—তাহাই কি বিস্ময়কর নহে? যে-পরিমাণে ইহারা তত্ত্ব ও চিত্রকে এক ও অচ্ছেদ্য করিতে সমর্থ হইয়াছে—সেই পরিমাণেই ইহাদের শিল্পের উৎকর্ষ। একবার ইহাদের অন্তর্নিহিত তত্ত্বের কথা ভুলিয়া যাই না কেন, ইহাদের কাহিনীর আকর্ষণ, ইহাদের নরনারীর সজীব ও বিচিত্র জীবনলীলার কথা ভাবি না কেন! তখন বুঝিতে পারিব তত্ত্ব হিসাবে ইহাদের যে মূল্যই হোক না কেন, চিত্রহিসাবে ইহাদের উৎকর্ষ অল্প নয়। আনন্দমঠ প্রথমে লিখিত, তারপরে দেবী চৌধুরাণী এবং তারও পরে সীতারাম

লিখিত। উৎকর্ষের মানেও ইহাদের কি সেই ভাবে সাজানো চলে না? আনন্দমঠ সব নীচে সীতারাম সব উপরে। তাহা হইলে ইহাই কি প্রমাণ হয় না যে তত্ত্ব ও চিত্রের একাঙ্গীকরণে বঙ্কিমচন্দ্র ক্রমে অধিকতর সাফল্য লাভ করিয়াছেন, এই দুরূহ পরীক্ষায় ক্রমেই তিনি অধিকতর পারদর্শিতা দেখাইয়াছেন। আনন্দমঠ ও দেবীচৌধুরাণীতে তত্ত্ব ও চিত্রের সূক্ষ্ম ফাটল চোখে পড়িলেও সীতারামেও সে ফাটল সত্যই কি চোখে পড়ে? সেখানে তত্ত্ব ও চিত্রটি একেবারেই অচ্ছেদ্য ও এক হইয়া যায় নাই কি? ফাউস্টের অসামান্যতা এ গ্রন্থে নাই বটে—কিন্তু দুই-ই কি এক জাতের নয়? আরও একটি কথা—বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে এ বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্র সত্যই অসামান্য!

এখন বিচার্য এই যে রবীন্দ্রতত্ত্বনাট্যগুলির শিল্পোৎকর্ষ কিরূপ? এ সব নাটকে তত্ত্ব ও চিত্র, জীবনতত্ত্ব ও জীবনচিত্র কি এক ও অচ্ছেদ্যরূপে দেখা দিয়াছে—না দুয়ের মধ্যে অল্পবিস্তর সূক্ষ্ম ও স্থূল ফাটল চোখে পড়ে?

আমার সিদ্ধান্তটি পূর্বাহ্নেই বলিয়া রাখি, ক্রমে সে বিষয়ে আলোচনা করা যাইতে পারিবে। রবীন্দ্রতত্ত্বনাট্যে তত্ত্বও আছে চিত্রও আছে কিন্তু কদাচিৎ দুটি এক ও অচ্ছেদ্যরূপে দেখা দিয়াছে। এই সব রচনায় তত্ত্ব ও চিত্রের ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত না হইবার ফলে কখনো তত্ত্ব চোখে পড়ে, কখনো চিত্র চোখে পড়ে, কিন্তু কদাচিৎ তত্ত্ব ও চিত্র অচ্ছেদ্য শিল্পরূপে একত্র চোখে পড়ে। সমস্ত নাটকেই তত্ত্বের ভার এমন গুরুতর যে, জীবন চিত্রের উপরে তাহাদের যেন চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছে—চিত্র তত্ত্বকে বহন করিতে পারে নাই, পীড়িত হইয়া ভূমিতে নিক্ষেপ করিয়াছে—কাজেই দুইকে স্বতন্ত্রভাবে আমাদের চোখে পড়ে।

তত্ত্ব ও চিত্রের একীকরণ দুই ভাবে হইতে পারে। তত্ত্ব চিত্রে রূপান্তরিত হয়, যেমন দেখি ফাউস্ট কাব্যে; আবার চিত্র তত্ত্বকে বহন করিতে পারে, যেমন দেখি বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্বোক্ত উপন্যাসগুলিতে। শিল্পপন্থা হিসাবে দ্বিতীয়টির চেয়ে প্রথমটি শ্রেষ্ঠতর। রবীন্দ্রতত্ত্বনাট্যে ইহার কোন পন্থাই অনুসৃত হয় নাই—ইহাতে তত্ত্ব ও চিত্র দুইকেই কবি স্বয়ং বহন ও চালনা

করিয়াছেন—তাহারা পরস্পরনিরপেক্ষ এবং স্থাবর, কবির ব্যক্তিত্বই তাহাদের কবির অভিপ্রেত লক্ষ্যে পৌছাইয়া দিয়াছে।

তত্ত্বনাট্য বা তত্ত্বোপন্যাস যখন শিল্পে পরিণত হয় তখন দেখা যায় যে কাহিনীর প্রবল বেগে নরনারীর বিচিত্র জীবনরূপে তাহা দেখা দিয়াছে। গঙ্গোত্রীতে যখন বরফ গলে জল আপনি গঙ্গার খাত বহিয়া চলিয়া আসে। আবার গঙ্গোত্রীতে গিয়া এক কমণ্ডলু জল হাতে বহন করিয়াও আনা সম্ভব। দুই-ই গঙ্গার জল। কিন্তু দুয়ে ভেদ আছে। তত্ত্বনাট্য যেখানে সার্থক শিল্প, সেখানে তাহা আপন বেগে বহিয়া আসে, আর যেখানে শিল্প হইয়া ওঠে নাই, বুঝিতে হইবে তাহা কমণ্ডলুতে বাহিত। রবীন্দ্রনাথের তত্ত্বনাট্য কমণ্ডলুতে বাহিত। তাহার পবিত্রতা ও স্নিগ্ধতা কম নয়—আবার স্বয়ং কবিকর্তৃক আনীত বলিয়া তাহার মূল্যও বেশি হইতে পারে, কিন্তু তৎসত্ত্বেও স্বীকার না করিয়া উপায় নাই যে তাহা গঙ্গার স্বাভাবিক প্রবাহ নহে।

রবীন্দ্রতত্ত্বনাট্যে কাহিনীর বেগ অতিশয় মন্দ, অনেক জায়গায় কোন বেগ আছে বলিয়াই মনে হয় না। অনেকগুলি নাটকে স্থান কাল ও ঘটনার কৈবল্য (unity of time, space and action) সাধিত হওয়ায় কাহিনীর বেগ দ্রুত হইবার সুযোগ ঘটিয়াছে কিন্তু সে সুযোগ কদাচিৎ গৃহীত হইয়াছে। সঙ্কীর্ণ কালে ঘটনার দ্রুতগতি দেখানো সহজসাধ্য বটে কিন্তু তজ্জন্য একটা কাহিনী থাকা আবশ্যক। এইসব নাটকে কাহিনীর অংশ অতিশয় ক্ষীণ। কাহিনী ক্ষীণ—তাহার গতিও ক্ষীণ। অনেক স্থলেই তত্ত্বাশ্রয়ী সংলাপ ও সুমধুর সঙ্গীত কাহিনীর অভাব পূরণ করিতে চেষ্টা করিয়াছে। সংলাপের অভিব্যক্তি কাহিনী নয়, কাহিনীর অভিব্যক্তিই সংলাপে। যেখানে কাহিনী ক্ষীণ বা একেবারেই নাই, সেখানে সংলাপও নাটকীয় সংলাপ হয় না, তত্ত্বের ঊর্ণাতন্তু অবলম্বন করিয়া শূন্যে ঝুলিয়া থাকে। ইহাই নাটকগুলি সম্বন্ধে সাধারণ সত্য। ব্যতিক্রম বলিয়া মুক্তধারাকে মনে পড়িতেছে। মুক্তধারার কাহিনী অন্যান্য নাটকের চেয়ে পুষ্টতর, তাহার গতিও প্রবলতর। রক্তকরবীর প্রথমাংশে কোন গতি আছে বলিয়াই মনে হয় না; পাত্র-পাত্রীর সংলাপ নাটকীয় পরিবেশের

বহির্ভূত কোন দেশ-কালে যেন কথিত হইয়াছে। শেষের বিদ্রোহ ঘটনার প্রচণ্ড সংঘাতের অপ্রত্যক্ষ দৃশ্যে সমস্ত ত্রুটি যেন সারিয়া লইবার চেষ্টা হইয়াছে। ঘটনার প্রত্যক্ষবিন্যাস দেখানো হইলে হয়তো তাহা সম্ভব হইতেও পারিত, কিন্তু পরোক্ষ বর্ণনায় ত্রুটি সংশোধন হয় নাই—সমস্তই কেমন যেন পাঠকের রসবোধের বহির্দ্বারে রহিয়া গিয়াছে।

তত্ত্বনাট্যে কাহিনী ও কাহিনীর বেগ সাধারণ নাটকের চেয়ে বেশি হওয়া দরকার। রবীন্দ্রনাথের তত্ত্বনাট্যে সাধারণ নাটকের চেয়েও কাহিনী অপুষ্টতর এবং তাহার বেগ মন্দতর।

উপন্যাস বা নাটকের প্রাণশক্তি নির্ভর করে তাহার নরনারীর প্রাণ শক্তির উপরে। রচনার নরনারীর প্রাণ হইতেই রচনা আপন প্রাণ ও আয়ুষ্কালের দৈর্ঘ সংগ্রহ করিয়া থাকে। ফাউস্ট কাব্যের তত্ত্ব সম্বন্ধে মতভেদ হওয়া অসম্ভব নয়, কিন্তু ফাউস্ট, মেফিষ্টোফিলিস ও গ্রেশেন সম্বন্ধে দ্বিমত নাই—ইহারাই ঐ কাব্যের স্থায়ী ঐশ্বর্য, এবং যতদিন সজীব ও বিচিত্র নরনারীর প্রতি মানুষের আকর্ষণ থাকিবে, মানুষেরা পুরুষপরম্পরা ফাউস্টের আসরে আসিতে বাধ্য হইবে। আনন্দমঠ ও দেবীচৌধুরাণী সম্বন্ধেও অল্পবিস্তর ঐ কথা প্রযোজ্য। কিন্তু রবীন্দ্র তত্ত্বনাট্য সমূহ সম্বন্ধে এ কথা কতদূর সত্য ?

রবীন্দ্রতত্ত্বনাট্যে একটিও পুরাপুরি বিশ্বাসযোগ্য, হৃদয়গ্রাহী, সজীব চরিত্র চোখে পড়ে না। অথচ বিচিত্র নরনারী সৃষ্টি -তে রবীন্দ্রনাথের দক্ষতা অসামান্য। বিক্রমদেব ও রঘুপতি, নয়ন রায় ও শঙ্কর, সুমিত্রা ও গুণবতী অসামান্য সৃষ্টি। রবীন্দ্রসাহিত্যের পর্বে পর্বে এমন বিচিত্র নর নারীর সংখ্যা প্রচুর। কিন্তু তত্ত্বনাট্যগুলিতে তাহাদের দেখা পাই না কেন? প্রকৃতির প্রতিশোধের নরনারী সবই কেমন ছায়াময়, কেহই রক্ত মাংসের জীব নহে। শারদোৎসবের লক্ষেশ্বর আংশিক সজীব বটে, কিন্তু তাহার শ্রেণীরূপটাই প্রবল। ঐ চরিত্রটিকে সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য করিয়া তুলিবার অসীম সম্ভাবনা ছিল কিন্তু কবি তাহা গ্রহণ করেন নাই।

অচলায়তনের মহাপঞ্চক সম্বন্ধেও ঐ কথা প্রযোজ্য। রাজাতে সুদর্শনার মধ্যে মানবচরিত্রের লক্ষণ অতিশয় প্রবল, ফলে সে মূর্ত্তিমতী বেদনা হইয়াছে কিন্তু রীতিমত মানুষ হয় নাই। ডাকঘর নাটকে সামাজিক মানুষ হিসাবে কে পুরাপুরি বিশ্বাসযোগ্য? ফাল্গুনীতে তো শ্রেণীরূপের ছায়াময় শোভাযাত্রা! রক্তকরবীর নন্দিনীর পক্ষে কবির উক্তি সত্ত্বেও তাহাকে বাঙ্গলী বলিয়া মনে হয়। মুক্তধারার রণজিতের মধ্যে কিছু মানবিক লক্ষণ আছে সত্য, কিন্তু এত পরিমাণে নাই, যাহাতে তাহাকে রঘুপতি বা বিক্রমদেবের মতো বিশ্বাসভাজন করিয়া তোলে। ধনঞ্জয় বৈরাগী কবিরই বিশেষ একটি মতবাদের বাহ্যরূপ, উক্ত নাটকের পরিবেশের বাহিরে আসিলে সে প্রতিষ্ঠা হারাইয়া ফেলে। ফলকথা—এতগুলি তত্ত্বনাট্য কিন্তু কোথাও একটিও বৃহৎ বা মহৎ চরিত্র-সৃষ্টি নাই।

ইহার কারণ আর কিছুই নয়, তত্ত্ব ও চিত্রের ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হইলে যাহা সম্ভব হইত, এখানে তাহা হয় নাই বলিয়াই এমন ঘটিয়াছে।

সাহিত্যক্ষেত্রে মানুষ গল্পের আকর্ষণে আসে, বিচিত্র নরনারীর দেখা পাইবার আশায় আসে, কিন্তু রবীন্দ্রতত্ত্বনাট্যে সে-সব আকর্ষণ ক্ষীণ, কাজেই কোন্ আকর্ষণে লোকে এদিকে আকৃষ্ট হইবে? তত্ত্বের আকর্ষণে আসিবে। কিন্তু তত্ত্ব যে পুরাতন হয়! তখন? এইসব রচনার স্থানে স্থানে যে সুপ্রচুর কবিত্বরস আছে যাহা কখনো পুরাতন হইবে না, তাহার আকর্ষণে আসিবে। মানবজীবন সম্বন্ধে যেসব গভীর, সূক্ষ্ম ও চিত্তাকর্ষক মন্তব্য আছে তাহার আকর্ষণে আসিবে। এই পর্যন্তই বলিতে পারি।

কিন্তু কতদিন আসিবে? যতদিন না উচ্চতর, সুষ্ঠুতর শিল্পপর্যায়ের তত্ত্বনাট্য লিখিত হইতেছে ততদিন আসিবে। এসব রচনাকে স্বপ্রতিষ্ঠিত শিল্পসৃষ্টি অপেক্ষা ভবিষ্যৎ তত্ত্বনাট্যকারদের পথনির্দেশক বলিয়া গ্রহণ করা অধিকতর সঙ্গত হইবে। সেই ভাবীতত্ত্বনাট্য সমূহ সৃষ্ট হইলে শিল্পবস্তু হিসাবে রবীন্দ্রতত্ত্বনাট্যের মহিমা লোপ পাইবার আশঙ্কা আছে বলিয়া আমার ধারণা। কিন্তু তখনো আর এক জাতীয় আকর্ষণ ইহাদের প্রতি থাকিবে। রবীন্দ্র

মানসের গতিবিধির চিহ্নরূপে, প্রচুর কবিত্বরসের আধার রূপে, মানবজীবন সম্বন্ধে সুগভীর মন্তব্যের আশ্রয়রূপে ইহাদের গুরুত্ব কখনো লোপ পাইবে বলিয়া মনে হয় না।

কিন্তু উচ্চতর শিল্পসম্মত তত্ত্বনাট্য সৃষ্টির সম্ভাবনা অচিরে আছে বলিয়া মনে হয়না—একজনের মধ্যে শিল্পী ও মনীষীর মিলন কদাচিৎ হইয়া থাকে। ততদিন রবীন্দ্রতত্ত্বনাট্য পাঠক ও দর্শককে আনন্দ দান করিতে থাকিবে।

এ নাটকগুলির সবগুলির অভিনযযোগ্যতা সমান নহে। ডাকঘরের সরল স্বল্পায়তন কাহিনী বিশিষ্ট দর্শকশ্রেণীকে আনন্দদান করিতে সক্ষম। গীতিবহুল ফাল্গুনী গীতিনাট্যও কখনো কখনো আসর জমাইযা তুলিতে পারিবে। কিন্তু আমার ধারণা অভিনয়যোগ্য-নাটক হিসাবে মুক্তধারার স্থান সর্বোচ্চে। সুদক্ষ প্রযোজকের পরিকল্পনার সাহায্য পাইলে মুক্তধারা শ্রেণীনির্বিশেষে সকল শ্রেণীর দর্শকেরই আনন্দলাভের ক্ষেত্র হইয়া দাঁড়াইবে বলিয়া মনে হয।

—দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত—